বিমান-বাহিনী ও আকাশ-যুদ্ধ

বিমান-বাহিনী ও আকাশ-যুদ্ধ

শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায়

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায়
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

মূল্য—আড়াই টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

নিবেদন

মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর 'আধুনিক যুদ্ধ' নামে আমরা একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই উহা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায় নূতন সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলাম। কিন্তু মহাযুদ্ধ যেরূপ দ্রুত গতিতে চলিতেছিল তাহাতে আজ যাহা আধুনিক, কাল তাহা পুরাতন হইয়া পড়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশী। মহাযুদ্ধের কামান গর্জ্জন এখন থামিয়া গিয়াছে, গত ছয় বৎসর ধরিয়া যাহা দেখা গেল, এখন তাহার একটা হিসাব দেওয়া সম্ভব। আমাদের এই বইখানিতে বিগত মহাযুদ্ধের একটা দিকের চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। চেষ্টা সফল হইয়াছে কিনা তাহার বিচার করিবেন পাঠক ও পাঠিকাগণ; আমাদের দিক হইতে চেষ্টা, যত্ন ও অর্থব্যয়ে কোন ত্রুটি করি নাই।

দেশের আশাভরসা আমাদের তরুণের দল—বিশেষ করিয়া তাহাদের জন্যই বইখানি লিখিত হইয়াছে। কাল্পনিক কাহিনী দ্বারা বালকদের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা না করিয়া জীবনের বাস্তবরূপের সঙ্গে তাহাদিগকে পরিচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। অলস মোহ ও কর্ম্মবিমুখতা ত্যাগ করিয়া তাহাদের কল্পনা বাস্তবমুখী হউক ভারতভাগ্যবিধাতার নিকট এই প্রার্থনা।

এই পুস্তক রচনায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বাগচী মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। এই পুস্তক প্রণয়নে স্থানে স্থানে 'আধুনিক যুদ্ধের' সাহায্য লইয়াছি। ইহার জন্য উক্ত পুস্তকের লেখকদ্বয়ের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা
২রা অক্টোবর, ১৯৪৫

শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায়

সূচীপত্র

বিমান-বাহিনী ও আকাশ-যুদ্ধ

যুদ্ধের রূপান্তর

এই যুদ্ধের আগের যুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম বিমানের ব্যবহার দেখা যায়। ৪ বছর যুদ্ধ চালিয়েও যখন কোন পক্ষই জিততে পারল না, তখন জার্ম্মানীতে হানা দিয়ে তাকে কাবু করবার জন্য মিত্রপক্ষ এক পরিকল্পনা করলেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এক বিরাট বিমান-বাহিনী তৈরী হ'ল। ইংলণ্ডেই সতের হাজার বিমান প্রস্তুত হয়ে রইল—১৯১৯ সালে বসন্তকাল আরম্ভ হলেই জার্ম্মানীতে অভিযান সুরু হবে। সৈন্য চলাচলের পথ ঘাট বোমা ফেলে ভেঙ্গে দেওয়া হবে, দুর্গ ও সেতু উড়িয়ে দিয়ে কলকারখানাগুলি বিধ্বস্ত করে জার্ম্মানীর পক্ষে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব করে দেওয়া হবে। কিন্তু এ পরিকল্পনা কাজে লাগানো গেল না, ১৯১৯ সালের বসন্ত কাল আসবার আগেই জার্ম্মানী পরাজয় মেনে নিয়ে যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করল। আধুনিক যুদ্ধে শক্তিশালী সুগঠিত বিমান-বাহিনী যুদ্ধ জয়ে কতখানি সাহায্য করতে পারে প্রত্যক্ষভাবে সেকথা তখন বোঝা গেল না। কিন্তু বিমানবল যে আধুনিক যুদ্ধের মহাবলগুলির অন্যতম—ভবিষ্যতের যুদ্ধে বিমান যে প্রধান স্থান অধিকার করবে—এ ধারণা সকলের ছিল।

মানুষের বুদ্ধি কোন অবস্থাতেই পরাজয় স্বীকার করতে চায় না। মানুষের আবিষ্কারের প্রতিভা যুদ্ধের প্রয়োজনে অসম্ভব রকম বেড়ে যায়, প্রাণের তাগিদে মানুষ জড়বিজ্ঞানের শক্তিকে নানা কাজে প্রয়োগ করে। এই রকম করেই নূতন নূতন মারণাস্ত্রের সৃষ্টি হয় আর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ধারা বদলাতে থাকে। গত মহাযুদ্ধে যুদ্ধজয়ের কৃতিত্ব অনেকটা পরিমাণে ছিল ট্যাঙ্কের। ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে

মাত্র ৪০০ ট্যাঙ্ক সাজিয়ে রেখে শত্রুসৈন্যের উপর এই নূতন অস্ত্রের কিরকম প্রভাব পড়ে দেখবার জন্য কয়েকটা ট্যাঙ্ক এগিয়ে চলল জার্ম্মান ব্যূহের দিকে। দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মান সৈন্য প্রথমটা এইগুলিকে দেখে হাতের রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে ছুটে পালিয়েছিল। হঠাৎ নূতন অস্ত্রের প্রয়োগ দেখলে সুশিক্ষিত সৈন্যও বিহ্বল হ'য়ে পড়ে—এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। ঐ যুদ্ধে বিমানের ব্যবহারও হয়েছিল কিন্তু তখন উভয় পক্ষের বিমানের সংখ্যা ছিল নগন্য আর আজকের দিনের তুলনায় সেদিনের বিমান ছিল একেবারে শিশু। ঘণ্টায় একশ' মাইলের বেশী যেতে পারে এমন বিমানের কল্পনাও কেউ তখন করতে পারে নি। ১৯১৮ সালে যখন যুদ্ধ থেমে গেল তখন যুদ্ধ যদি না থামতো তবে ১৯১৯ সালে বড় বড় বিমান-যুদ্ধ হোত এতে আর সন্দেহ নেই। যুদ্ধ থেমে যাবার পর সব দেশেরই সমর নায়কেরা বিমানের উন্নতি সাধনে মন দিলেন—প্রকাশ্যে ও গোপনে নানারকম চেষ্টা ও পরীক্ষা চলতে লাগল। কুড়ি বছর পরে দেখা গেল সব দিক দিয়েই বিমানের আশাতীত উন্নতি হয়েছে এবং এই ব্যাপারে নিত্য নূতন উন্নতির সম্ভাবনাও রয়েছে।

ট্যাঙ্ক ও বিমান গত যুদ্ধেরই আবিষ্কার; এই যুদ্ধের গোড়াতেই জার্ম্মানী এই দুইটি বলের অতি বিপুল আয়োজন করেছিল। জার্ম্মান সমর নায়কেরা এই দুইটি বলের পরস্পর যোগসাধন করে সমর সমাবেশের একটি নূতন পরিকল্পনা গড়ে তুলেছিলেন—যুদ্ধের মধ্যে একটা প্রচণ্ড গতি এনে দিয়েছিলেন। এরই নাম lightning war—বিদ্যুৎ-যুদ্ধ—জার্ম্মানরা যার নাম দিয়েছিল—'ব্লীৎস্‌ক্রীগ্‌'।

সংবাদ-পত্রের তথাকথিত সমর-বিশারদেরা ও মাঝে মাঝে দুই চারিজন অসামরিক লেখক ভবিষ্যতের যুদ্ধে বিমানের কি কাজ এ সম্বন্ধে এত কথা লিখেছিলেন ও আলোচনা করেছিলেন যে যুদ্ধ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে একটা ত্রাসের সৃষ্টি যুদ্ধ বাধবার বহু পূর্ব্ব থেকেই হয়েছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রুর দেশ থেকে এই উড়ন্ত কেল্লাগুলি ছুটে আসবে আর মুহূর্ত্তের মধ্যে কলকারখানা, বাড়ীঘর, ভেঙে চুরে, মানুষজন মেরে দ'লে পিষে সব একাকার করে দিয়ে যাবে—এই রকমই ছিল

সাধারণ লোকের বিশ্বাস। যুদ্ধ আরম্ভ হবার সাত দিনের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ! সৈন্য সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র এ সবের আর কোন মূল্যই থাকবে না, যে পক্ষের বিমান বেশী, আর এই বিমান-বলকে শত্রুর উপর প্রয়োগ করবার সুবিধা ও সাহস যার বেশী, তার জয়ই সুনিশ্চিত এবং এই জয় আসবে দু চার দিনের মধ্যেই।

আধুনিক যুদ্ধে বিমান-বাহিনীর স্থান

আজকালকার যুদ্ধে বিমানের স্থান কোথায় আর আধুনিক যুদ্ধে বিমান-বাহিনীর কাজ কি ভাল করে বুঝতে হলে যুদ্ধের মূল লক্ষ্যটি কি মনে রেখে সেই দিক থেকে আলোচনা করতে হবে।

যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য জয়। কিন্তু ফুটবল খেলার জয় আর যুদ্ধ জয় এক রকম নয়! খেলার জয় শুধুই খেলার জন্যই, কিন্তু যুদ্ধ জয়ের মূলে বীরত্বপ্রদর্শন বা শক্তির পরিচয় দেওয়া নয়। শত্রুকে সম্পূর্ণ পরাজিত ক'রে বা ধ্বংস করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যই যুদ্ধ। যুদ্ধ জয়ের পিছনে যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সংকল্প না থাকে তবে যুদ্ধটা হয়ে দাঁড়ায় একটা খেলা বা টুর্ণামেণ্ট। কিন্তু আধুনিক যুগের মানুষ আমরা জানি যুদ্ধটা মোটেই খেলার মতন নয়। সামরিক শক্তি প্রয়োগ না করেও জয়লাভ করা যায়, অর্থনীতি বা কূটনীতির চাপেও কাজ হয়, যুদ্ধের ভয় দেখিয়েও অনেক সময় কাজ হাসিল করা যায়। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সামরিক বল প্রয়োগের নামই যুদ্ধ। বর্ত্তমান যুগের "টোটাল ওয়ার" বা সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের যুগে সামরিক বল বললে কেবল সৈন্যগণের অস্ত্রবল বা বাহুবল বোঝায় না, যুদ্ধরত দেশের অস্ত্রবল, জনবল, ধনবল, শিল্প ও বাণিজ্যের বল, তাহার কূটনীতি ও প্রচারের বল, তাহার নৈতিক বল—অর্থাৎ জাতির সমগ্র বলকে বোঝায়।

যে সামরিক বলের সাহায্যে শত্রুর সমস্ত শক্তি নষ্ট করে তাকে নিজের ইচ্ছার বশীভূত করা হয় সেই বলের মধ্যে বিমান-বল একটি। পূর্ব্বে বিমান-বল বলে কোন কিছু ছিল না—অতীতের সমস্ত যুদ্ধ অন্যান্য বলের সাহায্যেই হয়েছে। এই যুদ্ধেই

বিমান-বলের প্রয়োগ ব্যাপকভাবে করা হয়েছে এবং এই ছয় বৎসর যুদ্ধে বিমান-বলের সার্থকতা অনেকখানি স্থির করা গেছে।

এইবার আমরা একটি একটি করে দেখবো বিমান-শক্তি কি ক'রতে পারে, কতটুকু তার সামর্থ্য। একটা দেশের সকলেই সশস্ত্র যুদ্ধে যোগ দেয় না। শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য যে সৈন্য-বাহিনী তৈরী করা হয় সেই বাহিনী যদি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় তবে যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব এবং পরাজয় প্রায় সুনিশ্চিত। বিমান-বাহিনী শত্রুসৈন্যের অনেক ক্ষতি সাধন করতে পারে বটে কিন্তু শত্রুসৈন্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। শত্রুর দেশ যদি সবটা কেড়ে নেওয়া যায় তবে শত্রু পরাজয় মানতে বাধ্য হয় কিন্তু দেশ জয়ের কাজে বিমান-বাহিনী সাহায্য করতে পারে, বোমা ফেলে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নষ্ট করে জায়গায় জায়গায় জাহাজ থেকে বা এয়ারোপ্লেন থেকে সৈন্য নামিয়ে দিতে পারে কিন্তু কেবল বিমান-বাহিনী বা প্যারাস্যুট সৈন্য একটা বড় দেশ অধিকার করতে পারে না। অন্যান্য বলের সাহায্য না পেলে দুই একটা ছোট জায়গা অধিকার করলেও বেশী দিন ধরে রাখতে পারে না। সুতরাং শত্রু-সৈন্যের অপূরণীয় ক্ষতি করে বা শত্রুর দেশ অধিকার করে শত্রুকে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করা কেবল বিমান-বাহিনীর দ্বারা সম্ভব নয়। আর একটা উপায়ে শত্রুকে পরাজিত করা যায়। শত্রুর যুদ্ধের ইচ্ছাকে নষ্ট করে দিলে শত্রু পরাজয় মানতে বাধ্য হয়। শত্রুর দেশে হানা দিয়ে উপর থেকে বোমা ফেলে তার জীবনযাত্রা ওলট-পালট করে দিতে পারলে, বা প্রচার-পত্র ছড়িয়ে যুদ্ধ করে লাভ নেই একথা ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারলে শত্রু পরাজয় মেনে নিতে পারে। এই দিক দিয়ে বিমান-বাহিনীর কার্য্যকারিতা যথেষ্টই আছে। অন্য বলের প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে মাত্র বিমানবলের উপর নির্ভর করেই আধুনিক যুদ্ধে চরম জয়লাভ করতে পারা যায় কিনা—এ প্রশ্ন এই যুদ্ধের গোড়াতেই উঠেছিল। এর উত্তরও এ যুদ্ধের নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্যে মিলবে কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে এই টুকু বলা চলে যে অন্য বলের সঙ্গে যুক্ত হলেই বিমানবলের কার্য্যকারিতা বেড়ে যায়—

সামরিক বল বলতে কেবল বিমানবল মনে করলে ভুল হবে—সকল বলের একত্র সংযোগই যথার্থ বল। এই সামগ্রিক বলের যদি আধিক্য থাকে এবং এই আধিক্যকে যথাকালে ও যথাস্থানে চূড়ান্ত ভাবে যারা প্রয়োগ করতে পারে, যুদ্ধে জেতে তারাই। যুদ্ধ-জয়ের মূল সূত্রই হচ্ছে এই এবং আজ পর্যান্ত এর কোনও ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই।

যুদ্ধ জয়ে বিমান অনেকখানি সাহায্য করে, অনেকে বলেন চরম জয় এনে দেবার ক্ষমতাও বিমান বলের আছে। যাহো'ক এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে দুপক্ষে। কিন্তু বিমান বল না থাকলে যে পরাজয় আটকানো যায় না, এ বিষয়ে তর্কের অবসর নাই। পোলাণ্ডের যুদ্ধে, নরওয়ের যুদ্ধে, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের যুদ্ধে আমরা দেখেছি বিমান বলের অভাব বা অল্পতার জন্য কি ভাবে শোচনীয় পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী রেণোঁ কি ভাবে বিমানের জন্য আমেরিকার কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন। মালয় ও বর্ম্মার জঙ্গলে জাপানী বিমানের জ্বালায় অস্থির হয়ে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্য—"বিমান, আরও বিমান" (planes, more planes) বলে কী কাতর প্রার্থনাই জানিয়েছিল !

বিমান-বাহিনীর কাজ

ইউরোপে ও প্রশান্ত মহাসাগরে প্রায় ছয় বছর ধরে যে যুদ্ধ চলেছিল তাতে সব রকম যুদ্ধেই বিমান বাহিনীর কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করা গেছে।

বিমানের সব চেয়ে বড় কাজ সন্ধান ও খোঁজখবর নেওয়া, খবরদারী করা, জলে স্থলে আকাশে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা। আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই সন্ধানের প্রয়োজন আছে। শত্রু কোথায় আক্রমণের উদ্যোগ করছে, কোথায় সৈন্য সাজাচ্ছে, কোথায় অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি জমায়েত করা হচ্ছে, কোন পথ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে—আকাশে সারাদিন ঘুরে ঘুরে এই সব সংবাদ সংগ্রহ করা হচ্ছে বিমানের প্রথম ও প্রধান কাজ। এই সব খোঁজ খবর নিয়ে সন্ধানী বিমানগুলি বেতারযোগে সংবাদ জানিয়ে দেয়। এই সব সন্ধানী বিমানের চোখকে

ফাঁকি দিয়ে কোন কিছু করা আজকাল একেবারে অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। এই সন্ধানী বিমানের দল না থাকলে বর্ত্তমানে স্থলযুদ্ধ বা জলযুদ্ধ কোন কিছুই চলে না। এই সন্ধানী বিমানগুলি হচ্ছে মূল বাহিনীর চোখ; এরা না থাকলে বিপুল সৈন্যদল বা বিরাট নৌবহর অন্ধ। মালয় ও বর্ম্মার জঙ্গলে মিত্রপক্ষের সন্ধানী বিমান ছিল খুবই কম, জাপানী বিমান প্রথম দিকে আকাশে এতখানি আধিপত্য বিস্তার করেছিল যে বৃটিশ বিমানের পক্ষে আকাশে ওঠা একেবারেই নিরাপদ ছিল না। জাপানের স্থলসৈন্য শত্রুপক্ষের ঘাটি, সৈন্যসংখ্যা, বিশ্রামস্থান, পশ্চাৎ অপসরণের পথ সমস্তই জানতে পারতো কিন্তু বৃটিশ সৈন্য জাপানীদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্বন্ধে কোন খবরই রাখতো না। এর ফল হ'ল জাপানী সৈন্যের দল নিঃশব্দে জঙ্গলে ঢুকে বৃটিশ, ভারতীয় ও চীনা সৈন্যের একেবারে পিছনে এসে উপস্থিত হোত। হয় তো বা ২০০ গজ দূরে একটি নদী পার হয়ে সৈন্যদলের পাশ দিয়ে আক্রমণ চালাত। সন্ধানী বিমানের সাহায্যে খোঁজ নেওয়া সম্ভব ছিল না বলে জাপানীদের সৈন্যসংখ্যা কোন স্থানে কত, তারা কোন দিকে যাবার উপক্রম করছে কিছুই জানা যেত না। সন্ধানী বিমানের অভাব বা অল্পতার জন্য বৃটিশ সৈন্যদলকে যুদ্ধের প্রথম দিকে বার বার জাপানীদের চাতুরীর কাছে দিশেহারা হতে হয়েছে। জার্ম্মানী যখন ফ্রান্স অধিকার করে ইংলণ্ড আক্রমণ করবার আয়োজন করছিল তখন ইংলণ্ডের সন্ধানী বিমান ইংলিস চ্যানেল ও ফ্রান্সের উপকূলের উপর রাতদিন ঘুরে ঘুরে সব সংবাদ নিত ও এদের কাছ থেকে খবর পেয়ে বোমারু বিমানগুলি সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্য সমাবেশ, অস্ত্র সমাবেশের স্থানগুলি ভেঙে দিয়ে আসত। আক্রমণাত্মক যুদ্ধে—জলে স্থলে আকাশে যেখানেই যুদ্ধ হোক না কেন—মূল কথা হ'ল surprise বা অতর্কিত আকস্মিক আক্রমণ। কিন্তু সন্ধানী বিমানের জন্য যুদ্ধের মধ্যে এখন অনেক জটিলতা এসেছে, আকস্মিক আক্রমণের সুযোগ আর তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। নকল দুর্গ, নকল পথ, নকল কামান ইত্যাদি তৈরী করে সন্ধানী বিমানের চালকদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা হয় বটে কিন্তু সন্ধানী বিমানের চালকেরা তো আর নিজের চোখকে বিশ্বাস করে না,

সমস্ত ছবি তুলে নিয়ে যায়। মানুষের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ কিন্তু ক্যামেরার কাছে যত ফাঁকি সব ধরা পড়ে যায়।

আক্রমণাত্মক যুদ্ধে বিমানবহরের কাজ প্রধানত তিন রকমের ঃ—

(১) শত্রুর দেশে গিয়ে বোমা ফেলা,

(২) বিশেষ বিশেষ স্থান অধিকার করবার জন্য প্যারাসুট সৈন্য নামিয়ে দেওয়া,

(৩) বিমান বা গ্লাইডারের সাহায্যে বহু সৈন্য নিয়ে শত্রুর দেশে উপস্থিত হওয়া।

জঙ্গীবিমান আত্মরক্ষার যুদ্ধে শত্রুর বিমানবহরের সঙ্গে আকাশ-যুদ্ধ করে, আক্রমণাত্মক যুদ্ধে নিজ দলের বোমারুগুলিকে রক্ষা করে।

বিমান যুদ্ধের সুবিধা

বিমান যুদ্ধের প্রধান সুবিধা অতর্কিতে আক্রমণ করা। অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে একদিকে যেমন বিপক্ষের সৈন্য ক্ষয় করা যায়, অন্যদিকে তেমনি নাগরিকগণের ধন প্রাণ নষ্ট ক'রে—ভয় দেখিয়ে—তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিশৃঙ্খল এমন কি অচল ক'রে ফেলা যায়। শেষ পর্য্যন্ত ভয়ে দমে গিয়ে এই সব নাগরিকেরা দেশের গভর্ণমেণ্টকে এমন চাপ দিতে থাকে আর এত বিব্রত করে তোলে যে গভর্ণমেণ্ট তাড়াতাড়ি বিপক্ষের সঙ্গে একটা রফা করতে বাধ্য হয়। বিমান যুদ্ধের সব চেয়ে বড় সুবিধা, বিমানগুলিকে খোলা আকাশে ঘুরান ফিরান অত্যন্ত সহজ বলে যে কোন বিমান লক্ষ্যবস্তুর অত্যন্ত নিকটে যেতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে রণ-বিমানগুলি এত সহজে শত্রুর বিমানকে এড়িয়ে যেতে পারে যে বিমান-বলের সাহায্যে আত্মরক্ষার চেয়ে আক্রমণ-মূলক কাজ চালানই সুবিধাজনক।

বিমান যুদ্ধের ফলে নূতন সমস্যার উদ্ভব

আজকাল যে সব বিমান তৈরী হচ্ছে বা যুদ্ধের জন্য যেগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলি সাধারণত দুশ' থেকে চারশ' মাইল পর্য্যন্ত ছুটতে পারে। এতে যুদ্ধ

চলে ক্ষিপ্রগতিতে—এত ক্ষিপ্রগতিতে যে আগে থেকে পাকা রকমের ব্যবস্থা না করলে শত্রুর হাত হ'তে বাঁচবার কোন উপায় থাকে না। আকাশ বাহিনী যুদ্ধে একটা বড় অংশ নিয়েছে বলে আজ যুদ্ধের ধারায় একটা খুব বড় রকমের পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। এখন যুদ্ধের নির্দ্দিষ্ট কোন ফ্রণ্ট নেই—বিশেষ কোন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যুদ্ধ আর সীমাবদ্ধ থাকছে না। লক্ষ লক্ষ সৈন্য কামান সাজিয়ে শত্রুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেখানে প্রতীক্ষা করছে আক্রমণ মোটেই সেখানে হ'ল না, আক্রমণ হ'ল সৈন্যব্যূহের হয় তো পঞ্চাশ মাইল পিছনে। এক ঝাঁক বোমারু বিমান হয় তো হঠাৎ বাজের মত ছোঁ মেরে প'ড়ে সৈন্যদলের পিছনের সংযোগসূত্র দিল ছিন্ন ক'রে। আর তার ফলে শত্রু হয়ে পড়ল বিশেষ বিব্রত। বিমান আক্রমণের ফলে যুদ্ধরত দেশের সাধারণ নরনারীর জীবনে যুদ্ধের প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়ে যুদ্ধ করতে গেল হতাহতের সংখ্যা কেবল তাদের মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ থাকছে না। বেসামরিক অধিবাসীর বেশ একটা অংশ এখন শত্রুর বোমায় প্রাণ হারাচ্ছে বা বিকলাঙ্গ হয়ে জীবন যাপন করছে। যুদ্ধরত দেশের শিশু, নারী কারও আর নিস্তার নেই। যুদ্ধ বাধলে কার জীবন বিপন্ন আর কার জীবন বিপন্ন নয়, একথা জোর করে বলবার উপায় নেই। কলকারখানায় শহর বন্দরের কাছে যখন লোক থাকবেই তখন বিমান আক্রমণে এদের ক্ষতি অল্পবিস্তর না হয়েই পারে না। তাই আজকার যুদ্ধে বেসামরিক অধিবাসীর শুশ্রূষা, চিকিৎসা ও গৃহহীন আশ্রয়হীন নরনারীর জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের একটা বড় কর্ত্তব্য হয়ে পড়েছে।

বিমান আক্রমণের প্রধান প্রধান লক্ষ্যবস্তু

বিপক্ষ সৈন্য ধ্বংস করাই যখন বিমান আক্রমণের উদ্দেশ্য তখন শত্রুপক্ষের ঘাঁটিগুলি যে বিমানযোগে আক্রমণ করা হবেই, একথা না বললেও চলে। কোথাও সৈন্যেরা জলপথে নদী পার হচ্ছে বা স্থলপথে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে অথবা তাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র নিয়ে জাহাজ বা লরী যাত্রা করেছে

এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে বিমান যোগে তাদের উপর চড়াও করা হ'ল। আক্রমণ যদি প্রবল হয় তবে হয় তো জাহাজ ডুবে অনেক রসদ নষ্ট হয়ে গেল, বোমার ঘায়ে কিছু সৈন্য মারা পড়ল, যারা টিকে গেল তারাও ছত্রভঙ্গ হয়ে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ায় শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করবার কোন সুবিধাই সৈন্যরা পেল না। সাময়িক গুরুত্ব যার থাকে অর্থাৎ যুদ্ধ চালাবার কাজে যেগুলির অত্যন্ত প্রয়োজন



সেতুর উপর বিস্ফোরক বোমা পড়েছে

সেগুলির উপর বিমান আক্রমণ হ'লেই শত্রুর অসুবিধা হয় বেশী। বোমা ফেলে পঞ্চাশখানা বাড়ী ধূলিসাৎ করে দিয়ে শত্রুর যে পরিমাণ ক্ষতি করা যায়, অনেক সময় তার চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতি করা যেতে পারে রেলপথের একটা সেতু উড়িয়ে দিয়ে।

শক্রপক্ষের বিভিন্ন সামরিক, বেতার ও বিমান ঘাঁটিগুলি, দেশের শিল্পকেন্দ্র, কলকারখানা, বন্দর, রেলপথ, বড় বড় নগরের আলো ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা, এই গুলিই বিমান আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। যুদ্ধের সময় যুদ্ধরত কোন জাতিই তার স্বাভাবিক শিল্পগুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে না। তখন প্রায় সব কারখানা গুলিই যুদ্ধের জন্য দরকারী জিনিসপত্র, মালমসলা ইত্যাদি তৈরী ক'রতে লেগে



বোমায় বাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে

যায়। সেই জন্যই শক্রপক্ষ বিমান দিয়ে প্রথমেই আক্রমণ চালায় এই সব কল-কারখানার উপর। এই আক্রমণের প্রধানতঃ দুটি উদ্দেশ্য থাকে—প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য এই যে কারখানা নষ্ট করে দিতে পারলে বিপক্ষ সৈন্যেরা দরকারী জিনিস পাবে না। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য শ্রমিক দল ভয় পেয়ে কারখানার কাজ ছেড়ে দেবে এবং বেকার হ'য়ে দেশের মধ্যে একটা গুরুতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি ক'রে তুলবে।

বিদ্যুতের ও গ্যাসের কারখানা আর পেট্রলের গুদামের উপরও শত্রুপক্ষের নজর প্রথম থেকেই থাকে অতিশয় তীক্ষ্ণ। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হ'লেই সব কারখানা অচল আর পেট্রল ফুরিয়ে গেলে তো সৈন্য চলাচল অসম্ভব, কারণ ট্যাঙ্ক লরী, বিমান এগুলি চ'লবে কিসে? এ ছাড়া রেলপথ ও সেতু এগুলি নষ্ট ক'রেও সৈন্য চলাচল বন্ধ করার চেষ্টা বিমান আক্রমণের উদ্দেশ্য।

বহু বড় সহরে জল সরবরাহ নষ্ট ক'রে দিতে পারলে সহর-বাসীদের প্রাণ বাঁচানো হবে দুষ্কর। এর ফলে তাদের যতই অসুবিধা হবে ততই তারা গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিতে থাকবে যাতে যাহোক একটা আপোষ করে তাদের ধনপ্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে।

বিমান আক্রমণের এইগুলি হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া লোকের যাতে অসুবিধা হয়, এমনতর অনেক জিনিসের উপরই আক্রমণ করা হ'য়ে থাকে। বড় বাড়ী ও ব্যারাক, বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের ঘাঁটি ও অন্যান্য আশ্রয়স্থল, ফায়ার ব্রিগেড ও এ, আর, পি'র আড্ডা, সুবিধা পেলে কোনটাই বাদ দেওয়া হয় না।

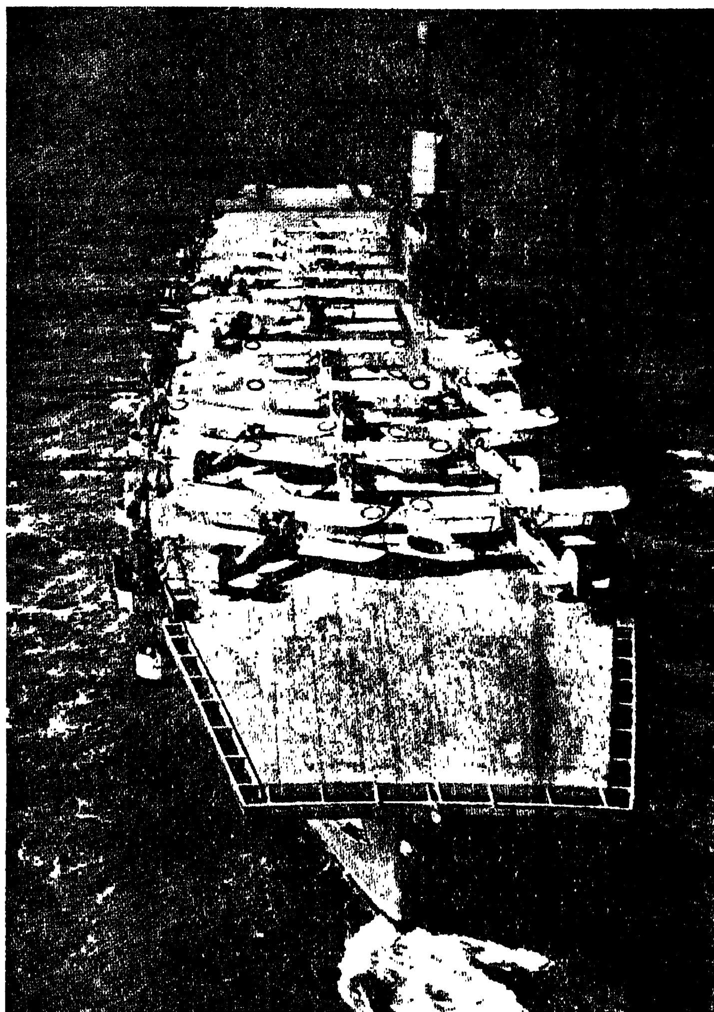
স্বয়ংক্রিয় ও যৌথ এই দুই প্রকার আক্রমণ

এ সম্বন্ধে কোন কিছু আলোচনা আরম্ভ করবার আগেই প্রথমেই আমাদের জানতে হবে বিমান আক্রমণ কত রকম ভাবে চালিত হয়। মোটামুটি ভাবে দেখতে হলে বিমান আক্রমণ হ'তে পারে দুরকমের। দরকার মত বিমান আক্রমণ হবে 'স্বয়ংক্রিয়' অর্থাৎ স্থলবাহিনী বা জলবাহিনীর কোন সাহায্য না নিয়ে কিংবা তাদের সঙ্গে মিলিত ভাবে কিছু করবার উদ্দেশ্য না রেখে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে শত্রুরাজ্যে হানা দেওয়াকে বলা যেতে পারে বিমান আক্রমণের স্বয়ংক্রিয় ধারা। এমনিতর আক্রমণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ-কারীরা শত্রুর বিশেষ বিশেষ ঘাঁটি আক্রমণ ক'রে তাকে দুর্ব্বল করবার দায়িত্ব নিয়ে যাত্রা করে এবং দরকার হলে বাধাদানকারী শত্রু বিমানের সঙ্গে সমান ভাবে যুদ্ধ করতে পিছপা হয় না। বিমান আক্রমণের আর একটি উদ্দেশ্য হতে পারে যৌথ অর্থাৎ আবশ্যক



যৌথ আক্রমণের নমুনা—শত্রু বাহিনীর ট্যাঙ্কের উপর বিমান আক্রমণ

মত অন্যান্য বাহিনীকে সাহায্য করা। শত্রু হয় তো পিছনে হটচে আর আক্রমণকারী সৈন্য ছুটেছে তার পিছনে, তখন উপর থেকে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালিয়ে



বিমানবাহী জাহাজে সাজানো রয়েছে বিমান

পলায়নপর বিপক্ষ বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবার চেষ্টা করা হ'ল, কিংবা মাঝ সমুদ্রে ডুপক্ষের জাহাজে বেধেছে যুদ্ধ, তখন বিমান আক্রমণ চালিয়ে শত্রুকে কাবু করবার চেষ্টা করা হ'ল। এই সব হচ্ছে যৌথ আক্রমণের ধারা। আজকাল স্থলসৈন্যের কাজে সহায়তা করবার জন্য স্থলসৈন্যের অধিনায়কের অধীনে বোমারু ও জঙ্গীর একটি ডুটি বহর থাকেই। যান্ত্রিক বাহিনী অর্থাৎ ট্যাঙ্ক, লরী, আরমার্ড্ কার, কামান, মোটর সাইকেল প্রভৃতির পিছনে থাকে ছোট একটি বিমান বহর—তার কাজ হ'ল দরকার হ'লেই যান্ত্রিক বাহিনীর অগ্রগতিতে যেখান থেকে বাধা আসছে, সেখানে আক্রমণ ক'রে বাধা চূর্ণ ক'রে দেওয়া। জার্ম্মানীর সুবিখ্যাত "প্যান্জার ডিভিশন"—এর সঙ্গে সঙ্গেও চলে ডাইভ-বমারের দল। জল যুদ্ধেও নৌবহরের সঙ্গে থাকে fleet air arm. বিমানবাহী জাহাজের উপর বিভিন্ন ধরণের কতকগুলি বিমান নৌবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গেই চলে —এরা নৌবাহিনীর অন্তর্গত। এক্ষেত্রে বিমান আক্রমণ চালিত হয় শুধু অন্য বাহিনীকে সাহায্য করবার জন্য। যে কোন প্রকার জয়লাভ করাই যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্য, তখন ভিন্ন ভিন্ন বাহিনীর মধ্যে পরস্পর সাহায্য করবার ব্যবস্থা না থাকলে চরম উদ্দেশ্য কি ক'রে সিদ্ধ হ'তে পারে ?

সাহস ও বীরত্ব, উপস্থিত বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রকারিতা, স্বদেশানুরাগ ও আত্মোৎসর্গ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সংঘপ্রীতি প্রভৃতি গুণ বিমান বাহিনীর সৈন্যদলের মধ্যে এতটা বেশী পরিমাণে দেখা দিয়েছিল যে যুদ্ধরত প্রতিটি দেশই তার বিমান বাহিনীর জন্য গৌরব বোধ করে। স্বয়ংক্রিয় এবং যৌথ উভয় রকম আক্রমণেই পাইলটদের অদ্ভুত বীরত্ব উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। এই রকম কয়েকটি ঘটনার কথা সংক্ষেপে বলা হবে কিন্তু তার আগে বিমান—বোমারু ও জঙ্গী উভয় প্রকার বিমান সম্বন্ধেই মোটামুটি একটা ধারণা থাকা দরকার এবং বিমান আক্রমণ কিভাবে চলে সে বিষয়েও খানিকটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

বিমান আক্রমণের সাধারণ পদ্ধতি

বিমান আক্রমণের ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই এবং ঠিক ফরমূলা মত কোন আক্রমণ সম্ভবও নয়। কেন না শত্রুপক্ষ যদি আগে থেকে জানতে পারে কি নিয়মে আক্রমণ চলবে, তবে আক্রমণের রীতিমত ফল তো হবেই না, বরং উল্টো বিপত্তি ঘটবে নিজেদেরই।

শত্রুর দেশে গিয়ে বিমান যার উপর বোমা ফেলে আসে, তাকে বলা হয় 'টার্গেট'। একই টার্গেটের উপর বোমা ফেলবার জন্য কখনও অসংখ্য বিমান একত্রে আসে না। একটা টার্গেটের জন্য এক ঝাঁক অর্থাৎ একটা স্কোয়াড্রনই যথেষ্ট। টার্গেটটি যদি খুব বড় হয়, যেমন শত্রুর বিমানঘাঁটি, তবে দুতিনটি স্কোয়াড্রন আক্রমণ করে কিন্তু একসঙ্গে নয়, পরপর। বোমা ফেলবার আগে ও পরে বিমানকে যেমন বেপরোয়া হয়ে উড়তে হয় তাতে নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে একসঙ্গে বেশী বিমান উড়লে পরস্পর ঠোকাঠুকি লেগে নিজেদের ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই বেশী।

মুসোলিনী একবার একটা বক্তৃতায় বলেছিলেন যে তিনি বিপক্ষের উপর বিমান আক্রমণের জন্য এক একবারে এতগুলি বিমান একসঙ্গে পাঠাবেন যে বিমানের সার দিয়ে সূর্য্যকে ঢেকে ফেলা হবে। এটা শুধু আস্ফালন, কাজের বেলা এ ব্যবস্থা অসম্ভব ও অচল, কারণ তাতে বিপদের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। একসঙ্গে অনেক বেশী বিমান থাকলে বিপক্ষ যেমন তেমন করে গুলি ছুঁড়লেও দুচারখানা আক্রমণকারী বিমান ধরাশায়ী হবেই। শত্রুপক্ষের বিমান বিধ্বংসী কামানগুলোর তাহলে কষ্ট ক'রে কোন তাক ক'রতে হবে না।

কিন্তু তাই বলে দু'খানা বা একখানা বিমান দিয়ে কখনও ব্যাপক আক্রমণ চালানো যায় না। কারণ বোমা ফেলা কাজটা এমনি যতটা সহজ মনে হয় আসলে ঠিক ততটা সহজ নয়। তা ছাড়া প্রত্যেক আক্রমণেই আক্রমণকারীদের দু'চারখানা বা তারও বেশী বিমান নষ্ট হয়ই। তাই একদলে অনেকগুলি বিমান থাকলে, দুচারখানা গেলেও তাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা একেবারে অসম্ভব হয় না।

সেই জন্যই আক্রমণের সময় বিমানগুলো আসে দল বেঁধে—কিন্তু সার বেঁধে নয়, কারণ তাহলে শত্রুপক্ষ অতি সহজে আক্রমণ-কারী বিমানগুলোকে ঘায়েল করবার সুবিধা পায়।



বিমানগুলো আসে দল বেঁধে—কিন্তু সার বেঁধে নয়

যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্ম্মানী যে বিমান আক্রমণ চালিয়েছিল তা বেশ বড় ধরণের। ৫০ থেকে ৫০০ খানা, মাঝে মাঝে দুএকবার হাজার বোমারু ও জঙ্গী শত্রুর রাজ্যে এসে হানা দিয়েছিল। আক্রমণকারী বিমানগুলি বিমানঘাঁটি থেকে উড়ল। সাধারণ বিমানঘাঁটি থেকে ৪০।৫০ খানার বেশী বিমান উড়তে পারে না। তেমন বড় বিমানঘাঁটি হলে ১০০ খানা বড় বমার উঠতে পারে বা নামতে পারে। ৫০০ বা ১০০০ বিমান নিয়ে যদি হানা দিতে হয় তবে এই



আক্রমণকারী বিমানের বড় দল আঠারখানি বিমানের এক একটি স্কোয়াড্রন—একটি দল অপরটির পাশে নয়, উপরে

বিমানগুলি ওড়াবার জন্য অনেকগুলি বিমান ঘাঁটি চাই। এই বিমান ঘাঁটিগুলির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সর্ব্বদা যোগ রক্ষা করা দরকার। ৯ খানা থেকে ২৭ খানা পর্য্যন্ত বিমান নিয়ে এক একটা স্কোয়াড্রন হয়। এক একটা বিমান ঘাঁটি থেকে উঠে বিমান-ঘাঁটির কাছাকাছি আকাশে ঘুরতে থাকে, একটির পর একটি বিমান উঠে আগেরগুলির সঙ্গে মিলে formation বা ব্যূহ গড়ে তোলে। আকাশে যখন বিমানের দলকে আমরা উড়ে যেতে দেখি তখন লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে বিমানগুলি এলোমেলো ভাবে কখনই আকাশ দিয়ে উড়ে যায় না। ব্যূহ যেমন ভাবেই তৈরী হোক না কেন, সাধারণ নিয়ম হচ্ছে এই যে প্রত্যেকখানা বিমানের পিছনে একখানা বা দুইখানা করে বিমান থাকবেই। বিমানের পিছনটাই সব চেয়ে দুর্ব্বল অংশ, সুতরাং আগের বিমানখানার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করবে পরের বিমানখানা—এই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। এই রকম করে যে স্কোয়াড্রন হয়, তার একেবারে আগের বিমানখানায় বা সকলের পিছনে ডানদিকের খানায় থাকে স্কোয়াড্রন-লীডার। একটা বিমান ঘাঁটি থেকে যদি ৩।৪টি স্কোয়াড্রন উঠে পড়ে তবে পূর্ব্বের কায়দায় স্কোয়াড্রনগুলি আকাশে স্থান করে নেয়। প্রয়োজন অনুসারে বিমানের সংখ্যা বাড়িয়ে বা কমিয়ে স্কোয়াড্রন ঠিক করে নেওয়া হয়।

একটা সহরের উপর হানা দেবার জন্য যদি অনেকগুলি বিমান-ঘাঁটি থেকে চারপাঁচ শ' বিমান গিয়ে হাজির হয় তবে তাদের কার্য্যপদ্ধতি কি রকম হবে। চার পাঁচশ' বিমান এক সঙ্গে একই সময়ে সহরের উপর সমস্তটা আকাশ ঢেকে থাকবে না। formation নিয়েই আশী নব্বইখানা বিমান সহরের উপর দশ বা পনের হাজার ফুট উপরে চলে আসবে। এই রকম বিমানদলের অন্যান্য formation গুলি দূরে দূরে অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকবে। সাধারণতঃ যে দলটার সকলের আগে বোমা ফেলবার কথা সেই দলটা যদি থাকে দশ হাজার ফুট উপরে তবে দ্বিতীয় দলটি হয়তো থাকল পনেরো হাজার ফুট উপরে, তৃতীয় দলটি রইল যেন সতেরো হাজার ফুট উপরে, এই রকম করে ৪।৫ দল হয়তো অপেক্ষা করে রইল। আকাশে যদি মেঘ থাকে তবে তো কথাই নেই। মেঘের

আড়ালে অতি সহজেই লুকিয়ে থাকা চলে। আকাশে যে দিকটায় সূর্য্য থাকবে সেই দিকে অনায়াসে অনেকগুলি বিমান একসঙ্গে থাকতে পারে।

বোমা ফেলা

এইবার বোমা ফেলার রকমটা আলোচনা করা যাক। ৪।৫টি স্কোয়াড্রনের দলটি সহরের উপর নেমে এল—সহরের বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত জায়গায় বোমা ফেলতে হবে সেই সব হিসাব ক'রে স্কোয়াড্রনগুলি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে গেল। এই সময় দলপতির আদেশ দেওয়া হয়—Break formation.—একসঙ্গে থেকো না—বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়। একসঙ্গে থাকলে শত্রুর বিমানমারা কামানের স্থবিধা। তখন বিমানগুলি খুব ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিকট গর্জ্জন করে টার্গেটের উপর নেমে আসতে লাগল, একবার টার্গেটের মাথার উপর দিয়ে সোঁ করে উড়ে গেল, পরের বার এসে ঠিক তাক ক'রে বোমা ফেলে ঘুরে ফিরে নিরাপদ জায়গায় চ'লে গেল। স্কোয়াড্রনগুলি নির্দ্দেশ মত বিভিন্ন স্থানে বোমা ফেলে আবার একসঙ্গে মিলিত হ'ল, পূর্ব্বের মত আবার formation গঠন ক'রে নিজেদের বিমান ঘাঁটির দিকে উড়ে চলল। এইভাবে একে একে দূর থেকে বা উপর থেকে বিমানগুলি টার্গেটের উপর নেমে এল ও নিয়ম মত বোমা ফেলে দূরে গিয়ে আবার একত্র হল। বোমা ফেলে ফিরবার সময়ও formation করা দরকার। বিপক্ষ দেশের উপর দিয়ে এলোমেলো ভাবে উড়ে গেলে শত্রুপক্ষের জঙ্গী বিমান নিশ্চয় তাড়া করবে আর দল থেকে বিচ্ছিন্ন দুএকটি বিমান যদি দেখে তবে পিছন থেকে ও পাশ থেকে জঙ্গী বিমানের দল এমন মেশিন গানের গুলি চালাবে যে বোমারুর পক্ষে ঘরে ফিরে আসা শক্ত। বোমা ফেলে ফেরবার পথে বোমারুর চালকদের খুব মাথা ঠাণ্ডা ক'রে স্কোয়াড্রন লীডারের কথা মত চলতে হয়, নইলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা।

বোমা ফেলে ফেরবার পথে পাইলটের বুদ্ধির দোষে বা উৎসাহের আধিক্যে বিপদ কি করে আসে সে সম্বন্ধে একটা ঘটনা বলছি।

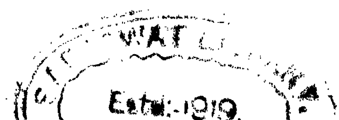
একবার বৃটিশ বিমানের একটা মাঝারি দল জার্ম্মানীর রুড়্ অঞ্চলের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে বোমা ফেলতে যায় কিন্তু জার্ম্মানীর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা খুবই ভাল থাকায় সবগুলি বোমা ফেলা গেল না। বিমানগুলি বোমার বোঝা নিয়েই ফিরে আসছে। শত্রুর দেশের উপর দিয়েই অনেকটা পথ আসতে হবে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশখানা বোমারুর পিছনে তিন চারখানা জার্ম্মান ফাইটার তাড়া করেছে। কিন্তু এতগুলি বিমান একসঙ্গে থাকায় ফাইটারগুলি পাশে এসে বা উপরে উঠে আক্রমণ করতে সাহস করছে না। স্কোয়াড্রন লীডার দেখছেন সবই—তাঁর নির্দ্দেশ—সোজা এগিয়ে চল। সেই দলে ছিল একজন নূতন পাইলট—যেমন সাহসী, তেমনি সুদক্ষ। ককপিট থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে পিছনে চেয়ে এক একবার দেখছে আর বোধ হয় মনে মনে ভাবছে স্কোয়াড্রন লীডার এত ভীরু কেন! মাত্র তিন খানা কি চার খানা ফাইটার—একবার হুকুম পেলে এঞ্জিনটা একটু বাঁ দিকে ঘুরিয়ে পাট্ পাট্ পাট্ করে মেসিন গান চালালে মিনিটখানেকের মধ্যেই ফাইটার ক'খানার দফা একেবারে শেষ ক'রে দেওয়া যায়। এমন সুযোগ কি জীবনে বেশী দিন আসে! এই রকম ভাবছে আর ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছে। স্কোয়াড্রন লীডার অভিজ্ঞ লোক, তিনি ভাবগতিক দেখে স্পষ্ট ভাষায় সকলকেই অর্ডার দিলেন, formation ভাঙ্গবে না, যেমন চলছিলে তেমনি সোজা এগিয়ে চল। বোমারুর ঝাঁকটি একটু গতি বাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলল—বড় একখানা মেঘের মধ্যে সম্পূর্ণ দলটি একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। কিছুক্ষণ চলতে চলতে সম্পূর্ণ দলটি মেঘ কেটে আবার পরিষ্কার আকাশে বেরিয়ে এল। জার্ম্মানীর একটি ছোট সহর! কিন্তু একি—ঠিক নীচেই যে একটা জার্ম্মান বিমান-ঘাঁটি! বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—ত্রিশখানা জার্ম্মান বোমারু প্রকাণ্ড মাঠটার একপাশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সেই উৎসাহী পাইলটটির এবার মাথা ঘুরে গেল। সঙ্গে বিমান ভর্ত্তি বোমা—আর নীচে এত বড় টার্গেট। ত্রিশখানার মধ্যে অন্ততঃ পনের বিশ খানা তো সে একাই এই মুহূর্ত্তে শেষ ক'রে দিতে পারে। এত বড় সুযোগ সামনে দেখে যদি তাকে চুপ ক'রে চলে যেতে

হয় তবে জীবন বিপন্ন করে পাইলট হয়ে লাভ কি, কেরানী হলেই তো পারতো। তার হাত নিশপিশ করে উঠল, শিরায় শিরায় রক্তস্রোত জোরে বইতে লাগল, তার বুদ্ধি লোপ পেল। ষ্টীয়ারিং হুইলে জোর ক'রে একটা ঝাঁকানি দিয়ে দল থেকে সে বেরিয়ে এল, চক্ষের নিমিষে বোঁ করে একেবারে দশহাজার ফুট নেমে গেল। স্কোয়াড্রন লীডার দেখলেন একখানা বমার এয়ারোড্রোমের উপর ডাইভ করছে, নীচ থেকে কামানের গর্জ্জন আর বোমার শব্দ, নীচটা অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সেই চারখানা জার্ম্মান ফাইটার—যারা এতক্ষণ নিঃশব্দে পিছনে পিছনে ছুটে আসছিল—তারা আকাশের চার জায়গায় ঘাঁটি আগলে আগলে বাজের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক এই জন্যেই তারা এতটা পথ ধাওয়া করে আসছিল—এবার তারা সুযোগ পেয়েছে, দলছাড়া প্লেনটিকে এবার তারা দেশে ফিরে যেতে দেবে না। স্কোয়াড্রন লীডার দল থেকে ৪ খানা বমার নিয়ে আলাদা হয়ে পড়লেন। দলটিকে স্পীড বাড়িয়ে সোজা দেশে ফিরে যেতে আদেশ দিয়ে পাঁচটি বিমান নিয়ে বিমান-ঘাঁটির উপর চলে এলেন। বিমানে বিমানে যুদ্ধ হল খুব—উৎসাহী পাইলটটিকে বাঁচিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন বটে আধ ঘণ্টা পরে কিন্তু দুখানি বমার তাঁর মারা পড়ল।

বিমানবহরের কর্ত্তারা উৎসাহী পাইলটটিকে ভাল করেই বুঝিয়ে দিলেন যে দলকে বিপন্ন করে ব্যক্তিগত কৃতিত্ব দেখাবার স্থান এটা নয়।

বিমান দিয়ে বড় রকমের আক্রমণ

মুসোলিনী যে বিমান দিয়ে আকাশ অন্ধকার ক'রে আক্রমণ চালাবার কথা বলেছিলেন সে রকম আক্রমণ জার্ম্মানী চালিয়েছিল ১৯৪০ সালের ১৪ই মে তারিখে হল্যাণ্ডের রটারড্যাম সহরের উপর। রটারড্যামে জার্ম্মান বিমানকে বাধা দেওয়ার কোন ফাইটার তো ছিলই না, এমন কি সমস্ত সহরে বিমানমারা কামানের সংখ্যাও ছিল একেবারে নগণ্য। আক্রমণের প্রথম কয়েকমিনিটের



মধ্যেই সেই সব কামান চুপ করে গেল তারপর জার্ম্মান বিমানদল ঘুরে ফিরে দেখে শুনে ইচ্ছামত তিনঘণ্টা ধ'রে সহরের মাঝখানে নিশ্চিন্তমনে বোমা ফেলে গেল। এক বর্গমাইল স্থানের মধ্যে ঘর-বাড়ী সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এইরকম আকাশ অন্ধকার-করা বিমানের ঝাঁক জার্ম্মানীতেও বহুবার হানা দিয়েছে। হামবুর্গে হাজার হাজার বৃটিশ বিমান দিনের পর দিন এই ভাবেই বোমা ফেলেছে। বার্লিনে বৃটিশ ও আমেরিকান মিলিত দল এক সঙ্গে দুই



হামবুর্গ সহরের একটি রাস্তা—বৃটিশ বিমান হানার পর

হাজারের উপরও গিয়ে পৌঁচেছে। তখন অবশ্য জার্ম্মানীর জঙ্গী বিমানবহর প্রায় ধ্বংস হয়েছে, নীচের রক্ষাব্যবস্থাও গুরুতরভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। প্রথমে ফ্লাইংফোর্টেস্ ও পরে সুপারফোর্টেস্ দিয়ে আমেরিকা টোকিও, ইয়োকো-

হামা, নাগাসাকীর উপর এই ভাবেই বোমা ফেলেছে। সুপারফোর্টেস্-এর বোমা ফেলা অদ্ভুত ধরণের। পরে সে কথার আলোচনা করা যাবে।

ভারী দল নিয়ে বোমা ফেলার সময় কাছাকাছি কয়েকটি জায়গায় আক্রমণ করা হয় একই সময়ে এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে এতে বিপক্ষ দল হতভম্ব হ'য়ে পড়বে এবং তাদের আত্মরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে।

ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে অনেকেই আপশোষ করেছেন দিনের পর দিন হাজার হাজার বিমান পাঠিয়ে কেন আক্রমণ করা হয় না! হাজার দূরে যাক্, বিশ পঁচিশ খানা বিমান রোজ রোজ শত্রুর দেশে পাঠাতে হ'লে যে কি বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন হয় সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা অনেকের নাই। কুড়ি পঁচিশখানা বিমানের একটি দলকে যদি সচল রাখতে হয় তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করবার জন্য আগে থেকেই অন্ততঃ দেড় হাজার লোকের দরকার। পেট্রল, বোমা, মেসিন গানের গুলি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সব সময় তৈরী রাখতে হবে। বৈমানিকদিগের শিক্ষার জন্য স্কুল, কলেজ, যারা ফোটো তুলবে, যারা রেডিও যন্ত্রে কাজ করবে, যারা আবহাওয়া পর্য্যবেক্ষণ করবে, যারা টেলিভিশন ও টেলিফোনের কাজ করবে, যারা জখম বিমান মেরামত করবে, যারা প্যারাস্যুট তৈয়ারী করবে, তাদের শিক্ষার জন্য ব্যাপক বন্দোবস্ত করে রেখে তারপর বিমান দলকে আকাশে পাঠাতে হবে। কুড়িখানা দূর-পাল্লার বিমানে একবার যাতায়াতের পেট্রল খরচ কম ক'রে ধরলেও দশহাজার গ্যালন। দু'টন করেও যদি বোমা নিয়ে যাওয়া যায় তবে কুড়িখানা বিমানের জন্য দরকার চল্লিশ টন বোমা, এ ছাড়া মেসিন গানের গুলি তো আছেই। পেট্রল আনতে হবে দূর থেকে, বোমা আনতে হবে কারখানা থেকে, এগুলি আগে থেকেই বিমান ঘাঁটিতে এনে লুকিয়ে রাখতে হবে। এই সব জিনিসপত্রের নিয়মিত জোগান দেওয়া, শত্রুর সন্ধানী বিমানের চোখ এড়িয়ে দূর দূরান্তর থেকে জিনিসগুলি এনে জমা করা ভয়ানক শক্ত কাজ।

এইবার বিমান সম্বন্ধে দু' একটা কথা আলোচনা করা যাক। বিমান খুব নূতন জিনিস না হ'লেও বেশীদিন হয় এর প্রচলন হয় নাই।

এয়ারোপ্লেন আবিষ্কারের কথা

জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যেদিন প্রথমে দেখল যে সে মাটির বুক ছেড়ে আকাশের দিকে এক পা উঠতে পারে না অথচ ডানাওয়ালা জীব পাখী অনন্ত আকাশে যদৃচ্ছা ভেসে বেড়াতে পারে সেইদিন থেকেই তার অন্যতম সাধনা হ'ল, "কেমন ক'রে উড়তে পারব।" আজ মানুষ আকাশে ইচ্ছামত উড়ে বেড়ায়, ঘণ্টায় সে আকাশের বুকে ছুটতে পারে চারশ' মাইল বেগে, কিন্তু এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রতে তার কিছু কম দিন লাগে নাই।

রামায়ণে দেখা যায় রাবণের পুষ্পক রথের কথা, ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়ালে লুকিয়ে যুদ্ধ করার গল্প। এমনি ধরণের কথা গ্রীক পুরাণেও আছে। সেখানে যে গল্পটি আছে সেটা হ'চ্ছে এই যে, সে দেশে ডিডেলাস্ ব'লে ছিল এক অতি চতুর শিল্পী। একবার কি একটা কারণে রাজরোষে প'ড়ে ডিডেলাস্কে যেতে হ'ল কারাগারে কিন্তু তার শিল্পিমনই তাকে কারাগার থেকে পালিয়ে যাবার পথের সন্ধান দিল। দুখানা মোমের ডানা তৈরী ক'রে দেহের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ডিডেলাস্ শেষ পর্য্যন্ত কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হ'ল। ডিডেলাস্ তার ছেলে আইকেরাস্কে শিখিয়ে গেল এই আকাশে ওড়ার বিদ্যা আর সেই সূত্রে তাকে উপদেশ দিল যেন সে কোন কারণেই আকাশে খুব উপরেও না ওঠে আবার বেশী নীচ দিয়েও না চলে। অনেক উপরে উঠলে সূর্য্যের তাপে মোমের ডানা গ'লে যাবার যেমন ভয় আছে—আবার বেশী নীচে নামলে সমুদ্রের ঢেউ লেগেও তেমনি ডানা ভিজে যাবার র'য়েছে সম্ভাবনা। শেষ পর্য্যন্ত আইকেরাস্ কিন্তু একটু একটু ক'রে অনেক উপরে উঠেছিল আর পুরাণকারের মতে মোম গ'লে প'ড়ে গিয়েছিল ইজিয়ান সাগরে। এসব হ'ল পুরাণের অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের অনেক আগের ঘটনা।

প্রায় সাতশ' বছর আগে রজার বেকন (Roger Bacon) নামে একজন ইংরাজ ধর্ম্মযাজকের লেখার মধ্যে ছিল একটা প্রকাণ্ড ভবিষ্যৎ বাণী। রজার বেকন লিখে গিয়েছিলেন, "মানুষ একদিন এমন যন্ত্র তৈরী ক'রতে পারবে যার মধ্যে ব'সে যন্ত্রের কল-কব্জার সাহায্যে দুখানা কৃত্রিম পাখা চালিয়ে সে আকাশে পাখীর মত ভেসে বেড়াতে সক্ষম হবে।" এ ভবিষ্যৎ বাণী যে সফল হ'য়েছে তা বেকন দেখতে না পেলেও আমরা বেশ দেখতে পারছি।

ঠিক কি ভাবে প্রথম বিমান আবিষ্কার হ'ল এবং কি ভাবেই বা তা আজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে গ'ড়ে উঠেছে সেই কথা বলি। উড়বার জন্য মানুষ প্রথম যে যন্ত্র তৈরী ক'রেছিল সে ছিল বেলুন জাতীয়। মন্টিগলফায়ার পরিবারের দুই ভাই একদিন এক চিমনীর পাশে ব'সে গল্প ক'রছিলেন—নিতান্ত পারিবারিক আলোচনা—তার মধ্যে বিজ্ঞানের কথা ছিল না একটাও। কথা ব'লতে ব'লতে দুই ভাই লক্ষ্য ক'রলেন কতগুলি কাগজের ঠোঙ্গা মাটি থেকে আপনা হ'তে ক্রমাগত উপরে উঠতে উঠতে শেষ পর্য্যন্ত চিমনীর মুখ পর্য্যন্ত যাচ্ছে এবং হঠাৎ চিমনীর মধ্যে যেয়ে প'ড়ে একেবারে পুড়ে ভস্মে পরিণত হ'চ্ছে। মন্টিগলফায়ার ভ্রাতৃদ্বয় এ থেকে সিদ্ধান্ত ক'রলেন আগুনের তাপে বাতাস গরম হ'চ্ছে ব'লে ঠোঙ্গার মধ্যেকার বাতাস হ'চ্ছে হাল্‌কা, আর তারই জন্য ঠোঙ্গাটা বাতাস ঠেলে উপরে উঠছে। তাঁদের মনে ধারণা হ'ল হাল্‌কা বাতাস ভ'রে দিতে পারলে এমনিধারা রবারের ঠোঙ্গাও আকাশে উঠতে পারবে। এই থেকেই হ'ল বেলুনের উৎপত্তি আর বেলুনের সূত্র ধ'রে জেপ্‌লিনের আবিষ্কার।

এই বেলুন অথবা জেপ্‌লিনের মূল তথ্য কি? এগুলি আকাশে ভাসে কেন? এগুলিতে থাকে বাতাসের চাইতে হাল্‌কা গ্যাস এবং সেইজন্য এগুলি নীচে ঘন বায়ুর মধ্যে নামতে পারে না, বরঞ্চ বায়ুর ঊর্দ্ধচাপে ক্রমাগত উপরে উঠতে থাকে। প্রথম দিকে পরীক্ষার জন্য যে সব বেলুন আকাশে উঠত, তার নীচে থাকত একটা খাঁচা এবং সেই খাঁচাতে লোক ব'সত মাত্র দু একজন।

পরে যখন জেপ্‌লিন আবিষ্কার হ'ল তখনও তার নীচে জুড়ে দেওয়া হ'ল এক একখানা বড় খাঁচা আর এতেই হ'ল আরোহীদের ব'সবার ব্যবস্থা।

বেলুন-বিমান চালাতে যে বিপদ না ঘটে তা কিন্তু নয়। অল্পদিন আগেও ইংরাজদের জেপ্‌লিন জাতীয় উড়ো-জাহাজ 'আর ১০১'—(R 101) ধ্বংস হ'য়ে মোট আটচল্লিশ জন আরোহীর জীবনান্ত ঘটে এবং সেই দুর্ঘটনায় তৎকালীন বিমান-মন্ত্রী লর্ড টমসন্ আর স্যার সেফটন্ ব্র্যানকার নিহত হন। অল্পদিনের মধ্যেই যুক্তরাজ্যেরও এমনিতর বিরাট পোত 'অ্যাক্রোন' নষ্ট হয় চুয়াত্তর জন লোক নিয়ে। আর ১০১ ধ্বংস হওয়ার পর ইংলণ্ডে এই ধরণের বিমানপোত নির্ম্মাণ বন্ধ হ'য়ে গেছে, কিন্তু আমেরিকাতে এখনও এ চেষ্টা সমানভাবেই চ'লেছে।

এয়ারোপ্লেন আবিষ্কারের পর এই বেলুন-বিমান ব্যবহারের কোন সার্থকতা আছে কিনা এ নিয়ে অনেক তর্ক আছে। যাঁরা এই শেষোক্ত শ্রেণীর বিমান পোত ব্যবহারের পক্ষপাতী তাঁরা বলেন এর ব্যবহারে প্রধানতঃ পাঁচটি স্থবিধা আছে। (১) এয়ারোপ্লেনের চাইতে অনেক সহজে এই বেলুন-বিমানগুলিকে ঘোরান ফেরান সম্ভব, বিশেষ ক'রে আকাশে উঠতে পারে এগুলি অতি সহজে। (২) এতে আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেশী অস্ত্রশস্ত্র গোলা বারুদ রাখা চলে। এয়ারোপ্লেন আয়তনে ছোট হয়, তার মধ্যে আবার থাকে অনেক রকম কলকব্জা স্থতরাং তাতে যত ভার বহন করা সম্ভব হয়, জেপ্‌লিন্ জাতীয় বিমানে তার চাইতে অনেক বেশী অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখা চলে অর্থাৎ এগুলির ভারবহনের ক্ষমতা হয় এয়ারোপ্লেনের চাইতে অনেক বেশী। (৩) এই সব বেলুন-বিমান বাতাসের মধ্যে অনেকক্ষণ এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে। এয়ারোপ্লেনে কোন রকমেই এটা হ'তে পারে না। তার পক্ষে এক জায়গায় পাঁচ সাত সেকেণ্ডের বেশী দাঁড়ান অসম্ভব। বেলুন-বিমানগুলি একস্থানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে ব'লে এ থেকে বোমা ফেলার স্থবিধা হ'তে পারে অনেক বেশী, আর এইজন্যই লক্ষ্য স্থির ক'রে কামান বন্দুক চালিয়ে যুদ্ধ করার এগুলিতে যথেষ্ট স্থবিধা হয়। (৪) এগুলি এয়ারোপ্লেনের চাইতে একটানা বেশী সময় আকাশে থাক্‌তে পারে এবং

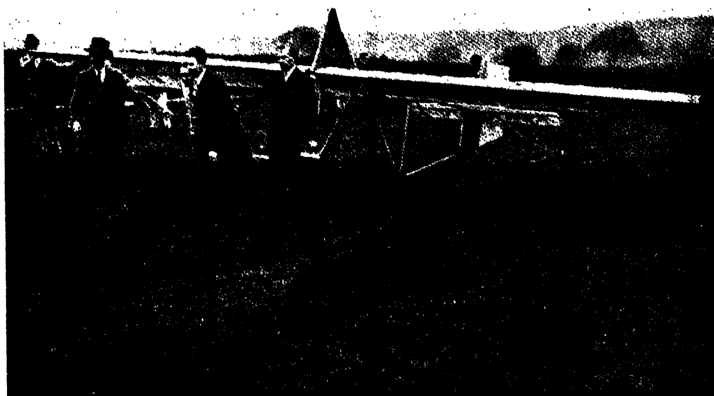
(৫) বেলুন-বিমান এয়ারোপ্লেনের চেয়ে অনেক সহজে রাত্রিকালেও চলাচল ক'রতে পারে।

এয়ারোপ্লেনের কলকব্জার উন্নতি হওয়ায় অবশ্য এখন রাত্রেও এয়ারোপ্লেন চালান যায়, কাজেই সেদিক্ থেকে বেলুন বিমানের বিশেষ কিছু সুবিধা র'য়েছে ব'লে দাবী করা চলে না। অনেক রকম দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এখন এয়ারোপ্লেন ও জেপ্‌লিনের সুবিধা অসুবিধা তুলনা করা হচ্ছে এবং তার ফলে শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে সব কিছু বিবেচনা ক'রে এয়ারোপ্লেনই বেশী সুবিধাজনক।

এয়ারোপ্লেনের আদিম ইতিহাস এক রকম ব্যর্থতারই ইতিহাস। তবুও সে ইতিহাসের আলোচনা করার দরকার আছে, কারণ তা থেকে অতি পরিষ্কার বোঝা যায় যে সাধনা দ্বারা মানুষ কত দূর এগুতে পারে। এই উপলক্ষে ইংরাজ বিমানবিদ্ সার জর্জ্জ কেলীর নাম উল্লেখ করা দরকার সবার আগে। এয়ারোপ্লেন চালনার মূল সূত্রের অনেকগুলি তিনিই আবিষ্কার করেন সর্ব্বপ্রথম এবং নিজের মীমাংসায় পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে তিনিই প্রথম এয়ারোপ্লেন তৈরী করেন। কেলীর বিমান চালনা ক'রবার জন্য যে মোটার ব্যবহার করা হ'য়েছিল সেটা চ'লেছিল বারুদের বিস্ফোরণে এবং সত্যসত্যই এ বিমান আকাশে কয়েক গজ উঠতে সমর্থ হয়েছিল। সার জর্জ্জ কেলীর কোচম্যান ছিল এই প্রথম বিমানের প্রথম চালক। বিমানখানি যখন মাটি ছেড়ে আকাশে উঠতে আরম্ভ ক'রল তখন এই আদি পাইলট এমনতর 'রাক্ষুসে কাণ্ডে' সত্যই বড় ভ'ড়কে গেল। পাইলট হিসাবে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বিমান কিছুতেই আকাশে উঠতে পারবে না—তাই শেষ পর্য্যন্ত একে আকাশে উঠতে দেখে তার পক্ষে ভয় পাওয়াটা অসম্ভব ছিল না মোটেই। ভয় পেয়ে এই আদি পাইলট দিল উড়ন্ত বিমান থেকে নীচের দিকে একটা লাফ এবং তাতেই ঘ'টল তার জীবনান্ত।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদিকে আর উল্লেখযোগ্য কোন কাজই হয় নাই। এই সময় ইংলণ্ডে ওয়েনহ্যাম আর স্ট্রিঙ্গফেলো এদিকে নানা রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ ক'রলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর সর্ব্বত্র আরম্ভ হ'ল এদিকে

বাস্তব প্রচেষ্টা। একে একে নানা দেশে অনেকগুলি ক'রে যন্ত্র তৈরী হ'তে লাগল। যে সব বৈজ্ঞানিক এই সাধনায় আত্মনিয়োগ ক'রলেন তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য অষ্ট্রেলিয়াতে হারগ্রেভ, ফ্রান্সে ভিক্টর ট্যাটিন এবং আমেরিকায় অধ্যাপক ল্যাংলী। প্রধানতঃ ল্যাংলীর প্রচেষ্টার ফলেই আবিষ্কৃত হ'ল গ্লাইডার। এই গ্লাইডারগুলিতে এক জনের বেশী আরোহী এবং কোন মোটার থাকে না।



গ্লাইডার

এই গ্লাইডারের উন্নতি হয় জার্মান বৈজ্ঞানিক অটো লিলিয়েনথলের চেষ্টায়। ১৮৯৩ সাল থেকে এই দুঃসাহসিক জার্মান বৈজ্ঞানিক বিমান তৈরীর কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন এবং তাঁরই যন্ত্র অবলম্বন ক'রে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় আবিষ্কার করেন সত্যি-কারের এয়ারোপ্লেন। লিলিয়েনথল তাঁর গ্লাইডার নিয়ে দুঃসাহসিক পরীক্ষায় মত্ত হ'য়ে গেলেন—তাঁর একই সাধনা হ'ল, এই গ্লাইডারের উন্নতি, এবং এই দিকে কিছু ক'রতে যেয়েই ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে হঠাৎ গ্লাইডার উল্টে ঘ'টল তাঁর মৃত্যু।

আজকালকার দিনের যে এয়ারোপ্লেনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তার আবিষ্কর্ত্তা আমেরিকার রাইট ভ্রাতৃদ্বয়। উইলবার আর অরভিল রাইট ১৯০০ সাল থেকে তাঁদের পরীক্ষা স্থরু করেন এবং ১৯০৩ সালে আপনাদের তৈরী বিমানে আটান্ন সেকেণ্ড, অর্থাৎ এক মিনিটেরও কম সময় আকাশে উড়ে তাঁরা প্রমাণ করেন যে আকাশে ওড়া সম্ভব শুধু নয়, স্থবিধাজনক হবারও বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এই সময় ইউরোপ-আমেরিকার প্রায় সব দেশেই এয়ারোপ্লেন আবিষ্কারের যথেষ্ট চেষ্টা হ'চ্ছিল। ১৯০৪ সালে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় একবারও না থেমে একটানা চব্বিশ মাইল উড়তে সমর্থ হ'লেন আর তার ফলে সমস্ত পৃথিবী অবাক হ'য়ে স্বীকার ক'রল যে—'হ্যাঁ, ওড়া সত্য সত্যই সম্ভব'।

পালকের মত একটা হাল্‌কা জিনিসও বাতাসে অনেকক্ষণ ভেসে থাকতে পারে না, আপনার ভারে আপনি প'ড়ে যায় অথচ ভারী একখানা এয়ারোপ্লেন কি ক'রে যে আকাশে ভেসে থাকতে পারে—শুধু ভেসে থাকা কেন উড়ে বেড়াতে পারে——এটা ভাবলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হ'তে হয়। কি ক'রে যে এটা সম্ভব হ'য়েছে সেই কথাই এবার আলোচনা ক'রব। বাতাস ও জলের একটা বিশেষ গুণ এই যে এগুলি স্বভাবতঃই এর মধ্যস্থিত কঠিন পদার্থকে উপরের দিকে ঠেলে তুলতে চায়, বৈজ্ঞানিকের ভাষায় এটাকে বলা যায় ঊর্দ্ধচাপ। এই ঊর্দ্ধচাপের জন্য সব জিনিসই কম বেশী বাতাসে ভেসে থাকতে চেষ্টা করে। বাস্তবিক পক্ষে জিনিসটা ভেসে থাকবে কিনা সেটা ষোলআনা নির্ভর ক'রবে বাতাসের ঊর্দ্ধচাপের উপর আর জিনিসটার ওজনের উপর। চাপের চেয়ে ওজন বেশী হ'লে জিনিসটা ডুবে যাবে অথবা নীচে প'ড়বে, আবার চাপ বেশী হ'লে জিনিসটা ক্রমেই উপর দিকে উঠতে থাকবে। এই ঊর্দ্ধচাপ আবার নির্ভর করে জিনিসের আয়তনের উপর—আয়তন যত বাড়বে চাপও তত বাড়বে এই হ'ল বৈজ্ঞানিক সত্য। এই জন্যই সাধারণ একটা বেলুন বাতাসে ভাসে না কিন্তু যদি বেলুনটি হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে ভরা যায় তবে সেটা আপনা থেকেই বাতাসের মধ্যে উপরের দিকে উঠে যেতে থাকে। এই তথ্যের সাহায্য নিয়েই তৈরী হয় জেপ্লিন।

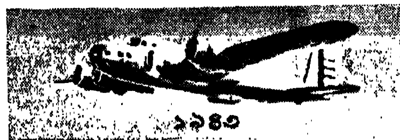
এয়ারোপ্লেন বাতাসের চাইতে অনেক ভারী, তবুও এটা কি ক'রে আকাশে ভাসে সেকথা আলোচনা করা যাক। একখানা ঘুড়ি আকাশে ওড়ে কি ক'রে? যদি বাতাস না বয় তবে সাধারণতঃ বেশ খানিকটা সুঁতো ছেড়ে বাতাসের বিপরীত দিকে দৌড়ে গেলে ঘুড়িখানা উপরে উঠতে থাকে এবং খানিকটা উঠে গেলে উপরে হাওয়া পেয়ে সেটা আপনা থেকেই বাতাসে ভাসতে থাকে। এই উদাহরণ থেকে একটা কথা বেশ বোঝা যায় যে ঘুড়িখানাকে আকাশে তুলতে হ'লে হয় বাতাস ন'ড়বে অথবা ন'ড়বে ঘুড়ি। উপরে বাতাসের স্রোত থাকে বলে একবার যখন ঘুড়িখানা উপরে উঠে যায় তখন এটা সহজে মাটিতে প'ড়ে যায় না। এয়ারোপ্লেনের বেলাও ঠিক এই রকমই হয়। ঠিক এই মূল সূত্রই প্রমাণিত হয় যখন প্রথম প্রপেলার ঘুরে প্লেনখানা ক্রমে আকাশের দিকে উঠতে থাকে।

ঘুড়ি উড়তে হ'লে আরও একটা বিষয় সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা দরকার। সেটা হ'চ্ছে এই যে ঘুড়ির মাথা থাকবে সব সময় উপর দিকে, অর্থাৎ সব সময়ই বাতাস এসে ঘুড়ির গায়ে লাগতে হবে একটা কোণের সৃষ্টি ক'রে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ঘুড়ির লেজের দিকটা ইচ্ছা ক'রে ভারী ক'রে দেওয়া হ'য়ে থাকে। এই কোণে হাওয়া লাগার ব্যবস্থা থাকার জন্যই ঘুড়ির উপর দিকে বাতাসের কোন নিম্নচাপ থাকতে পারবে না—এরকম হ'লে বাতাস স্বভাবতঃই ঘুড়িখানাকে উপর দিকে ঠেলে রাখতে চাইবে এবং অকস্মাৎ ঘুড়িখানা নীচে প'ড়তে পারবে না।

এয়ারোপ্লেনের ডানা পাখীর ডানার মত নয় কোনমতেই সে কথা এখানে বলা দরকার। পাখীর ডানা আছে এবং দরকার মত সে তা নাড়তে পারে, এয়ারোপ্লেনের ডানা আছে কিন্তু সে ডানা থাকে স্থির। কোন রককেই সেটা নড়ান যায় না। এই ডানা এমনভাবে তৈরী যে এতে বাতাস আটকে যায় একটা কোণ ক'রে। উড়বার এই মূল তথ্য এবং এই তথ্যের উপরই নির্ভর করে এয়ারোপ্লেনের সব কিছু। এ ছাড়া আর যত কিছু যন্ত্র সেগুলি অন্যান্য বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে উদ্ভাবন করা হ'য়েছে।

এয়ারোপ্লেনের সাহায্যে মানুষ অনেক কিছু কাজ হাসিল ক'রেছে। এরই

সাহায্যে দুর্জ্জয় হিমালয়ের ঊনত্রিশ হাজার ফুট উঁচু শৃঙ্গ মানুষ জয় ক'রেছে—দূরকে নিকট ক'রেছে। আরও কি তার দ্বারা সম্ভব হবে—উঁচু—আরও কত উঁচুতে এই কৃত্রিম পাখী মানুষকে নিয়ে যাবে—সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রবার সময় আজও আসে নাই—ভবিষ্যতে কোন দিন আসবে কিনা তা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত র'য়েছে।



আধুনিক প্লেন—১৯৪৩ সাল

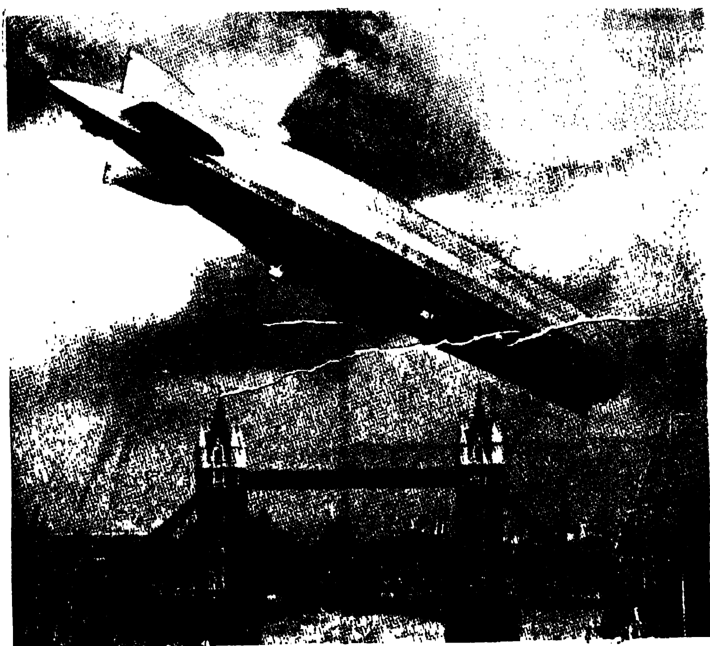
জেপ্‌লিন্—আধুনিক এয়ারোপ্লেনের অগ্রজ

• ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে বিমানের ব্যবহার হয় কিন্তু তখন বিমানের বহুল প্রচলন হয় নি একথা আগেই বলা হয়েছে। সে যুদ্ধে একপ্রকার বিমান বেলুন ব্যবহার করা হয়েছিল—তার নাম ছিল জেপ্‌লিন। জার্ম্মানীর কাউণ্ট জেপ্‌লিন ছিলেন এর আবিষ্কারক। পরের ছবিখানি দেখলেই জেপ্‌লিন যে আকারে কত বড় তা অনেকটা ধারণা করা যাবে।

এই জেপ্‌লিনগুলি ছিল সাড়ে ছয় শ' ফুট লম্বা আর আশী ফুট ব্যাসের এবং নীচের খাঁচাখানিতে ছিল লোক বসবার জায়গা। এই জেপ্‌লিনও চলতো তেলে এবং বার হাজার ফুট পর্য্যন্ত উঁচুতে অনায়াসেই উঠতে পারতো। কলকব্জার উন্নতির ফলে আধুনিক নয় দশ টন ওজনের জেপ্‌লিনগুলির গতিবেগ দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় পঞ্চাশ থেকে ষাট মাইলের মধ্যে। এই সব জেপ্‌লিনে লোকও থাকে পনর থেকে কুড়ি জন।

আকাশ থেকে লণ্ডন সহরের নিরস্ত্র নাগরিকদের উপর প্রথম আক্রমণ হয় ১৯১৫ সালের ৩১শে মে। এই আক্রমণ চালানো হয় "এল জেড্ ৩৩" (LZ33) নামে জার্ম্মান জেপ্‌লিন থেকে। তার কিছু আগে ১৯১৪ সালে পৃথিবীর চুয়াল্লিশটি রাষ্ট্র হল্যাণ্ডের হেগ নগরীতে সমবেত হয়ে সিদ্ধান্ত করেন যে আকাশের

বুক থেকে জেপ্‌লিন দিয়েই হোক বা বিমান দিয়েই হোক, কোন বিস্ফোরক ছোঁড়া হবে না। কিন্তু সমবেত চুয়াল্লিশটি রাষ্ট্রের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত মাত্র সাতাশটি রাষ্ট্র এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন। যে কয়েকটি রাষ্ট্র স্বাক্ষর করেন নাই, তাদের মধ্যে জার্ম্মানী অন্যতম।



জেপ্‌লিন

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের সূত্রপাতেই জার্ম্মানী ফরাসী সীমান্তে জেপ্‌লিনের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণের কাজ চালাচ্ছিল। বিস্ফোরক ছোঁড়ার জন্য জেপ্‌লিনের ব্যবহার তখনও আরম্ভ হয় নাই কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ মহলে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা সুরু হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে

অনেকবার ইতস্ততঃ করে বিগত মহাযুদ্ধের নায়ক জার্ম্মান সম্রাট কাইজার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জেপলিন আক্রমণে সম্মতি দিলেন।

ইংলণ্ডের উপর আক্রমণ চালাতে প্রথম যে জেপলিন পাঠান হয়েছিল, দৈব-দুর্ব্বিপাকে ইংলিশ চ্যানেলের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত যেয়েই কলকব্জা খারাপ হয়ে যাওয়ায় সেখানা ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। অবশেষে দেড় টন ওজনের ত্রিশটি অতি বিস্ফোরক ও উননব্বুইটি আগুনে বোমা নিয়ে এই LZ 33 যাত্রা করলো। জেপলিনখানি দশ হাজার ফুট উঁচু থেকে ঘুমন্ত লণ্ডন সহরের বুকের উপর প্রথম বোমা ফেললো ১৯১৫ সালের ৩১শে মে রাত্রি পৌনে এগারটার সময়। সহরের উপর বোমা ফেলা যুদ্ধে এই প্রথম। বোমা ফেলেছিল জার্ম্মানী এবং প্রথম আঘাত পড়েছিল লণ্ডনের উপর। অনেকগুলি বোমাই পড়েছিল হাইড্ পার্কে ও জলের উপর; মাত্র কয়েকটি বোমাই ঘর বাড়ী ভেঙ্গে কিছু ক্ষতি করে, লোকজনও কিছু মারা যায়। সেদিন যুদ্ধের এই নূতন ধারার পরিচয় পেয়ে ইউরোপে ও আমেরিকায় আলোচনা হয়েছিল বিস্তর।

এই হল প্রথম বিমান আক্রমণের ইতিহাস। বিমানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিমান আক্রমণ কত ব্যাপক হয়েছে আজ তা ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য্য হতে হয়।

এয়ারোপ্লেনের ক্রমোন্নতি

১৯১২ সালে ইংলণ্ডের সমর দপ্তর ঘোষণা করেছিলেন যে যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হ'তে হ'লে প্রত্যেক বিমানের থাকতে হবে কয়েকটা বিশেষ গুণ—সেগুলি হচ্ছে ঃ—

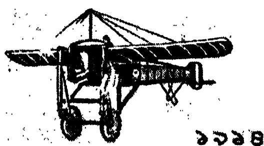
(১) স্থির আকাশে ঘণ্টায় অন্ততঃ পঞ্চান্ন মাইল গতিবেগ।

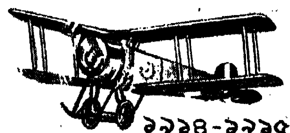
(২) সাড়ে চার ঘণ্টা ওড়বার জন্য যতটা তেল দরকার তা ছাড়া আরও সাড়ে তিন শত পাউণ্ড ভার বহনের ক্ষমতা।

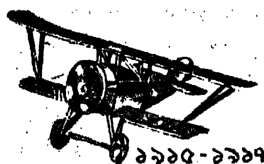
(৩) এক সঙ্গে কমপক্ষে তিন ঘণ্টা আকাশে ভেসে থাকা।

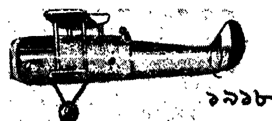
(৪) সাড়ে চার হাজার ফুট উঁচুতে উঠে যাওয়ার ক্ষমতা।

বলা বাহুল্য তখনকার দিনে এই ছিল শ্রেষ্ঠ বিমানের আদর্শ। আজ কিন্তু এই আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে নিতান্ত ছেলেখেলা। এখনকার বিমান ছুটতে পারে ঘণ্টায় চারশ মাইল বেগে। এক টন বা সাতাশ মনের বোমা ফেলে আসা এখনকার বিমানের পক্ষে অতি সাধারণ কথা। আকাশে এক টানা বার ঘণ্টা ভেসে থাকা বা পাঁচ মিনিটের মধ্যে এগার হাজার ফুট সোজা উপরে ওঠা

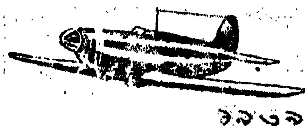












বিমানের ক্রমোন্নতি

আজকালকার বিমানের পক্ষে মোটেই একটা বিশেষ কিছু কঠিন কাজ ব'লে মনে হয় না। ১৯১৪ সাল থেকে পর পর বিমান গঠনের কিরূপ উন্নতি হয়েছে, উপরের ছবি থেকে তার একটা ধারণা হতে পারে।

১৯১৪ সালের যুদ্ধে যে সব বোমারু ও জঙ্গী বিমান ব্যবহার করা হয়েছিল

তার সঙ্গে এই যুদ্ধের বোমারু আর জঙ্গী বিমানের কৃতিত্বের একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। নীচের ছকটি দেখলেই বিষয়টা পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে। অবশ্য ১৯৪৪-৪৫ সালে অর্থাৎ যুদ্ধের শেষ দেড় দুই বছরে প্রত্যেক দেশই নূতন নূতন বিমানের সৃষ্টি করেছে, পুরাণো বিমানগুলির কার্য্যকারিতা অনেক দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সে সব সংবাদ গোপন আছে; মোটামুটি একটা ধারণা করা ছাড়া আমরা আধুনিকতম আবিষ্কার সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য জানতে পারি না।

বোমারু	১৯১৪ সালের যুদ্ধ	বর্ত্তমান যুদ্ধ
গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায়	৮০ মাইল	৩৫০ মাইল
উপরে ওঠবার ক্ষমতা	১৮ হাজার ফুট	৪০ হাজার ফুট
বোমা বইবার ক্ষমতা	২০০০ হাজার পাউণ্ড	৮০০০ পাউণ্ড
একটানা ওড়ার ক্ষমতা	৩০০ মাইল	৩৫০০ মাইল
জঙ্গী বিমান		
গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায়	১৩০ মাইল	৪৫০ মাইল
উপরে ওঠবার ক্ষমতা	১৫ হাজার ফুট	৩৭ হাজার ফুট
একটানা ওড়ার ক্ষমতা	১০০ মাইল	১২০০ মাইল

আগে অনেক সময় হঠাৎ তেল ফুরিয়ে যেতে অনেক বিমান অনেক বিপদে পড়েছে। কতক বা একেবারে সমুদ্রের বুকে প'ড়ে তলিয়ে গেছে, আবার কতক বা শত্রুর দেশে এমন কি শত্রুর ঘাঁটির মধ্যে নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছে। এই সব দুর্দ্দশার হাত থেকে বাঁচবার জন্য আজকাল বিমানগুলোর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ তেল দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও অসুবিধা আছে বিস্তর। প্রথমতঃ গুলি গোলা তেল ও আসবাবপত্রের জন্য বিমানের আকার অত্যন্ত বড় হয়ে পড়ে এবং তার ফলে এর গতিবেগ যায় কমে। আবার অন্য দিকে যদি

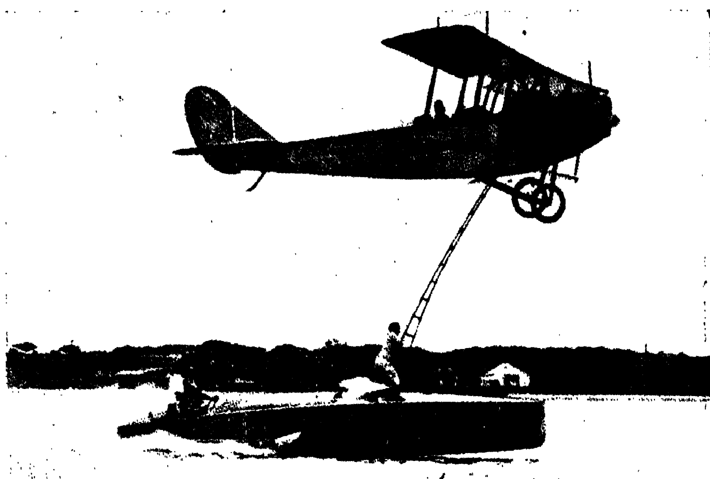
বিমানখানা নষ্ট হয়ে যায় তবে অনেকটা তেলও তার সাথে সাথে নষ্ট হয়। আজকালকার দিনের যুদ্ধে এক ছটাক তেলেরও অপব্যয় করা চলে না। এইজন্য আজকাল এক এক খানা বিমানের সাথে সাথে বিমানের আবশ্যক মত তৈলবাহী বিমান পাঠান যেতে পারে। যদি কোন কারণে অকস্মাৎ কোন বিমানের তেল ফুরিয়ে যায় তবে বিমানখানা নীচে না নেমে চট্ করে তৈলবাহী বিমান থেকে নলের সাহায্যে প্রয়োজন মত তেল নিয়ে নেয়।



উড়তে উড়তে এক বিমান অন্য বিমান থেকে তেল নিচ্ছে

আকাশের বুকে উড়তে উড়তেই এক বিমান থেকে আর এক বিমানে তেল নেওয়া হয় কথাটা শুনে অনেককেই হয় তো আশ্চর্য্য হ'তে হবে কিন্তু এখনকার দিনে নীচে না নেমে উপরে উড়ন্ত অবস্থায়ই যে নীচের চলন্ত জাহাজ বা মোটর থেকেও অনায়াসে বিমানে নাবিক পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় এটা প্রমাণ হয়ে গেছে।

উপরের বিমানখানার গতি এমনভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়, যাতে নীচের মোটর আর জাহাজের গতি আর বিমানের গতি হয়ে পড়ে সমান। তখন জাহাজ থেকে বিমানে বা বিমান থেকে জাহাজে লোক চলাচল করতে পারে।



চলন্ত মোটর-বোট থেকে চলন্ত বিমানে লোক উঠ্‌ছে

যুদ্ধের জন্য যে সব বিমান সর্ব্বদা ব্যবহার করা হয় তাদের শ্রেণী বিভাগ করা যায় কি ভাবে? সাধারণতঃ রণ-বিমান দিয়ে তিন রকম কাজ করা হয়ঃ—

(১) বিপক্ষ শিবিরের তথ্য সংগ্রহ।

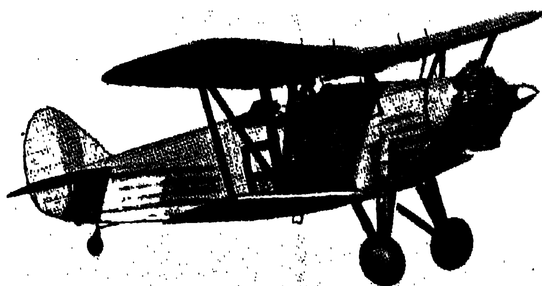
(২) শত্রুপুরীতে, জাহাজে, বোমা, টরপিডো বা মাইন, রকেট ফেলা।

(৩) বিমান-যুদ্ধ।

পর্য্যবেক্ষক বিমান

প্রথম শ্রেণীকে বলা হয় পর্য্যবেক্ষক বা সন্ধানী বিমান। এদের কাজ হল নিজের দেশে ঘুরে ফিরে পাহারাওয়ালার কাজ করা আর দরকার মত শত্রুর দেশে গিয়ে তাদের সব রকম খবর নিয়ে আসা।

এই সব বিমানের মধ্যে থাকে শক্তিশালী ক্যামেরা বা ফোটো তোলার যন্ত্র। শত্রুপক্ষের ঘাঁটিগুলির মাথার উপরে উড়ে উড়ে ক্যামেরার সাহায্যে তাদের অবস্থানের ও আয়োজনের, কল-কারখানার ও শিল্পকেন্দ্রের এবং প্রধান ঘাঁটির ফোটো তুলে নিয়ে আসাই হচ্ছে এই সব বিমানের কাজ। একাজেই বিপদের সম্ভাবনা খুব বেশী, কেন না নিজেদের গোপন কথাগুলো যাতে শত্রুপক্ষ



পর্য্যবেক্ষক বিমান

জানতে না পারে, এর জন্য সকলেই বিশেষ সাবধানে থাকে। দেখতে পেলেই শত্রু তাড়া করবে ও ঘায়েল করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে—এ কথা নিশ্চিত জেনেই তবে এদের বেরুতে হয়।

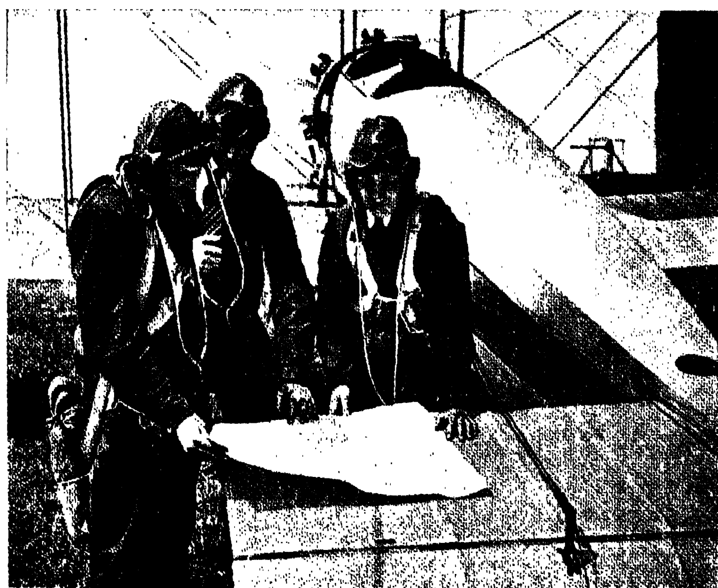
শত্রুর দেশে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকা একেই মুস্কিল তারপর আবার ফোটো তোলবার জন্য বিমানখানাকে অনেক নীচে নেমে আসতে হয়। এত নীচে আসতে হয় যে বিমান-মারা কামানগুলোর নাগালের মধ্যেই থাকে। তারপর যদিও বা ক্যামেরার সাহায্যে তাড়াহুড়ো ক'রে একটা ফটো তুলে নেওয়া গেল, তবুও হয়তো ফোটো ও সমস্ত সাজসজ্জা সুদ্ধ বিমানখানি ধরা পড়ে গেল

অথবা অন্য কারণে বিমানখানা নষ্ট হ'য়ে গেল। এর ফলে হয়তো শেষ পর্য্যন্ত ছবিখানা তোলা হলেও কর্ত্তৃপক্ষের হাতে এসে পৌছল না। অনেক চেষ্টায় এখন শত্রুপক্ষের ঘাঁটির ছবি তুলে নেওয়ার একটা নূতন পদ্ধতি বের হয়েছে। এখন উপর থেকে দূরবীণ-সংযুক্ত ক্যামেরার সাহায্যে শত্রু শিবিরের নিখুঁত ছবি তুলে নিয়ে 'টেলিভিশন' যন্ত্র দ্বারা একেবারে প্রধান ঘাঁটিতে কর্ত্তৃপক্ষের চোখের সম্মুখে পরদার উপর ফেলে দেওয়া যায়। এই কাজে এখন বিমানগুলির এক মিনিটের বেশী সময় লাগে না; তাছাড়া অনেক উপরে থাকার জন্য তারা অন্ততঃ কতকটা যে নিরাপদে থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অকস্মাৎ যদি কোন বিপদ আপদ ঘটেই তবু ছবিটা ঠিক উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত স্থানে এসে পৌছুবেই। টেলিভিশন জিনিসটা খুব হালের আবিষ্কার, এখনও এটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠেনি কিন্তু এর মধ্যেই তার সত্যিকারের প্রয়োগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

বোমারু বিমান

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিমানের নাম 'বোমারু' বিমান, ইংরাজীতে বলা হয় 'বমার' (bomber)। এগুলি হচ্ছে মোটের উপর অতিকায়। আসল যুদ্ধে যখন বিমানের ব্যবহার প্রথম আরম্ভ হয় তখন এই বোমারু বিমানগুলিকে পাহারা দেবার জন্য ছোট জাতের একরকম জঙ্গী বিমান পাঠান হোত কিন্তু আজকাল প্রায় সব দেশেই বিমানের যন্ত্রপাতির এমন উন্নতি হয়েছে যে এখন পাহারার জন্য কোন বিমান বোমারুর সঙ্গে প্রায়ই পাঠান হয় না। আত্মরক্ষা ও শত্রুক্ষয় দুই কাজের উপযোগী করেই আজকাল বোমারুগুলো তৈরী করা হয়। এই সব বোমারু বিমানগুলিতে সাধারণতঃ চারটি করে এঞ্জিন বসান থাকে, যাতে করে হঠাৎ এঞ্জিন বিকল হয়ে কোন বিপত্তি না ঘটে। তাছাড়া বোমারু বিমানকে আত্মরক্ষা করতে হবে বলে বেশ খানিকটা গোলাগুলি রাখতেই হয় এবং সেটা বিমানের মধ্যে এমনভাবে সাজিয়ে রাখতে হয়, যাতে শত্রু যে কোন দিক থেকে আক্রমণ করলেও বোমারু-গুলি আত্মরক্ষা করতে পারে।

এই সব বোমারু বিমানগুলিতে সাধারণতঃ তিন চার জন লোক থাকে। একজন পাইলট, একজন গোলন্দাজ, একজন নেভিগেটর এবং একজন বম্‌-ড্রপার। 'পাইলট' ও 'নেভিগেটর' বোমারুখানাকে চালিয়ে নিয়ে যান আর ঠিক নির্দ্ধারিত স্থানে উপযুক্ত মুহূর্ত্তে বোমা ফেলেন 'বম্‌-ড্রপার'। একটি বোতাম টিপলেই বাস, বিমানের মাঝামাঝি স্থানে একটা জায়গায় ঢাকনা খুলে যেতেই এক বা একাধিক বোমা খ'সে পড়ে টুপ করে—একেবারে লক্ষ্যবস্তুর উপর। গোলন্দাজ বা 'গানারের'



যাত্রার পূর্ব্বে নক্সা দেখা হচ্ছে

কাজ হ'ল শত্রুপক্ষের জঙ্গীর উপর নজর রাখা এবং নিজের কামানের পাল্লার মধ্যে আসলেই তাকে শেষ করে দেওয়া। বিমানে গোলন্দাজের সংখ্যা যত বেশী থাকবে বিমান হবে ততই নিরাপদ। প্রত্যেক বিমানে একজন করে গানার তো থাকেই—আজকালকার অতিকায় বিমানগুলিতে ৮ জন গানারও থাকে। যে

কোন দিক দিয়েই ফাইটার বোমারুকে আক্রমণ করতে আসুক না কেন, গানার তাদের সঙ্গে লড়াই করবার সুযোগ পায়।

বোমা ফেলবার আগে অনেকগুলি জিনিস লক্ষ্য করবার থাকে। প্রথমতঃ শত্রুর নাগালের বাইরে গিয়ে চলন্ত বিমান থেকে বোমা ফেলতে হবে। লক্ষ্যবস্তু কোথায় এ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। এজন্য লক্ষ্যবস্তুসমূহের অবস্থান চিহ্নিত করে বৈমানিকগণকে একটা ক'রে নক্সা দেওয়া হয়।

ঠিক উপযুক্ত সময় হ'লেই বিমানখানি টুপ করে নীচে নেমে যেই সুবিধা মত জায়গায় আসে, তখনি 'বোমা' ফেলা হয় আর তার পরই বিমানখানি শোঁ করে উপরে উঠে যায়। এইভাবে বোমা ফেলাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'ডাইভ বম্বিং' (Dive bombing)।

বোমা ফেলবার আগে বৈমানিককে হিসেব করতে হয়—বিমানের গতিবেগ, কতটা উঁচু থেকে সে বোমা ছাড়বে আর বাতাস কত জোরে বইছে। যে মুহূর্ত্তে বোমাটাকে ফেলা হয় ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বিমান চালক বিমানখানাকে রাখে স্থির ভাবে। এতে বিপদ কিন্তু কম নয়। কারণ বিমান স্থির হ'লেই শত্রুপক্ষের বিমানমারা কামানগুলো বিমানখানিকে দেবে ফুটো করে। খুব নীচে থেকে বোমা ছুঁড়তে গেলে লক্ষ্যবস্তুকে ঘায়েল করা অনেকটা সহজ বটে কিন্তু তাতে আক্রমণকারীর রয়েছে স্বখাতসলিলে ডুবে মরার সম্ভাবনা খুব বেশী। কেন না বোমা যখন ফাটবে তখন বিমানের গায়ে এসে লাগতে পারে তারই ফেলে দেওয়া বোমার টুকরো।

কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট বস্তুকে যখন নিশ্চিতভাবে ধ্বংস করার প্রয়োজন হয় তখনই নিযুক্ত হয় এই ডাইভ বম্বারের দল। বহু উঁচু থেকে তাক করে মাথা নীচু করে এগুলি ছুটে আসে একেবারে ঘণ্টায় চারশ এমন কি পাঁচশ মাইল বেগে, তারপর বোমা ফেলেই উপরে উঠে যায়। ডাইভ বম্বারেরা লক্ষ্যবস্তুর অত্যন্ত নিকটে আসে, তা ছাড়া বোমা ফেলা ও বিস্ফোরণ ঘটার মধ্যে সময়ের তফাৎ থাকে খুবই কম—এ জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এ ক্ষেত্রে কম।

একখানা গুলিগোলা বোঝাই জাহাজ চলেছে, রসদ নিয়ে একখানা ট্রেন চলেছে, মালপত্র ও সৈন্য বোঝাই কতগুলি লরী চলেছে রাস্তা দিয়ে, কোন জায়গায় বিমানমারা কামান নিয়ে একদল সাহসী গোলন্দাজ আক্রমণকারীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে সেই সময় দরকার হয় এই ডাইভ-বম্বিং-এর। জার্ম্মানীর ডাইভ বম্বারের দল প্রথম বছর খানেক সমস্ত ইউরোপকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। বমারের সঙ্গে অদ্ভুত রকমের বাঁশী বা সাইরেন লাগিয়ে বিকট শব্দ করতে করতে যখন বিমানগুলি নেমে আসত, তখন অনেক সাহসী গোলন্দাজও ভয় পেয়ে কামান ফেলে ছুটে পালাত। শত্রুপক্ষকে বিহ্বল করে দিতে ডাইভ-বম্বিং-এর মত আর কিছু নাই। কিন্তু কুছপরোয়া-নেই ভাবে সাহসে বুক বেঁধে যদি একবার দাঁড়ান যায় তবে ডাইভ-বমারকেই ঘায়েল করা সব চেয়ে সহজ। প্রতিপক্ষ যেখানে বিহ্বল না হয়েছে সেখানে রাইফেলের গুলিতে ডাইভ-বমার ঘায়েল হয়েছে এরকম দৃষ্টান্ত ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে অনেকবার দেখা গিয়েছে। ডাইভ-বমারকে তাক করবার জন্য প্রতিপক্ষ প্রায় সাত সেকেণ্ড সময় পায় কারণ ঐ সময়টা ডাইভ-বমার একই রেখায় দ্রুত নেমে আসে।

ডাইভ বম্বিং

হঠাৎ নেমে এসে বাজের মত ছোঁ মারা এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার রীতি গত যুদ্ধেই দেখা গিয়েছিল। কিন্তু জার্ম্মানীর ডাইভ-বম্বিং ঠিক সে রকম নয়। অনেকটা উপরে উঠে একদল বিমান লক্ষ্যের কাছাকাছি আকাশে ঘুরতে লাগলো—তারপর একপাশের বিমানখানা হঠাৎ বাঁ দিকে কাত হয়ে পড়লো, তারপর বিমানের মাথাটা নীচের দিকে ও লেজটা উপরের দিকে রেখে একেবারে সোজা লক্ষ্যের উপর ভীষণ বেগে ছুটে আসতে লাগলো—লক্ষ্যের ঠিক উপরে এসেই মাথাটা সামনের দিকে তুলে ধরা হল আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বোমা ছাড়া হল। বোমাও পড়ল আর বোঁ করে বিমানখানা লক্ষ্যের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। লক্ষ্য করবার ও শেখবার জিনিস এতে অনেক আছে।

লক্ষ্যটি যেন ফস্‌কে না যায়, তাকটি ঠিক ঠিক হওয়া চাই ; তারপর বোমাটি এমন সময় ও এমনভাবে ফেলতে হবে যে ফেটেখাওয়া বোমার টুকরাগুলি নিজের বিমানখানাকে ঘায়েল না করে। অর্থাৎ ডাইভিং এর পজিসন ছেড়ে দিয়েই বোমা ফেলতে হবে। সুইমিং ক্লাবে খুব উঁচু প্ল্যাটফরম্ থেকে হাত ও মাথা নীচের দিকে রেখে সাঁতারুরা যে লাফিয়ে পড়ে—ডাইভিং অনেকটা সেই ধরণের।

এই যুদ্ধ বাধবার আগে স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দলকে জার্ম্মানী সাহায্য করেছিল। সেই যুদ্ধে মাদ্রিদের (স্পেনের রাজধানী) উপর বোমা বর্ষণের সময় জার্ম্মান ডাইভ-বম্বিং-এর কথা সকলে শুনতে পায়। জার্ম্মানী অবশ্য বহু দিন ধরে চেষ্টা করে এই বিশেষ প্রথাটির অনেকটা উন্নতি করেছে। আমেরিকা ডাইভ-বম্বিং কি ভাবে শিখল এবং একদল বৈমানিক কি ভাবে জীবন উৎসর্গ করে শিক্ষার্থী পাইলটদিগকে এই প্রথায় রীতিমত ওস্তাদ করে তুলল সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা না বলা সঙ্গত হবে না।

প্রত্যেক দেশেই বিমান বহরের সঙ্গে একদল বৈমানিক থাকেন তাঁরা শিক্ষক, অভিজ্ঞ ফ্লাইট্-সার্জ্জেণ্ট। এঁরা পাইলটদের শিক্ষাকেন্দ্রে থাকেন বলে সাধারণ লোকে এঁদের কথা বেশী কিছু জানে না কিন্তু এঁরা না হলে বিমান চালনা এবং বোমা ফেলার ব্যাপারে নিত্য নূতন উন্নতি হয় না। যাঁরা ভাল পাইলট, যন্ত্র সম্বন্ধে সব খবর রাখেন, সাহসী ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, তাঁরা ঊনত্রিশ ত্রিশ বছর বয়স হলেই ট্রেনার (trainer) ফ্লাইট্-সার্জ্জেণ্ট হতে পারেন। বাছা বাছা বৈমানিক ছাড়া অন্য কেউ এরকম ফ্লাইট্-সার্জ্জেণ্ট হতে পারেন না।

ফ্লাইট্-সার্জ্জেণ্টরা ডাইভ-বম্বিং-এর কৌশল আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছেন। গবেষণা করে ও আকাশে উড়ে পরীক্ষাকে সফল করে তুলতে হবে। প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়ার সংকল্প নিয়ে কুড়ি জন ফ্লাইট্-সার্জ্জেণ্ট এগিয়ে গেলেন। একজন আকাশে উঠলেন—ত্রিশ হাজার ফুট যখন ওঠা হয়েছে তখন বিমানখানা আকাশে চক্র দিয়ে কয়েকবার ঘুরে গেল। তারপর হঠাৎ মাথা নীচু করে সোজা নেমে আসতে লাগল। পঁচিশ হাজার—কুড়ি হাজার—পনর হাজার—দশহাজার—পাঁচহাজার ফুট

দ্রুত বেগে বিমানখানা নেমে আসছে। অন্যান্য ফ্লাইট্-সার্জ্জেণ্টরা নিশ্বাস বন্ধ করে নামা দেখছেন। হাজার ফুট পর্য্যন্ত নেমে এলো। চোখের পলক ফেলতেই ৫০০ ফুট। এবার বিমানখানার মাথাটা এগিয়ে আসবে। কিন্তু কই—এল না। তীব্র আর্ত্তনাদ করে মুখটা মাটিতে বসে পড়লো—ভীষণ শব্দ—বিমানে আগুন ধরে উঠলো—সকলে ছুটে গিয়ে জ্বলন্ত প্লেনখানা থেকে বৈমানিকের মৃত দেহ উদ্ধার করলেন। সারা দেহ রক্তে ভেসে গিয়েছে—মুখে মাথায় চাপ চাপ রক্ত। কেন এমন হল? ৫০০ ফুট নীচে এসেও পাইলট প্লেনের মাথা তুলে ধরলেন না কেন? এঞ্জিনটা কি বিগড়ে গিয়েছিল? কৈ, না তো! শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তো এঞ্জিনটাই বিকট গর্জ্জন করছিল। কী এমন হ'য়েছিল যার জন্য এমন দুর্ঘটনা হ'ল! নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না। সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় একজন ফ্লাইট্-সার্জ্জেণ্ট প্লেন নিয়ে যাত্রা করলেন। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে গেলেন ১০০০ হাজার ফুট থাকতেই ইনি প্লেনের মাথা তুলে ধরবেন।

ঐ ত্রিশ হাজার ফুট থেকেই ডাইভ সুরু হ'ল। হলদে প্লেনখানা রোদের মধ্যে দিয়ে উল্কার মতন বেগে নেমে আসছে। কিন্তু এ কী—এখানাও যে উঠল না। কোন চেষ্টাই পাইলট করেছে বলে বোধ হল না। একটা প্রকাণ্ড উল্কা যেন সশব্দে মাটিতে মুখ গুঁজে বসে পড়ল। আরো একজন বৈমানিক প্রাণ দিলেন।

তৃতীয় বৈমানিক এবার যাত্রা করলেন। এ রহস্য তো ভেদ করতেই হবে। কী এমন হয় যে প্রয়োজন মত বিমানের মাথাটা সোজা করা যায় না? এবার ষ্টীয়ারীং হুইলের পাশে একখানা মোটা কাগজ এঁটে দেওয়া হয়েছে—ব্যাপার কি যতটা বোঝা যায় বৈমানিককে লিখতে হবে। তৃতীয় বৈমানিক উঠলেন—ত্রিশ হাজার ফুট থেকে ডাইভ সুরু হল—এখানাও ঠিক ঐরকম করেই শেষ হয়ে গেল। আর একজন বীরের চেষ্টা নিষ্ফল হ'ল। ফ্লাইট্-সার্জ্জেণ্টরা সকলে ছুটে গেলেন—এবার ব্লু-পেনসিলে বেশ স্পষ্ট করে লেখা—"২৫০০০ ফুট—চমৎকার। পা দু'টো রিম্ রিম করছে। ২০০০০ ফুট—অন্ধকার—মাথাটা—।" এই খানেই লেখাটা

শেষ হয়েছে। প্রাণদান বুঝি একেবারে নিষ্ফল হয় নাই—একটা ক্ষীণ সূত্র বুঝি পাওয়া গেল।

সেদিনের মত পরীক্ষা শেষ হ'ল। কয়েকদিন ধরে ফ্লাইট্-সার্জেণ্টরা আলোচনা, গবেষণা ও ছোটখাটো পরীক্ষা করে কাটালেন। এবার তাঁদের বুঝতে কষ্ট হ'ল না যে মাথা নীচু করে ডাইভ করবার সময় সমস্তটা দেহের রক্ত চলে আসে মাথায় এবং এর ফলেই পাইলট অজ্ঞান হয়ে যায়। মৃত পাইলটদের মুখে, চোখে ও নাকে চাপ চাপ রক্ত এই জন্যই দেখা গিয়েছিল।

এরপর আর একদিন আবার পরীক্ষা সুরু হ'ল। কোমরে পেটে খুব শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে একজন বৈমানিক উঠলেন। ত্রিশহাজার ফুট থেকে ডাইভ করে দশহাজার ফুট পর্য্যন্ত নেমে এলেন—তারপর মাথাটা ঘুরিয়ে সোজা করে ধীরে ধীরে নেমে আসলেন। আংশিক সাফল্যলাভ হয়েছে—বৈমানিক বল্লেন—মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছিল।

পর পর আরও কয়েকজন ফ্লাইট্-সার্জেণ্ট বিমানে উঠলেন—ডাইভ্ করলেন—প্রাণ হারালেন—তাঁদের লেখায় বোঝা গেল—মাটির কাছাকাছি এসে তাঁদের জ্ঞান ছিল না।

এবার তৈরী হ'ল রবারের বেল্ট। কোমরে ও পেটে জড়িয়ে সেটা বাঁধা হ'ল। সেই বেল্টের সঙ্গে যোগ করা হ'ল একটা টিউব—দরকার হলে বোতাম টিপলেই টিউবের মধ্যে দিয়ে বাতাস এসে বেল্টকে ফাঁপিয়ে তুলবে এবং কোমর ও পেটের উপর এমন চেপে বসবে যে দেহের নীচ অংশ থেকে রক্ত আর উপরে মাথায় উঠতে পারবে না।

যন্ত্রপাতি সব ঠিক করে নিয়ে আর একজন ফ্লাইট্-সার্জেণ্ট যাত্রা করলেন। ডাইভ করবার ঠিক পূর্ব্বে বেল্টে বাতাস পুরে নিলেন। ডাইভ সুরু হ'ল। হাজার হাজার বৈমানিক নীচে দাঁড়িয়ে দেখছেন। বমার নেমে আসছে, দশহাজার, পাঁচহাজার, হাজার ফুট নেমে এল। এখনও নেমে আসছে। বৈমানিকদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আর চেয়ে দেখা যায় না—এইবার বুঝি সব শেষ হবে।

হঠাৎ প্লেনের আওয়াজ পরিবর্ত্তন হ'ল—বোঁ করে হাজার লোকের মাথার উপর দিয়ে প্লেনখানা উড়ে গেল—হাজার লোক একসঙ্গে আনন্দে চীৎকার করে উঠল। প্লেনখানা বার কতক বাম্প ক'রে মাটিতে দাঁড়াল। ককপিট্ থেকে ফ্লাইট-সার্জ্জেণ্টকে নামানো হ'ল—অক্ষত দেহ—হাত পা সর্ব্ব শরীর দারুণ উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। তিনি একবার শুধু বল্লেন—O. K.—আর কিছু তাঁকে বলতে দেওয়া হ'ল না—ডাক্তার নার্স সকলে মিলে তাঁকে নিয়ে গেল।

পরদিন সকালে হাজার পাইলট যে সমস্ত ফ্লাইট-সার্জ্জেণ্ট প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের কবরের সামনে টুপি খুলে দাঁড়াল। তাঁদের এই নির্ভীক আত্মদানের কথা স্মরণ করে প্রত্যেকের চোখই আর্দ্র হয়ে উঠলো। যুদ্ধের উত্তেজনায় প্রাণ দিতে পারে অনেকেই কিন্তু এঁদের নীরবে মৃত্যুবরণের তুলনা নাই।

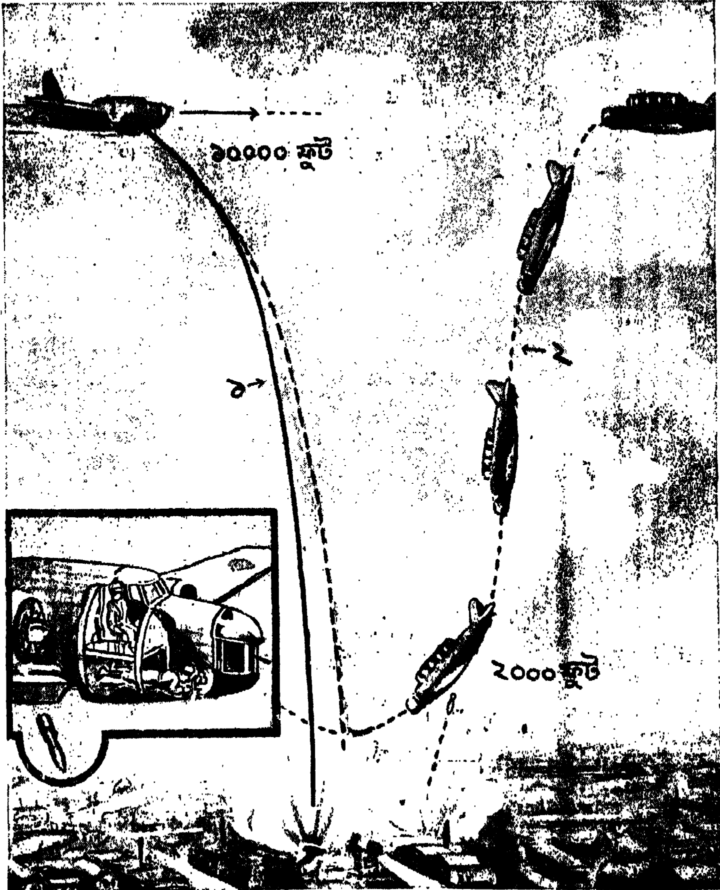
তারপর সাজ পোষাক যন্ত্রপাতি নিয়ে দলে দলে পাইলট আকাশে উঠতে লাগল। কালিফোর্ণিয়ার আকাশ জুড়ে সারা দিন ডাইভিং-এর সে কী ধূম!

বৃটিশ সমরকর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু ডাইভ-বম্বিং এর উপর তেমন আস্থাবান ছিলেন না। জাহাজ ঘায়েল করবার কাজে এদের উপযোগিতা খুব বেশী। বৃটেন এরিয়াল টরপিডো ও রকেট বোমা ডাইভ-বম্বিং এর বদলে ব্যবহার করে খুব ফল পেয়েছে।

অল্টিটিউড্ বম্বিং

বিমান থেকে কখনও একটিমাত্র বোমা ফেলা হয় না। সাধারণতঃ একই সঙ্গে ৪ বা ৫ টি করে বোমা ছাড়া হয়। হিসাব করে দেখা গিয়েছে সাধারণতঃ যদি সেকেণ্ডে ৪টি করে বোমা ফেলা হয় তবে সেগুলি প্রায় একশ গজ দূরে দূরে পড়তে থাকে। সওয়া এক সেকেণ্ডের ব্যবধানে যদি ২টি বোমা ছাড়া হয় তবে বোমা দুটি যেয়ে পড়ে হাজার ফুট দূরে। আড়াই সেকেণ্ড পর পর যে দুটো বোমা ছাড়া হবে তারা যেয়ে পড়বে পাঁচ হাজার ফুট দূরে। এটা অবশ্য নির্ভর করে বিমানের গতিপথ ও গতিবেগ, বাতাসের গতিবেগ, বোমার ওজন ইত্যাদির উপর। সমস্ত হিসাব করে নেভিগেটর বলে দেন কি ভাবে বোমা ফেলতে হবে—

তাঁর নির্দ্দেশ মত বোমা-নিক্ষেপক ইলেকট্রিক রিওষ্ট্যাকটাকে ঠিক করে নিয়ে প্রথম বোমাটি কল টিপে ছেড়ে দেন, তার পরের বোমাগুলি ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আপনা থেকেই পড়তে থাকে।



দু'রকম বোমা ফেলা : (১) অল্টিটিউড বম্বিং (২) ডাইভ্ বম্বিং

এয়ারোপ্লেন খুব উপরে উঠলে পাইলট সহজে নিশ্বাস নিতে পারে না-

অক্সিজেনের অভাবে তার নিশ্বাস আটকে যায়। সেইজন্য অক্সিজেন এ্যাপারেটাস না নিয়ে কেউ বিমানে ওঠে না। একবারে একটা ভারি মজা হয়েছিল। এক জার্ম্মান পর্য্যবেক্ষক বিমান ফরাসী সীমান্তে দেখা গেল—ওকে তাড়িয়ে দেবার জন্য একজন ইংরাজ পাইলট বিমান নিয়ে করল তাকে ধাওয়া। জার্ম্মান পাইলট সোজা উপরে উঠে যাচ্ছে, পিছনে পিছনে আর, এ, এফ-এর ফাইটারখানাও উঠছে। দুখানা বিমান কাছাকাছি এল—একখানা আর একখানাকে প্রদক্ষিণ করল—কিন্তু কী আশ্চর্য্য! কেউ কাউকে গুলি করল না—আক্রমণের ভাবও দেখাল না। নীচ থেকে বিমানঘাঁটির কর্ম্মচারীরা তো দেখে অবাক। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল দুইজনেই রুমাল উড়িয়ে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তারপর ওরা যার যার ঘাঁটিতে ফিরে গেল। ইংরাজ পাইলটটি মাটিতে নামতেই সকলে তাকে ঘিরে ধরল—'এর অর্থ কি? শত্রুকে কায়দায় পেয়েও গুলি না করার মানে কি?' একজন পদস্থ কর্ম্মচারী নীচ থেকে আগাগোড়া সমস্তটা ব্যাপারই লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি এগিয়ে গিয়ে বিব্রত পাইলটটিকে কাছে ডেকে এনে বল্লেন—'অক্সিজেন এ্যাপারেটাস না নিয়ে আর কখনও বিমানে উঠো না।'

সঙ্গে অক্সিজেন না থাকলে উপর আকাশে হালকা বায়ুস্তরে মনে নাকি ভারি আনন্দ হয়। মারামারি কাটাকাটি করার আর মোটেই ইচ্ছা থাকে না। অবশ্য আরও উপরে উঠলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

বৈমানিকের পরীক্ষা

বিমান-বাহিনীতে যখন লোক ভর্ত্তি করা হয় তখন তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় খুবই কড়াকড়ি করা হয়। চোখের দৃষ্টিতে একটুও গোলমাল থাকলে চলে না। ওড়বার আগে একটা পরীক্ষা আছে। একখানা ঘর এমন ভাবে তৈয়ারী করা হয় যে ইচ্ছা মত সেই ঘরের বায়ুকে উপর আকাশের যে কোন স্তরের মত লঘু বা ভারি করে দেওয়া যায়। নূতন বৈমানিককে সেই ঘরের মধ্যে বসিয়ে কাচের মধ্যে দিয়ে পরীক্ষক তাকে বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন। কারও স্বাস্থ্য হয় তো

বেশ ভাল কিন্তু দশহাজার ফুট উঁচুতে যে বায়ুস্তর আছে সেই বায়ুস্তরে রীতিমত অশ্বস্তি বোধ করতে থাকে —কেউ বা বিশ হাজার ফুট উঁচুর বায়ুস্তরে অনায়াসে



বৈমানিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ; বাইরে পরীক্ষক ছিদ্রপথ দিয়ে দেখছেন

নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে। কোথায় কার কি ধরণের প্রতিক্রিয়া হয় তা পূর্ব্বেই পরীক্ষা করে জেনে নেওয়া হয়।

অল্টিটিউড্ বম্বিং কঠিন কেন

উপর থেকে বোমা ফেলার পদ্ধতিকে বলা হয় অল্টিটিউড্ বম্বিং (Altitude bombing)। এই অল্টিটিউড্ বম্বিংটা সত্য সত্যই খুব কঠিন কাজ ; কেন না বোমা ফেলা হ'লে সবক্ষেত্রে বোমা ঠিক সোজা পড়তে পারে না—বাতাসে সেটা খানিকটা সরে যাবেই। সুতরাং বোমা ফেলবার আগে বাতাসের গতিবেগ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম হিসাব না করে নিলে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত না লাগবারই সম্ভাবনা বেশী।

আগের ছবিখানা দেখলে বোঝা যাবে সোজা পড়লে বোমাটা যেখানে পড়ার কথা সেখানে না পড়ে বেশ খানিকটা সূরে যেয়ে বোমাটা লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করেছে। এই বাতাসের গতিবেগ সম্বন্ধে হিসাব করবার জন্যই বিমানে বসে থাকেন 'নেভিগেটর।'

এই ধরণের বোমা ফেলা খুবই যে কঠিন তা বলা হয়েছে। লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ যদি সফল না হয় তবে এলোপাথারী বোমা ফেলে কোন সমর-পরিষদই সন্তুষ্ট হতে পারেন না। বহুগবেষণা ও বহু অর্থ ব্যয় ক'রে আমেরিকার বিমান-বাহিনী উপর থেকে বোমা ফেলার যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে তা নিখুঁত বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। কুয়াসা বা মেঘের উপর দিয়ে চল্লিশ হাজার ফুট উপর থেকে বৃষ্টির ধারার মত বোমা ঠিক লক্ষ্যবস্তুর উপর এসে পড়তে থাকে। জার্ম্মানীতে ও জাপানে শেষের দিকে সুপারফোর্টেস্‌গুলি এই ভাবেই বোমা ফেলেছে।

বোমারু বিমানের পিছনের দিকে কামান বাগিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করে একজন গোলন্দাজ সৈন্য—তাকে বলা হয় Rear gunner. আকাশের বুকে পিছন দিক থেকে আক্রমণই মারাত্মক। আক্রমণের সময় কোন বিমান যদি পিছন থেকে এসে চড়াও করে সেই জন্য বিমানের পিছন দিকেও কামান রাখা দরকার হয়।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে বিমান আক্রমণ সফল করতে হলে বৈমানিক-দিগের পরস্পরের মধ্যে সব সময় যোগাযোগ থাকা অবশ্য দরকার। নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলার জন্য বৈমানিকেরা টেলিফোন ব্যবহার করে। কারণ উপর আকাশে বিমানের শব্দের মধ্যে মুখে কথাবার্ত্তা বললে কে কার কথা শোনে।

হঠাৎ যদি কোন বোমারু বিমান নষ্ট হয় তবে এক সঙ্গে চার জন বিশেষজ্ঞ লোক মারা পড়ে—এরা হয়তো বা এমন লোক যে এক হাজার লোকের জীবনের চেয়েও এদের জীবন বেশী মূল্যবান। সুতরাং আজকাল অনেক বোমারুতেই মাত্র তুই জন লোক নিয়ে কাজ চালাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এরা তুজনেই দরকার মত গোলন্দাজ ও পাইলটের কাজ করতে পারে। অন্যান্য সকল রকম যুদ্ধের মত

বিমান যুদ্ধেও ক্ষয় ক্ষতি আছেই—বিমান ও পাইলট এই উভয় দিক থেকেই ক্ষতি হবে। কারখানায় নূতন নূতন বিমান তৈয়ারী করে ও নূতন নূতন বৈমানিককে কাজ শিখিয়ে নিয়ে এই ক্ষতি পূরণ করার চেষ্টা হয়। ক্ষতির সম্ভাবনা যেখানে কম সেখানে যন্ত্র ও চালক উভয়কেই রক্ষা করবার চেষ্টা হয়।

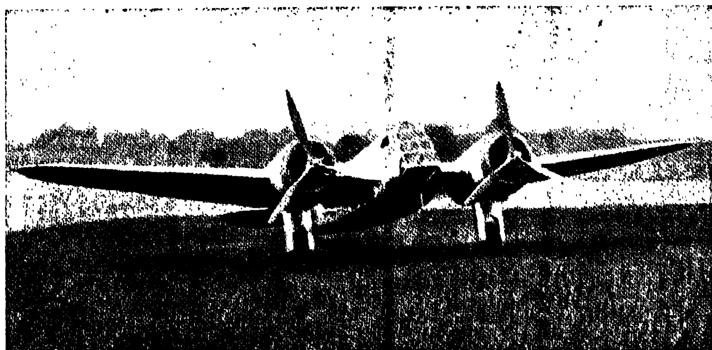
যুদ্ধের জটিলতা যতই বাড়ছে ততই দরকার হচ্ছে নানা উন্নত ধরণের বিমান। এক একটা বিশেষ অবস্থায় প্রয়োজন হয় বিশেষ ধরণের বিমানের। জার্ম্মানী যে ধরণের বিমান নিয়ে ফ্রান্সের বিমান-ঘাঁটি থেকে উড়ে ইংলণ্ডে বোমা ফেলতে আসে, ইংলণ্ড কিন্তু সে ধরণের বিমান নিয়ে জার্ম্মানীতে বোমা ফেলতে পারে না। রাত্রে এবং দিনে বোমা ফেলবার জন্য দরকার আলাদা ধরণের বিমান। এক পক্ষের প্রতিরোধ ক্ষমতা যতই বাড়ছে, অন্য পক্ষ আবার সেই আবিষ্কারের উপর টেক্কা দিয়ে শত্রুকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। কেউ চুপ করে বসে নেই, আজ যাকে মনে করা হচ্ছে সব চেয়ে ভাল, এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না, দুদিন পরে তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে পুরাণো। নূতন নূতন আবিষ্কার, নূতন নূতন পরিকল্পনা আগের গুলিকে বাতিল করে দিচ্ছে।

বিভিন্ন দেশের নানা রকম বিমানের পরিচয় দেওয়ার আগে বিমান-বাহিনীর গঠন সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা দরকার। বৃটিশের রয়াল এয়ার কোর্স (R. A. F.) ও জার্ম্মানীর লুফৎভাপে (Luftwaffe) উভয়ের গড়ন প্রায় একই রকম। বিমান-বাহিনী উভয় দেশেই একটি স্বতন্ত্র বাহিনী—স্থল বাহিনী বা নৌবাহিনীর অধীন বা অন্তর্ভুক্ত নয়। স্থল সেনা বা নৌবহরের সঙ্গে যুক্ত যে বিমানবহর থাকে তা স্থল-বাহিনী বা নৌবাহিনীরই একটি শাখা। ৩ অথবা ৫টি বিমানে হয় একটি ফ্লাইট, তিনটি ফ্লাইটে একটি স্কোয়াড্রন, কয়েকটি স্কোয়াড্রনে একটি গ্রুপ ও কয়েকটি গ্রুপে একটি কম্যাণ্ড।

বোমারু বিমানের পরিচয়

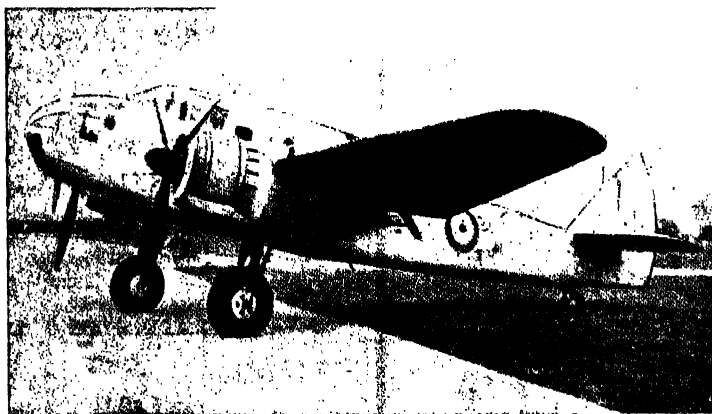
যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংরেজদের বমারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্লেনহাইম, বুফোর্ট, ওয়েলিংটন, ওয়েলেসলি ও হুইটলি জাতীয় বিমান। ব্লেনহাইমগুলির

গতিবেগ ঘণ্টায় দু'শ পচাশী মাইল ও এগুলি আকাশে থাকতে পারে একটানা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। উড়বার সময় এই বিমান এক মিনিটের মধ্যেই লম্বা উঠে যেতে পারে পনর শ চল্লিশ ফুট।

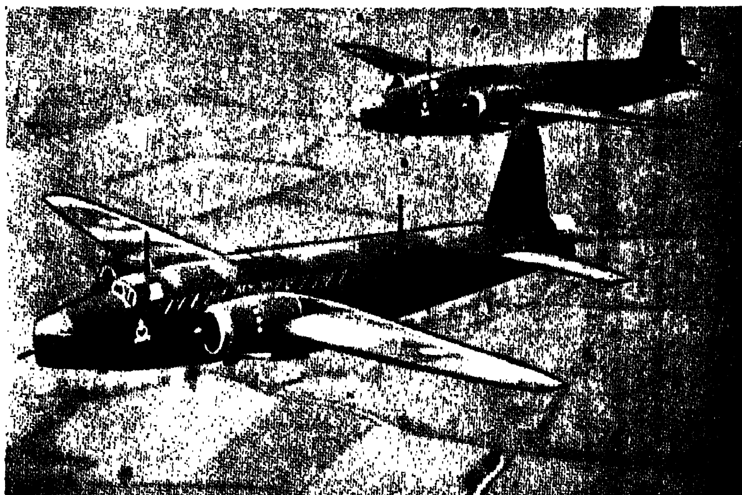


ব্লেনহাইম্

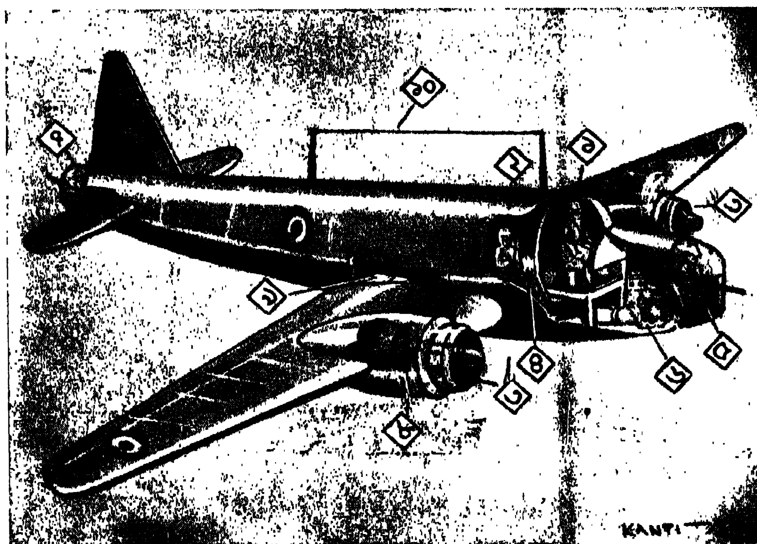
বুফোর্ট বমারগুলি হয় ব্লেনহাইমগুলির চাইতে একটু বড়। কিন্তু কার্য্যকারিতায় এইগুলি অনেক ভাল। এতে তিন জন লোক বসতে পারে। বমারের



বুফোর্ট



ওয়েলিংটন



ওয়েলিংটন (১) পাইলট (২) বেতার চালক (৩) ইঞ্জিন (৪) বেতার যন্ত্র (৫) সম্মুখের মেশিনগান (৬) বোমা নিক্ষেপক (৭) পিছনের মেশিনগান (৮) তৈলাধার (৯) বোমা ফেলার ঢাকনী (১০) বেতারের এরিয়াল

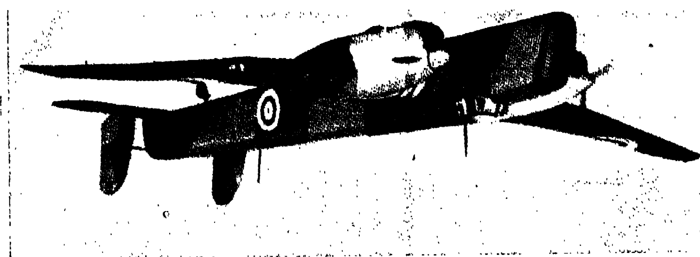
মধ্যে বুফোর্ট বলতে গেলে সব্যসাচী—ঘুরে ফিরে তদারকের কাজ করতে, দূরে শত্রুর দেশে গিয়ে বোমা ছুঁড়তে, টরপিডো ছুঁড়ে জাহাজ ঘায়েল করতে—সব কাজেই বুফোর্টগুলিকে লাগান চলে—এই হ'ল এর বিশেষ সুবিধা।

ওয়েলিংটন বমারগুলি একবার তেল ভর্ত্তি ক'রে নিলে একটানা চলতে পারে তিন হাজার মাইল, আর এতে লোক থাকে পাঁচ ছয় জন।

ওয়েলিংটন বিমানের ভিতরের বিস্তৃত ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু নমুনা পাওয়া যাবে ওপাশের ছবিখানিতে।

ওয়েলেসলি বিমানগুলিও একটানা বহুশত মাইল উড়তে পারে। ১৯৩৮ সালে এই বিমান পোতগুলি একবারও না থেমে গড়ে এক শ উনপঞ্চাশ মাইল বেগে মিশর থেকে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত সাত হাজার এক শ উনষাট মাইল ভ্রমণ করে পৃথিবীতে নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

হুইটলি বিমান ভারী বোমারু; দূর পাল্লায় উড়ে গিয়ে বোমা ছুঁড়বার জন্যই এই বিমানগুলি বিশেষ ভাবে তৈরী।



হুইটলি

বোমারু বিমান বা বমার পুতুল বা খেলনার মত কেবল কতকগুলি তৈয়ার করে গেলেই হয় না। এগুলি যুদ্ধের জিনিস ও যুদ্ধের বিশেষ বিশেষ কাজে বোমারুর ব্যবহার। বিমান যুদ্ধের কোনও বিশেষ অভিজ্ঞতা কারও ছিল না।

জার্ম্মানী যুদ্ধ বাধাবে বহু দিন থেকেই সে একথা জানত এবং বোমারু বিমানের সাহায্য নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে কি করে কোনখানকার যুদ্ধে কি ভাবে জয়লাভ করতে হবে এ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট পরিকল্পনা জার্ম্মানীর ছিল। গোয়েরিং যখন থেকে জার্ম্মানীর বিমান-বাহিনীর অধিনায়ক হলেন তখন থেকেই জার্ম্মান বিমান-বাহিনীকে দুর্দ্ধর্ষ ও অজেয় করবার তাঁর একটা সংকল্প ছিল; ভবিষ্যতের যুদ্ধে বিমানবহরকে দিয়ে কি কাজ করাতে হবে এ সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি রকমের প্ল্যান জার্ম্মানীর ছিল। ইংলণ্ডের সে রকম কোন প্ল্যান ছিল না। ইংলণ্ডের মাত্র এইটুকু জানা ছিল ভবিষ্যতের যুদ্ধে শত্রু প্রথমত ইংলণ্ডের নৌবহরের উপর বিমান আক্রমণ চালাবে ও সহরে, বন্দরে ও ডকে বিমান থেকে বোমা ফেলবে। সুতরাং ইংলণ্ডের প্ল্যান ছিল মোটামুটি প্রতিরোধমূলক। বিমান দিয়ে সে শত্রুর বিমানের আক্রমণ ঠেকাবে, তার জাহাজ রক্ষা করবে, সহর বন্দর ও কলকারখানার উপর শত্রুর বিমানকে আসতে দেবে না। ইংলণ্ড শত্রুর দেশে গিয়ে বোমা ফেলে আসবে ও আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালাবে এ পরিকল্পনা তার গোড়াতে ছিল না। সেইজন্য আগে থেকেই যে দিকে সমর নায়কেরা মন দিয়েছিলেন তা হচ্ছে আত্ম-রক্ষার দিক। জঙ্গী বিমান বা ফাইটার প্লেন ভাল করে তৈয়ারী করা, জঙ্গী বিমানের পাইলটকে ভাল করে শিক্ষা দেওয়া এইগুলির দিকেই তার লক্ষ্য ছিল বেশী। যুদ্ধ বাধবার প্রথম ক'মাসের মধ্যে জার্ম্মানীর বোমারু বিমানের অনেক কার্য্যকারিতা দেখা গিয়েছিল কিন্তু বৃটিশ বোমারু মাত্র একবার জার্ম্মানীর কিয়েল বন্দরে অভিযান ক'রে একখানা জার্ম্মান রণতরীর উপর বোমা ফেলে আসে। কয়েকখানা ওয়েলিংটন বমার নিয়ে একটি ক্ষুদ্র দল কিয়েল বন্দরে যায়—রণতরীটি জখম হয় কিন্তু নিজেদেরও ক্ষতি হয় বিস্তর। বৃটিশ বিমান প্রথম কয়েক মাস ধরে জার্ম্মানীর ভিতর উড়ে যেত আর জার্ম্মান নরনারীর উদ্দেশ্যে তাদের কাছে প্যাম্প-লেট বা প্রচার পত্র ফেলে আসত। অবশ্য ঐ বিমানের সাহায্যে জার্ম্মানীর নানা স্থানের ফোটোগ্রাফও নেওয়া হোত।

বোমারু বিমানকে দিয়ে কি কি কাজ করাতে হবে সেই অনুসারে বিভিন্ন

বোমারু তৈয়ারী করা হয় ও পাইলটকেও সেইভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। রাত্রে ও দিনে, দূরে ও নিকটে শত্রুর দেশে বোমা ফেলা, রণতরী ও বাণিজ্যতরী আক্রমণ করা, স্থলসৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে থেকে যুদ্ধ-জয়ে নিজ পক্ষকে সাহায্য করা এই সব প্ল্যান ঠিক রেখেই জার্ম্মানীর বিভিন্ন বিমান তৈরী হয়েছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে জার্ম্মান বিমান পোলাণ্ডের প্রায় সবগুলি বিমান-ঘাঁটি অধিকার করে নিয়েছিল। তিন ঘণ্টার মধ্যে পোলাণ্ডের প্রায় সবগুলি বড় বড় সহরে এক পশলা করে বোমা বৃষ্টি করা হয়ে গেল। এই সব কাজ এত নিখুঁত ভাবে কি ক'রে হল? কারণ বহু আগে থেকেই সব প্ল্যান ঠিক ছিল।

পোল্যাণ্ডের যুদ্ধ শেষ করে জার্ম্মানী ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেনমার্ক ও নরওয়ের উপর। নরওয়ে ও ডেনমার্ক জয় সুসম্পন্ন করে জার্ম্মানী আক্রমণ করল হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স। এই তিনটি দেশই অতি অল্পকালের মধ্যে জার্ম্মানীর করতল-গত হ'ল। তারপর হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের উপকূল থেকে আরম্ভ হ'ল ইংলণ্ডের উপর বিমান আক্রমণ। সেই বিমান আক্রমণে বৃটিশ জঙ্গী বিমান অদ্ভুত বীরত্ব ও নৈপুণ্য দেখিয়ে দিনের পর দিন যুদ্ধ করে চলল জার্ম্মানীর দুর্দ্ধর্ষ বিমান-বাহিনীর সঙ্গে। তখন ইংলণ্ড আত্মরক্ষায় তার বিমান বহরের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে। সেদিন হারিকেন ও স্পিট্‌ফায়ার—দুই ধরণের ফাইটার জার্ম্মান বিমানকে ঘায়েল করছে—সকলের মুখেই এক কথা—হারিকেন ও স্পিট্-ফায়ারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। যত রকমে আক্রমণ করা যায় ইংলণ্ডের উপর আক্রমণ চলল—বাড়ীঘর অনেক নষ্ট হ'ল—লোকজনও মারা পড়ল বিস্তর কিন্তু বৃটেন আত্মসমর্পণ করল না। ইংলণ্ডের উপরের আকাশে জার্ম্মান বিমান আধিপত্য লাভ করতে পারল না—গোয়েরিং নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করতে লাগলেন—জার্ম্মানীর ইউরোপ বিজয় অঙ্গহীন হয়ে রইল।

ইংলণ্ডের সেই ঘোরতর বিপদের দিনে বৃটেনের কারখানায় তৈরী হয়েছে বেশীর ভাগই ফাইটার। দলে দলে লোক টাকা তুলতে লাগল, দেশ বিদেশ থেকে সাহায্য ও উপহার এল—সকলেই ফাইটার স্কোয়াড্রনের জন্য টাকা

দিচ্ছে। তখন বোমারু বিমানের কথা চিন্তা করবার ও বোমারু বিমানের উন্নতি করবার চেষ্টা ইংলণ্ডের ছিল না।

আক্রমণের প্রথম প্রবল আঘাত সহ্য করে ইংলণ্ড যখন অপরাজেয় রইল, তখন শত্রুর দেশে যুদ্ধ চালাবার জন্য ভালো বোমারু বিমানের প্রয়োজন সে অনুভব করল। এর মধ্যে অফ্রিকায় যুদ্ধ খুব জোরালো ও ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। আমেরিকা তখন বৃটেনকে নূতন ধরণের ভাল বোমারু পাঠাতে লাগল। আমেরিকা তখনও যুদ্ধে যোগ দেয় নাই কিন্তু কানাডা গোড়া থেকেই যুদ্ধ করছিল। কানাডার বিমানক্ষেত্র থেকে দলে দলে নূতন বৈমানিকরা আমেরিকান বমারগুলি উড়িয়ে নিয়ে দলে দলে আটলান্টিক পার হয়ে ইংলণ্ডে আসতে লাগল। কানাডার শিক্ষাক্ষেত্রে হাজার হাজার যুবক শিক্ষা লাভ করছে। প্রত্যেক দিন ২৫।৩০ খানা ভারী বমার কানাডা থেকে উড়ে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপর দিয়ে আট নয় ঘণ্টার মধ্যেই ইংলণ্ডে এসে পৌছে যাচ্ছে। এই বিমানবহরকে মাঝে মাঝে জার্মান ফাইটার আক্রমণ করেছে কিন্তু সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে, ঝড় কুয়াসা উপেক্ষা করে দলে দলে আমেরিকা থেকে বোমারু বিমানের বহর এসেছে।

জঙ্গী বিমানে অদ্ভুত কৃতিত্ব অর্জ্জন করেই ইংলণ্ড মন দিল বোমারু নির্ম্মাণের দিকে। ঘণ্টায় চার শ মাইল বেগে যেতে পারে ও চল্লিশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠে বোমা ফেলতে পারে এই রকম বোমারু তার চাই। জার্ম্মানীতে গিয়ে বোমা ফেলতে হবে—হিটলার গোয়েরিংএর চোখের উপর জার্ম্মানীর শিল্পকেন্দ্রগুলি একটি একটি করে চূর্ণ করতে হবে—যুদ্ধ-জয়ের জন্য চাই দ্রুতগামী, দুর্ভেদ্য বমার। প্রয়োজনের এই তাগিদে তখন নূতন নূতন রকমারি বিমান তৈরী হতে লাগল—পুরানোগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল আফ্রিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায় ও ভারতবর্ষে। ইউরোপের যুদ্ধে ব্যবহার করা হতে লাগল নূতন নূতন মডেলের বোমারু। ইংলণ্ডে সৃষ্টি হল ষ্টারলিং, ম্যাঞ্চেষ্টার, হ্যালিফ্যাকস্, ল্যাঙ্কাষ্টার প্রভৃতি বড় বড় বোমারু, আমেরিকা থেকে এলো লিবারেটর, ম্যারিল্যাণ্ড, বোষ্টন, আর

স্পিট্‌ফায়ার ও হারিকেনের পাশে উড়তে লাগল টাইফুন, টর্ণাডো, হুইরলউইণ্ড, টোমাহক, মুস্তাঙ্, মার্টলেট, বাফেলো, ভেন্‌জেন্‌স ও হ্যাভক।

সবগুলো বিমানের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়—কেবল যাদের কথা না বল্লে নয় এই রকম কয়েকখানার সম্বন্ধে দুই এইটা কথা বলা হচ্ছে।

আধুনিক বৃটিশ বোমারুর কথা বলতে গেলে ল্যাঙ্কাষ্টার বিমানের কথাই সকলের আগে উল্লেখ করতে হয়। হুইটলি বিমানও ছিল ভারী বোমারু কিন্তু তার ইঞ্জিন ছিল মাত্র দুইটি ও এক একটি ইঞ্জিনের শক্তি ছিল আটশত হর্স পাওয়ারেরও কম। ল্যাঙ্কাষ্টারের ইঞ্জিন চারটি আর প্রত্যেকটি ইঞ্জিন প্রায় তের শ' অশ্বশক্তি-যুক্ত। ল্যাঙ্কাষ্টার হুইটলির চেয়ে আকারেও বড়। হুইটলি বিমান ৮৪ ফুট আর ল্যাঙ্কাষ্টার বিমান ১০২ ফুট, সব চেয়ে বড় কথা হুইটলি বিমানের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৯২ মাইল। ১৯২ মাইল বেগ কিছু কম নয় কিন্তু এই বেগের বিমান খাস জার্ম্মানীর ভিতরে অনেকটা প্রবেশ করে বোমা ফেলে আবার এতটা ফিরতি পথ বেশীর ভাগই নিরাপদে আসতে পারত না। ল্যাঙ্কাষ্টার বিমান চলে ঘণ্টায় ৩০০ মাইল। দু হাজার, চার হাজার, আট হাজার পাউণ্ডের বিরাট বোমা অনায়াসে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। ইংলণ্ড থেকে উঠে জার্ম্মানীর যে কোনও অঞ্চলে বিরাট ওজনের বোমা ফেলে আবার ইংলণ্ডে ফিরে আসতে পারে। মাসের পর মাস জার্ম্মানীর সমস্ত অঞ্চলেই ল্যাঙ্কাষ্টার বোমারু দিয়ে বোমা ফেলা হয়েছিল।

১৯৪৩ সালের ১৬ই মে রাত্রে এক ঝাঁক ল্যাঙ্কাষ্টার বিমান জার্ম্মানীর বিশেষ একটি টার্গেটের উপর বোমা ফেলতে যায়। টার্গেটটি হচ্ছে ইডার নদীর বাঁধ। প্রকাণ্ড বাঁধ বেঁধে বহু লক্ষ টন জল আটকে রাখা হয়েছিল। বহু কোটি টাকা ব্যয়ে কংক্রিটের এই বাঁধ তৈরী হয়েছিল ও বাঁধের এ পাশে অনেক কলকারখানা গড়ে যুদ্ধের নানারকম দ্রব্য সম্ভার প্রস্তুত হচ্ছিল। বলা বাহুল্য জার্ম্মানী এই বাঁধ রক্ষার জন্য সকল রকম আয়োজনই করেছিল। নদীর জলে সাবমেরিন ঢুকে টরপিডো ছেড়ে বাঁধের কোন ক্ষতি না করতে পারে এর জন্য বাঁধের কাছে

শক্ত লোহার জাল দিয়ে সবটা নদী ঘিরে রেখেছিল। বাঁধের উপর যাতে কোন বোমারু এসে বোমা ফেলতে না পারে সেজন্য বাঁধের উপর যতগুলি বিমান-মারা কামান বসানো যেতে পারে বসানো হয়েছিল। বাঁধের উপর আক্রমণ হতে পারে এই আশঙ্কায় নিকটেই বিমান-ঘাঁটি তৈয়ারী করে একদল জঙ্গী বিমানও সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখা হোত।

আঠার উনিশ খানা ল্যাঙ্কাষ্টার গর্জ্জন করে এসে ঐ এলাকায় উপস্থিত হল। বাঁধের উপর দিয়ে বোঁ করে প্লেন কয়েকখানা উড়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কামানের গর্জ্জনে চারিদিক কেঁপে উঠল। দেখতে দেখতে জার্ম্মানীর জঙ্গী বিমানগুলি আকাশে উঠল। এইবার ল্যাঙ্কাষ্টারের দলের স্কোয়াড্রন লীডার এক ফন্দী করলেন। চৌদ্দ পনের খানা বিমানকে একটু দূরে গা ঢাকা দিতে আদেশ দিয়ে তিনি চার পাঁচখানা বিমান নিয়ে এমনভাবে মহড়া দেখাতে লাগলেন যে মনে হল তাঁরাই বুঝি বাঁধে বোমা ফেলবেন। কয়েকবার বাঁধের উপর দিয়ে এমনভাবে উড়ে গেলেন মনে হল ঠিক কোন জায়গায় বোমা ফেলতে হবে সেই স্থানটি বুঝি ভাল করে দেখে নিচ্ছেন। ঠিক টার্গেটের উপর ছোঁ মারার মত ভাণ করে চার পাঁচখানা বিমান ছুটে আসছে, সবগুলি কামান এই কয়খানাকে লক্ষ্য করেই প্রাণপণে গোলা ছুঁড়তে লাগল। এরা যেন বোমা ফেলতে পারছে না এই রকমটা দেখিয়ে একটু দূরে গেলে জার্ম্মান ফাইটারগুলি পিছনে তাড়া করে গেল, তখন তারাও বিমানের মুখ ঘুরিয়ে রীতিমত আকাশযুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। এই অবসরে সেই আগের গা-ঢাকা দেওয়া চৌদ্দ পনের খানা ল্যাঙ্কাষ্টার একটির পর একটি বাঁধের উপর নেমে আসতে লাগলো ও বাঁধ ও জালের মধ্যে যে জল ছিল সেখানে মাইন ফেলতে লাগল। দুই চারিটা মাইন লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল কিন্তু দুই একটা ঠিক স্থানে পড়ল। জলে ভেসে এসে মাইন বাঁধের গোড়ায় এসে লাগল, ভীষণ শব্দ করে বাঁধ ভেঙ্গে গেল—হু হু করে জল গ্রাম নগর ভাসিয়ে ফেলল; রেল লাইন ভেঙ্গে চুরে দিয়ে কলকারখানা নষ্ট করে বহু সাজসরঞ্জাম একেবারে বরবাদ করে দিয়ে

গেল। সমস্তটা বিপদের ঝুঁকি নিজের মাথায় টেনে এনে স্কোয়াড্রন লীডার যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তার জন্য তাঁকে ভিক্টোরিয়া ক্রশ দেওয়া হয়েছিল। এই আক্রমণে জার্ম্মানীর যে ক্ষতি হয়েছিল বিমান আক্রমণের ইতিহাসে একটি আক্রমণে এত বড় ক্ষতি আর কোথাও হতে দেখা যায় নি এক পার্ল হারবার ছাড়া।



বাঁধের উপর ল্যাঙ্কাষ্টার দলের আক্রমণ

আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের পর্ব্ব শেষ করে যখন বৃটেনের রণনীতি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল তখন অনেক রকমের বিমানের ব্যবহার রণক্ষেত্রে দেখা গেল। টাইফুন বিমান এই আক্রমণের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত করা হয়েছিল। শত্রু প্রকাণ্ড যান্ত্রিক বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে বা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছে—উভয় ক্ষেত্রেই

টাইফুন থেকে রকেট বোমা ছাড়া হয়েছিল। এই বিমান থেকে একসঙ্গে দুটি বা চারটি করে রকেট বোমা ছুটে যায়—দেখলে মনে হয় শত্রুকে যেন তেড়ে আসে। টাইফুন বিমান ইউরোপের যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

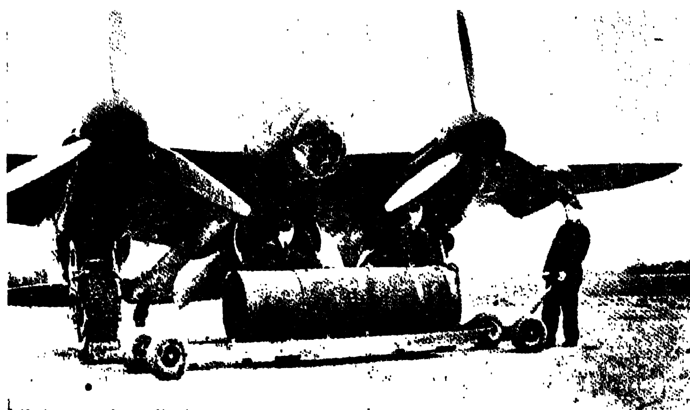


টাইফুন



যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর যান্ত্রিক বাহিনীর উপর টাইফুন বিমান থেকে রকেট বোমা ফেলা হচ্ছে

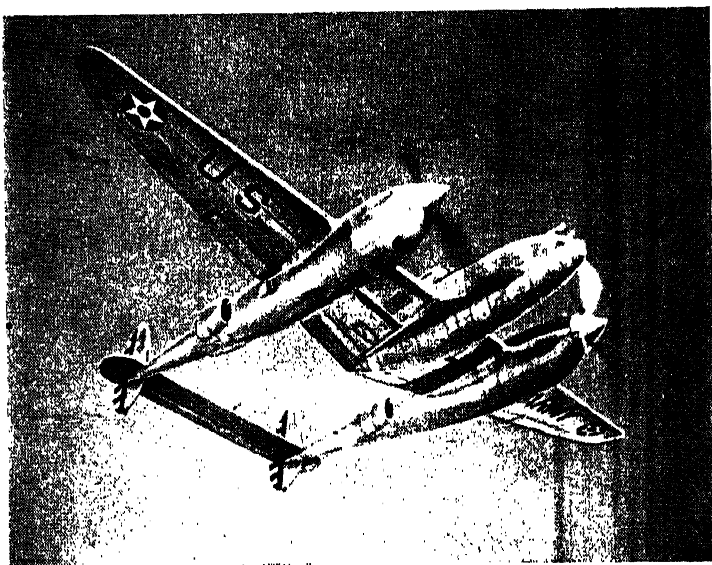
বাস্তবের অভিজ্ঞতায় বোঝা গেল যে জঙ্গী বিমানের যে গতিবেগ, হালকা গড়ন, তাড়াতাড়ি যে কোন দিকে গতি পরিবর্ত্তনের যে ক্ষমতা—এইগুলি যদি বোমারুর থাকে তবে খুবই কার্য্যকরী হয়। বোমারুকে একটু হালকা করে তার গতিবেগ বাড়িয়ে দেওয়া বা জঙ্গী বিমানকে একটু ভারী করে তাকে দিয়ে বোমা ফেলা—জঙ্গী ও বোমারু এই দুইটি জিনিসের সমন্বয় করে এক নূতন ধরণের বিমান তৈরী হ'ল—তাদের বলা হয় 'ফাইটার-বমার।' এই ধরণের বিমানই এখন সব দেশেই খুব চলতি। এই ধরণের বৃটিশ বিমান—'মস্‌কুইটো।' এই বিমানের বাইরের দিকটা খুব হালকা কাঠের তৈরী— অসম্ভব দ্রুত চলতে পারে। আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয় কাজেই এর কার্য্যকারিতা যথেষ্ট। এত উপর দিয়ে এরা যায় যে চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, শব্দও শুনতে পাওয়া যায় না।



মস্‌কুইটো বিমানে অতিকায় বোমা উঠছে

'গণতন্ত্রের অস্ত্রশালা' আমেরিকাও রণবিমান তৈরী করতে কিছু পিছিয়ে নেই। যুদ্ধরত সমস্ত জাতির মধ্যে এ বিষয়ে আমেরিকার প্রাধান্যই সুস্পষ্ট। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার আগে থেকেই বৃটেনের জন্য আমেরিকা নানা ধরণের বিমান তৈরী করে-ছিল। আমেরিকার 'উড়ন্ত টরপিডো' (Flying Torpedo) দেখতে ছোটখাট

ছিমছাম হলেও কাজে পৃথিবীর সব চাইতে শক্তিশালী মাঝারি ধরণের বোমারু। এরা চলে ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে। এতে ইঞ্জিন থাকে দুইটি আর মেশিনগান থাকে অনেকগুলি।

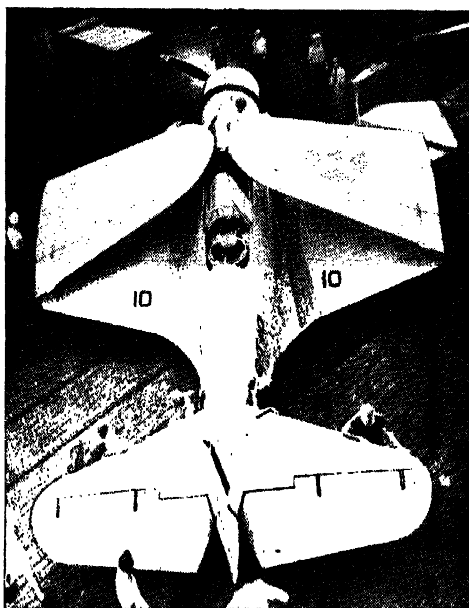


উড়ন্ত টরপিডো

এই ধরণেরই মাঝারি বোমারু বিমান বি-২৫ দিয়ে ১৯৪২ সালেই আমেরিকা টোকিওতে বোমা ফেলে এসেছিল। বি-২৫ বোমারুগুলি একটানা যেতে পারে এক হাজার মাইল আর এর গতিবেগ হয় ঘণ্টায় ২৭৫ মাইল। এতে লোক থাকে সাত জন, তার মধ্যে বোমা নিক্ষেপক বসে একেবারে সম্মুখে বিমানখানির নাকের ডগায়। আমেরিকার বিমানবাহী জাহাজ হর্ণেট জাপান থেকে ৮০০ মাইল দূরে নঙ্গর ক'রে, একদল বি-২৫ বোমারু বিমান একই সঙ্গে টোকিও, ওসাকা, ইয়োকোহামা প্রভৃতি স্থানে বোমা ফেলে হাজির হয় গিয়ে চীনের একটা বিমান ঘাঁটিতে। বি-২৫ বোমারুর চেহারা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর লেজের দিকটায়।

ছবিতে দেখা যাবে এর লেজের ডানাটা কেমন দুভাগে ভাগ করা। বি-২৬ প্রায় একই রকম—ইহার নাম মরোডার (Marauder)।

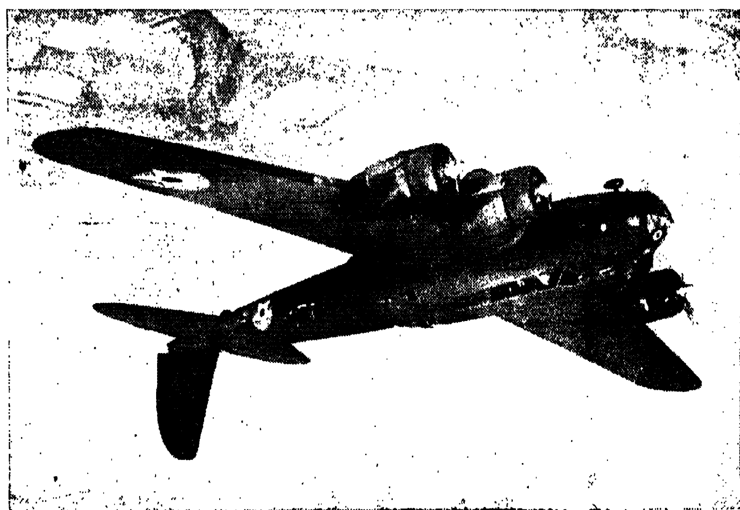
বি-১৭ বা উড়ন্ত কেল্লা (Flying Fortress) আমেরিকার ভারী বোমারু। এগুলি সত্যি সত্যিই কেল্লা বিশেষ। এদের এক একটার ওজন হয় ৬০০ মণ আর এতে লোক থাকে ৯ জন। বোমারু হিসেবে এদের মূল্য বেড়েছে এই জন্য যে



বি—২৫

এগুলি আকাশে উঠতে পারে সাত মাইল উঁচুতে। অত উঁচুতে যখন কোন বোমারু চলে তখন নীচে থেকে তাদের দেখা তো যায়ই নাই, কোন শব্দও সাধারণ শব্দগ্রাহী যন্ত্রে ধরা যায় না। এগুলিতে ইঞ্জিন থাকে চারটি, এদের গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৩৫ মাইল আর একটানা চলতে পারে তিন হাজার দুই শ মাইল। উড়ন্ত কেল্লার বোমা বর্ষণের পদ্ধতি অতি সাংঘাতিক। অত্যন্ত উপর দিয়ে একসঙ্গে ৫০

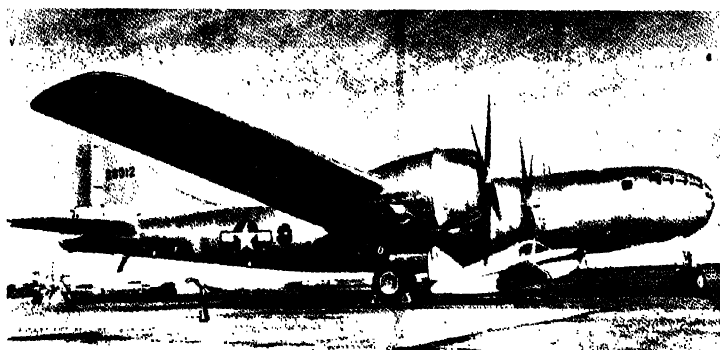
থেকে ৫০০ পর্য্যন্ত সহর বা বন্দরের উপর formation নিয়ে উড়তে থাকে আর বোমা ফেলতে থাকে। বোমা ফেলতে ফেলতে যখন নীচের সমস্তটা স্থান ধোঁয়ায় ভরে যায় তখন ক্ষান্ত হয়। বিস্তৃত স্থানে খুব বেশী করে বোমা ফেলা যখন প্রয়োজন হয় তখন এদের ডাক পড়ে। উপরে যখন এগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে তখন কোন ফাইটারের সাধ্যও হয় না যে নিকটে গিয়ে এদের আক্রমণ করে। কোন একখানা বিমান হঠাৎ কোনও করণে যদি যূথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে তখনই জঙ্গী



ফ্লাইং ফোর্টস্—উড়ন্ত কেল্লা

বিমান কাছে ঘেঁষতে সাহস পায়। এই উড়ন্ত কেল্লার জ্বালায় অস্থির হয়ে জার্ম্মান ফাইটারগুলি পরে পাশ থেকে রকেট বোমা ছেড়ে formation ভাঙ্গবার চেষ্টা করেছিল এবং প্রথম প্রথম খানিকটা কৃতকার্য্যও হয়েছিল। প্রথম দিন জার্ম্মান ফাইটারগুলির এই নূতন ধরণের আক্রমণে ৬০ খানা উড়ন্ত কেল্লা ঘায়েল হয় কিন্তু তারপর থেকে বড় আক্রমণ চালাবার সময় 'মুষ্টাঙ্' নামে নূতন ধরণের জঙ্গী বিমানের পাহারায় বোমারুগুলি জার্ম্মানীতে যায়।

বোমারু বিমানের দিক দিয়ে এই যুদ্ধে স্থপার-ফোর্টেস্ বোধহয় আমেরিকার সর্ব্বশেষ আবিষ্কার। বিজ্ঞানের জগতে কোন কিছুকেই চরম বলে স্বীকার করা যেতে পারে না, কিন্তু এই অতিকায়, অতি দ্রুতগামী, অতি ভয়ঙ্কর বোমারু ব্যবহার করার পর আমেরিকাকে আর কোন বিমান আবিষ্কার ও প্রয়োগ করতে হয়নি। এর ডানার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ১৪২ ফুট; লম্বা প্রায় ১০০ ফুট এবং চাকার উপর ভর করে মাটিতে যখন থাকে তখন উঁচু দেখা যায় তেতলা বাড়ীর মত। এরা এত উঁচু দিয়ে উড়ে যায় যে সেখানে না পৌঁছায় কামানের গোলা, না যেতে পারে জঙ্গী বিমান। ২২০০ অশ্ব-শক্তির ৪টি ইঞ্জিনের



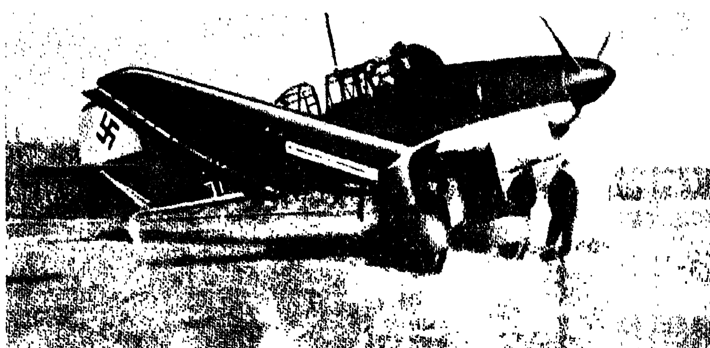
স্থপার ফোর্টেস্

জোরে এরা চলে। এঁদের গতিবেগ কত, কত বোমা এরা নিতে পারে—এই সব খবর অবশ্য জানবার কোনও উপায় নাই।

এবার কয়েকখানা জার্ম্মান বোমারুর কথাও আলোচনা করা যাক। যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্ম্মানীর বোমারুগুলি ছিল বলতে গেলে অপরাজেয় আর ইংরেজ ও ফরাসীর আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও ছিল অনেকটা বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো। স্থতরাং সাধারণ ভাবে জার্ম্মান বোমারুগুলি খুব ভয়ের কারণ হয়েই দাঁড়িয়েছিল। পরে ইংরেজদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এবং জঙ্গী বিমানগুলির বিস্ময়কর উন্নতির ফলে

জার্ম্মান বোমারুগুলির কার্য্যকারিতা অনেক কমে যায়। তারপরে আমেরিকার বিমান বল যখন জার্ম্মানীর প্রতিকূলে এল এবং আমেরিকার কারখানাগুলি হাজার হাজার হরেক রকমের বিমান দিয়ে ইউরোপের আকাশ ছেয়ে ফেলল তখন জার্ম্মানীর আকাশের আধিপত্য নষ্ট হল এবং এই আধিপত্য নষ্ট হওয়াই জার্ম্মানীর সামরিক পরাজয়ের প্রধান কারণ।

জার্ম্মান বোমারুগুলির মধ্যে প্রথম নাম করা যেতে পারে জাঙ্কারগুলির। জাঙ্কার কথাটা সংক্ষেপে বলা হয় জা (Ju)। পোল্যাণ্ডের যুদ্ধে জার্ম্মানী ব্যবহার করেছিল "Ju 78" জাতের বোমারু। এ গুলোতে থাকে এক একখানা দশ পাউণ্ড



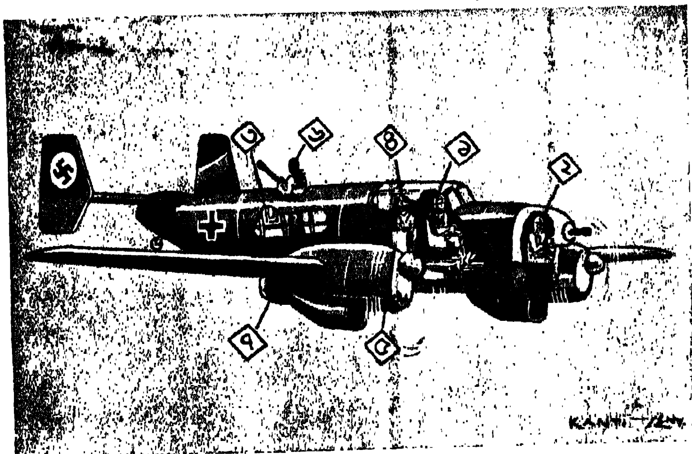
জাঙ্কার—৮৭

ওজনের পাঁচটি করে বোমা এবং ডানার দুই দিকে সাজান থাকে মেশিনগানের শ্রেণী। যেখানে বোমা ফেলবার কথা সেখানে বোমা ফেলে মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ে নীচের লোককে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে এরা খুব মজবুত।

জার্ম্মানীর আর একটি বোমারু 'Ju 86'। এতে লোক থাকে চার জন। এগুলি অতিকায় ও দূরগামী।

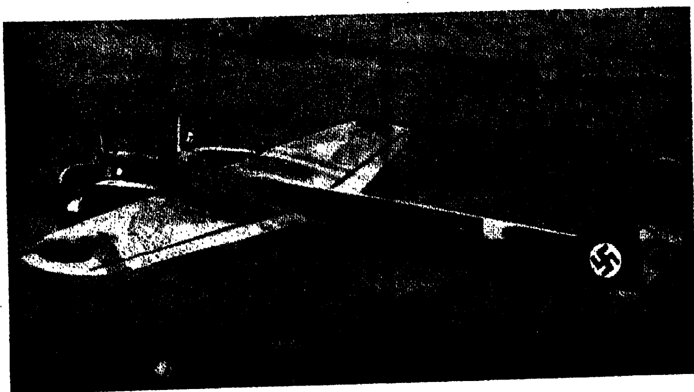
জাঙ্কার জাতীয় আরও অনেক বোমারু বিমান জার্ম্মানী তৈরী করেছিল। তার

মধ্যে 'Ju 89' একদিকে বোমারু আর অন্যদিকে সৈন্যবাহী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।



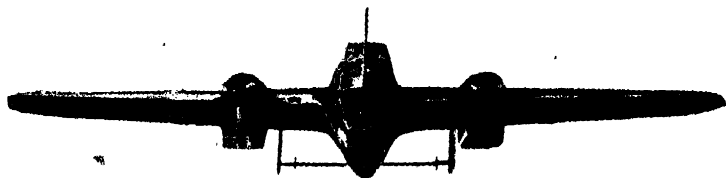
জাঙ্কার—৮৬

(১) পাইলট (২) বোমা নিক্ষেপক গোলন্দাজ (৩) বোমা (৪) বেতার চালক গোলন্দাজ (৫) বেতার যন্ত্র (৬) গোলন্দাজ (৭) বোমা ফেলার ঢাকনী



ডোরনিয়ার—১৭

'ডোরনিয়ার'—ডো-১৭ (Do 17) জাতের জার্ম্মান বোমারুগুলিকে চলতি ভাষায় বলা হয় 'ফ্লাইং পেনসিল' (Flying Pencil)। ইংরেজদের জঙ্গী বিমানের বিরুদ্ধে এইগুলি বিশেষ কার্য্যকরী না হওয়ায় 'ডো-২১৫' নামে ঐ জাতেরই আর এক শ্রেণীর বোমারু জার্ম্মানী তৈরী করেছিল। ঐগুলির তৈলাধার ছিল দুর্ভেদ্য।

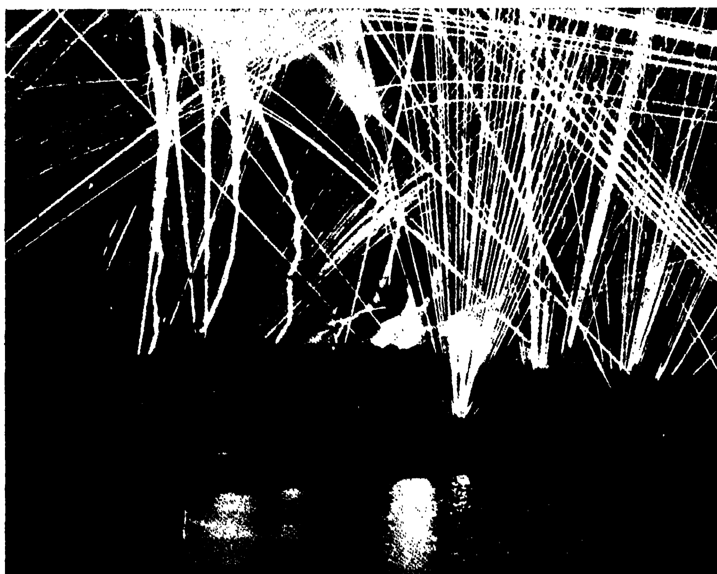


ডোরনিয়ার—২১৫

একদল বোমারু যখন শত্রুর দেশে বোমা ফেলতে যায় তখন তাদের নানারকম বাধা ও বিপদের সামনে পড়তে হয়। একটি বিমানে বিভিন্ন কাজের জন্য যে কয়েকজন লোক থাকে তাদের মধ্যে এতখানি ভালবাসা ও ভাব জন্মে যে দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। বিমানের পিছনের দিকটাতে হয়তো আগুন ধরে গেছে আর রিয়ার গানার সেই আগুনের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে, আর একজন তাকে সেই আগুনের মুখ থেকে উদ্ধার করে আনল। পাইলট হয়তো গুলির ঘায়ে অজ্ঞান হয়ে গেল, পিছনের লোক তাকে টেনে তুলে তাকে নিয়েই প্যারাস্যুট ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক একটি দলের কয়েকখানি বিমানের মধ্যেও এমনি ভালবাসা জন্মায়; সব কয়জন যেন একটা পরিবারের লোক—একটা flying family.

রাত্রিতে বোমা ফেলে আসার চলন এই যুদ্ধে খুব বেশী হয়েছে। সেইজন্য অন্ধকারে আত্মরক্ষার জন্য আক্রান্ত দেশ ব্যবহার করে অতি তীব্র আলো যাকে বলা হয় সার্চ লাইট (search light)। সার্চ লাইটের আলো নীচ থেকে বোমারু খানাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পাইলটের কাজ হল চেষ্টা করা নীচের আলো বিমানখানাকে যেন ধরে ফেলতে না পারে। সার্চ লাইটের তীব্র আলোর পাশ দিয়েই হয়তো শোঁ ক'রে সে বেরিয়ে গেল। নীচে থাকে Sound Detector বিমানের শব্দ ধরবার যন্ত্র। নীচ থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে উপরে বিমান এসেছে কিন্তু

আলো ফেলে বের করতে পারা যাচ্ছে না। এতে শত্রু একেবারে ক্ষেপে উঠে ও সারা আকাশ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। আলোর ভিতর একবার পড়ে গেলে নীচের লোক আলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিমানখানাকে দৃষ্টির সামনেই রাখতে চেষ্টা করে কিন্তু পাইলট তখন নানারকম কৌশল করে, কখনও হঠাৎ উপরে উঠে, কখনও নীচে নেমে আলোর বাইরে চলে যাবার চেষ্টা করে। এত ছুটাছুটি করে অনেক



সার্চ লাইট—মোটা বাঁকা রেখাগুলি আক্রমণকারী বিমান থেকে ফেলে দেওয়া আলোক বোমার আলো

সময় কিন্তু পাইলট লক্ষ্যবস্তু হারিয়ে ফেলে। অথচ লক্ষ্য ঠিক ঠিক বুঝতে না পারলে বোমা ফেলার হুকুম নাই। যেখানে সেখানে বোমা ফেললে অকাজ হয় বটে কিন্তু কাজ হয় না। অনেক সময় লক্ষ্য বুঝতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত বোমা নিয়েই বোমারু ফিরে আসে। বোমা ফেলা হয়ই না। ভাগ্যক্রমে ঠিক লক্ষ্যবস্তু বুঝতে পারলে তবেই বোমা ফেলা হয়।

আক্রমণের পূর্ব্বে অনেক উপর থেকে সাধারণতঃ পর্য্যবেক্ষক বিমান যার উপর আক্রমণ করা হবে সেটাকে খুব ভাল করে দেখে নেয়। পিছনে আক্রমণ করবে বমার, বোমা ফেলে ফেলে তারা সৈন্যদলের মধ্যে ভয়, চাঞ্চল্য ও বিশৃঙ্খলা এনে দেবে। ফাইটারগুলি বমারের কাছাকাছি থেকে দেখবে যে শত্রুপক্ষের কোন বিমান যেন আক্রমণের সুযোগ না পায়। যুদ্ধ আরম্ভ হলেই একটা পর্য্যবেক্ষক বিমান থেকে রেডিও যোগে বমার ও ফাইটারগুলির কাছে ঘন ঘন খবর আসতে থাকে—কখন কি করতে হবে। "বাঁদিক থেকে শত্রুর এক ঝাঁক বিমান ছুটে আসছে, খবরদার, তাড়াতাড়ি পজিসান নিয়ে ফেল, ডান দিকে এগার মাইল দূরে সৈন্যদল আক্রমণের জন্য জড় হচ্ছে যেখানে বোমা ফেল, নীচু হয়ে মেশিনগান চালাও ; আক্রমণে চমৎকার কাজ হচ্ছে—বিমানমারা কামানগুলো প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, আর ভয় নাই, এখন আরও নীচে নেমে এস এবং ঘুরে ঘুরে ভাল করে দেখে দেখে নিশ্চিন্তে বোমা ফেলে যাও ; উত্তর দিকে ফাইটারের একটা প্রকাণ্ড দল আসছে, আর নয় এইবার পালাও" এইভাবে সমস্ত খবর অনবরত দেওয়া হচ্ছে। কাছাকাছি যদি ভারী কামান থাকে তবে সেখানেও খবর দেওয়া হবে—"আঠার মাইল দূরে দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে কামান দাগতে থাক—" কামান দাগা সুরু হল। গোলা পড়ল এক মাইল দূরে। আবার খবর গেল—"লক্ষ্যস্থির হয়নি এক মাইল উত্তরে পড়েছে।" এই রকম করে দেখে দেখে কামানের গোলার লক্ষ্যও এরাই শুধরে দিল। আসলে বিমান আক্রমণে এই সব পর্য্যবেক্ষণের বিমানগুলিই হয় বোমারু বিমানগুলির চোখ ও মাথা।

এইবার একটা সত্যিকারের বিমান আক্রমণ বর্ণনা করছি। চোখের পলকে কি করে সমস্ত দেখে, ভেবে, মাথা ঠিক রেখে পাইলটদের কাজ করতে হয়—প্রাণ হাতে করে কি রকম নির্ভীকভাবে এরা দিনের পর দিন কাজ করে চলে—কিছু কিছু এতে বুঝতে পারা যাবে।

একটি বিমান-ঘাঁটির অপারেশন রুম। বেলা প্রায় দুপুর। আজ বিমান-বাহিনী কোথায় বোমা ফেলতে যাবে তার হুকুম এখনও আসে নি। আজ যদি

অভিযান করা হয় তবে আজকের দলে কারা কারা যাবে তা অবশ্য আগেই ঠিক হয়ে রয়েছে। যারা যাবে তারা এতক্ষণ খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে, জিরিয়ে প্রস্তুত হয়েই আছে। অনেকগুলি বমার ও ফাইটারও তৈরী হয়েই আছে। এয়ারোপ্লেনের ইঞ্জিনগুলি চালিয়ে দিয়ে বিমান ঘাঁটির গ্রাউণ্ড ষ্টাফ অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন কোনরকম অস্বাভাবিক শব্দ যেমন খট্ খট্, ঘাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ এই সব শোনা যায় কি না। এদের কান এতটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে সামান্য একটু ত্রুটি থাকলেই সেটা শব্দ থেকে ধরা প'ড়ে যায়। যদি কোনখান থেকে একটু অন্য রকম শব্দ শোনা গেল—অমনি পরীক্ষা আরম্ভ হল—দেখা গেল কোনখানে একটা স্ক্রু হয়তো একটু ঢিলে হয়ে আছে। সর্ব্বনাশ! সময় মত ধরা না পড়লে আড়াই লক্ষ টাকা দামের বমার, ত্বলক্ষ টাকার বোমা আর টাকায় কেনা যায় না এই রকম চারজন মানুষ মারা যেত।

প্রত্যেকখানি বিমান পরীক্ষা করে ইঞ্জিনিয়ার সার্টিফিকেট দিলেন—আজ উড়তে পারে। বিমানের একটি গোটা স্কোয়াড্রন ঠিক হয়ে রইল।

অপারেশন রুম নিস্তব্ধ। "এখনও কোন খবর নাই কেন? তবে কি আজ কোন আক্রমণ চলবে না?" কিন্তু কর্ম্মচারীরা সকলেই নিজের নিজের আসনে বসে আছেন। হঠাৎ খবর এল—রাত্রে আক্রমণ করতে হবে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘুমন্ত ঘর যেন জেগে উঠল।

"সাজ সাজ—তৈরী হও।" চৌদ্দখানা বোমারু যাবে। প্রতিখানাতেই বিস্ফোরক বোমা ও আগুনে বোমা সমান সমান নিতে হবে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ খাতাপত্র নিয়ে অঙ্ক কষতে লাগলেন। বিমান-ঘাঁটির কর্ম্মচারী এরপর কি হুকুম আসে তারজন্য টেলিফোনের সামনে বসে রইলেন।

আবার খবর এল—আজকের লক্ষ্য, অমুক দেশের অমুক সহরের অমুক তেলের গুদাম ও কারখানা। সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন কর্ম্মচারী প্রকাণ্ড এক ফাইল টেনে বার করলেন। ফাইলে বের হল অসংখ্য কাগজপত্র ও তার সঙ্গে রকমারি ম্যাপ—নক্সা আর ফোটোগ্রাফ—গুদামের কোন অংশে বোমা ফেলতে

পারলে ক্ষতি সব চেয়ে বেশী হবে সেইখানে নক্সায় দাগ দেওয়া। কাগজ ঘেঁটে আরও জানা গেল—গুদামে বেলুন ব্যারেজ নাই তবে বিমান মারা কামানের দল আছে দুটি।

যেতে হবে রাত্রে। "কোন পথে যাওয়া যাবে? অন্ধকারের মধ্যে কি করে গুদাম বের করা যাবে?"

নক্সা দেখতে দেখতে কর্ম্মচারীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্কোয়াড্রন লীডারের কাছে ম্যাপখানা মেলে ধরে তিনি বললেন—"এই দেখ নদীটা এইখানটাতে পূব দিকে বেঁকেছে—এই বাঁকের মুখে একটা জঙ্গল, রাত্রে অন্ধকারে এই জঙ্গলটা দশহাজার ফুট উপর থেকে দেখায় ঠিক যেন একটা কুকুরের মুখের মত। এরই আড়ালে কারখানা ও গুদাম। নদীর রেখা ধরে যেতে হবে, সামনে বাঁক দেখলেই আর চিন্তা নাই, নীচেই লক্ষ্য।"

এই কারখানা শত্রুর দেশের সব চেয়ে বড় কারখানা এবং এখানে কাজ চলছে রাতদিন!

আবার হুকুম এল—সমর বিভাগ আশা করেন গুদাম ও পাওয়ার হাউসের উপর বোমা ফেলা হবে। রাত ঠিক আটটায় যাত্রা করতে হবে।

অপারেশন রুম আবার নিস্তব্ধ। স্কোয়াড্রন লীডার এখন অন্য আর এক ঘরে। সামনে টাঙ্গানো রয়েছে মস্ত একটা ম্যাপ। সমস্ত পাইলটদের তিনি পথ ঘাট, বিপদের কথা বুঝিয়ে বলছেন। টার্গেটটার উপরেই শত্রুর রক্ষাব্যবস্থা জোরালো নয় বটে কিন্তু টার্গেটটা ঠিক শিল্পঅঞ্চলের মধ্যখানে। সুতরাং আশ পাশ থেকে যেতে আসতে দুইবারই বিমান-মারা কামানের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হতে হবে।

পাইলটরা সন্ধ্যা হতে না হতেই খেয়ে দেয়ে পোষাক এঁটে বিশ্রাম করতে লাগল। বিমানে বোমা তোলা হল। যন্ত্রপাতি আবার আর একবার করে দেখে নেওয়া হল। ইঞ্জিনগুলি ইতিমধ্যেই গরম করে রাখা হয়েছে।

৭টা ৫৫ মিনিট।

অপারেশন রুমে উপর থেকে খবর এল—"সব প্রস্তুত ?"

উত্তর হল—"প্রস্তুত"।

বোঁ করে এক এক খানা বিমান বেরিয়ে যেতে লাগল—চৌদ্দ খানাই আকাশে উড়ল। ভাগ্যে কার কি আছে কে জানে!

সব চুপচাপ।

রাত ২টার সময় আবার অপারেশন রুম নানারকম লোকে ভরে গেল। ডাক্তার, নার্স, ওষুধ, ফ্লাস্ক ভর্ত্তি গরম চা—সামনে টেবিলে বসে একজন কর্ম্মচারী।

২টা ১০ মিনিটের সময় একজন পাইলট ফিরে এল।

"খবর ভাল ?"

"মোটামুটি মন্দ নয়"।

"লক্ষ্য বুঝতে পেরেছিলে ?"

"পারবো না কেন ?"

"কখন গেলে ?"

"১০টা ৩৪"।

"কটা বোমা ফেলেছ, একটা না দুটো ?"

"একটা।"

"কি দেখলে ?"

"নীল আলো।"

"সাবাস! সাবাস্!" কর্ম্মচারী উঠে দাঁড়ালেন।

তারপর একজন দুইজন করে পাইলট ফিরতে লাগল। কর্ম্মচারী প্রশ্ন করেই চলেছেন। সকলেই উত্তর দিচ্ছে। তিনি প্রত্যেকের কথাই লিখে যাচ্ছেন। একজন বলল—ত্রিশ মাইল দূর থেকেও গুদামের আগুন দেখা গিয়েছিল। তখন রাত ১টা। পাইলটরা বিদায় নিল। চারজন ফিরল না। দুখানা বোমারুর কোন খোঁজ হল না।

পাইলটরা খেতে বসল—চা, রুটি, মাখন, ডিম। বাকী রাতটুকু জেগে কর্ম্মচারী রিপোর্ট তৈরী করলেন। আটপৃষ্ঠার মস্ত রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন সমর দপ্তরে। পরদিন কিন্তু খবরের কাগজে বের হল এ সম্বন্ধে মাত্র একটি লাইন—"আমাদের বোমারু বিমান অমুক খানের তেলগুদামে বোমা ফেলে এসেছে।"

বোমা

বিমান যত বড়ই হোক, বিমানের এমন ক্ষমতা নাই যে নিজেই শত্রু ধ্বংস করে বা অনিষ্ট করে। বিমান বহন করে আনে বোমা আর এই বোমাই আরম্ভ করে ধ্বংসের কাজ—একসঙ্গে বিপুল নরমেধ যজ্ঞ ও অভিনব লঙ্কাকাণ্ড।

বোমার মধ্যে থাকে বিস্ফোরক আর এই বিস্ফোরকই বোমার ইস্পাতের খোলটিকে দেয় ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে—তখন ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ভীষণ চাপের গ্যাস আর ইস্পাতের টুকরোগুলি চারদিকে ছুটতে থাকে রাইফেলের গুলির মত বেগে। একটা মাঝারি ধরণের বোমা ফাটলে তার পঞ্চাশ গজের মধ্যে প্রতি বর্গ ইঞ্চি জায়গার উপর চাপ পড়ে তিন হাজার মণ। বলা বাহুল্য বায়ুর এই প্রচণ্ড চাপ ঘর-বাড়ী দালান-কোঠা সহ্য করতে পারে না এবং বোমার ঘা না খেলেও এইজন্যই ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ হয়ে যায়। এই ভাঙ্গা ইস্পাতের টুকরোগুলোকে বলে স্প্লিন্টার (Splinter); এর আঘাতেই লোকজন মারা যায় বেশী।

বোমার মধ্যে যে বিস্ফোরক থাকে তা হঠাৎ ঘা খেয়ে জ্বলে উঠবে এবং জ্বলে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ধীরে ধীরে যদি পুড়তে আরম্ভ করে ও অনেকক্ষণ ধরে পোড়ে তবে বোমার খোলটা ফাটবে না।

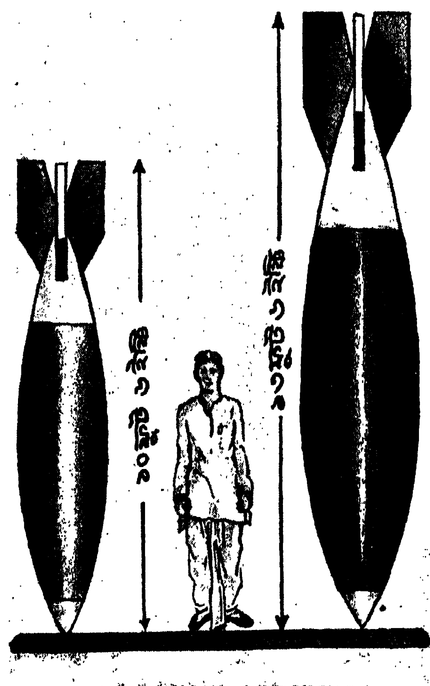
বোমা সাধারণতঃ দুরকম হয়—আগুনে বোমা আর বিস্ফোরক বোমা। এ দুরকম বোমাই সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া আরও এক রকম বোমা বিমান থেকে ফেলা হয়—সেগুলোকে বলে আলোক বোমা বা তারা বোমা। সহর নিষ্প্রদীপ করে যখন সব অন্ধকার করে দেওয়া হয় তখন শত্রু বিমান লক্ষ্যবস্তু



বোমার বিস্ফোরণ

খুঁজে বের করবার জন্য এক রকম বোমা ফেলে দেয় সেগুলো ফেটে পড়ে আগুনের ফুলকি কেটে এবং এই আলোর ফুলকিতে বৈমানিক স্পষ্ট দেখতে পায় লক্ষ্যবস্তু কোথায়।

বিস্ফোরক বোমাই হচ্ছে সব চেয়ে মারাত্মক—৫০০ পাউণ্ড থেকে ৮০০০ পাউণ্ডের পর্য্যন্ত বিস্ফোরক বোমার ব্যবহার হয়। সাধারণ ঘরবাড়ী বা জাহাজের



৫০০ পাউণ্ড ও ১০০০ পাউণ্ড বোমার আকার

উপর ৫০০ পাউণ্ডের বোমা ফেললেই যথেষ্ট কিন্তু কারখানা ডক্, পুরু কংক্রীট বা লোহার ছাদ এগুলি ভাঙতে আরও বেশী ওজনের বোমার দরকার। সুতরাং ১০০০, ২০০০ বা ৪০০০ পাউণ্ডের বোমা এ সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। বড়

ব্যাটলসিপ, পুরু লোহার ছাদওয়ালা বাড়ী—এ সব ধ্বংস করবার জন্য বিশেষ ধরণের বোমার দরকার হয়। এ সব বোমা আঘাত লাগবার সঙ্গেই ফাটবে না—বোমার সূক্ষ্ম অগ্রভাগটা বোমার ভারে ছাদের বা জাহাজের পাটাতনটা ফুটো করে না ফেটে ভিতরে ঢুকে যাবে এবং সেখানে ফেটে চূড়ান্ত অনিষ্ট করবে। সহজ বুদ্ধিতেই একথাটা বোঝা যায় একটা বোমা যদি পাঁচতলা বাড়ীর ছাদে প'ড়ে ফেটে যায় তবে বাড়ীর যে অনিষ্ট হবে তার চেয়ে বোমাটা যদি ওপরের ছাদ ফুটো করে, চারতলা ও তেতলার মেঝের মধ্যে দিয়ে নেমে দোতলার মেঝেতে এসে ফেটে

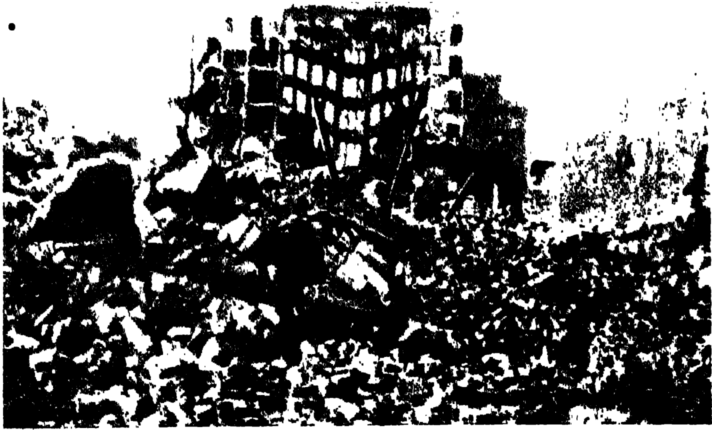


অতিকায় বোমা—Block Burster

যায় তবে অনেক বেশী অনিষ্ট হবে—অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বাড়ীখানার কোন তলাই রক্ষা পাবে না। বড় বড় রেল ষ্টেশন, অস্ত্রাগার প্রভৃতি ভাঙ্‌বার জন্য বৃটেন ও আমেরিকা ১২০০০ পাউণ্ডের অতিকায় বোমা তৈরী করেছিল—এগুলোর নাম 'Block Burster' সুপার ফোর্টেস ও ল্যাঙ্কাষ্টার বিমানে করে এইগুলি ছাড়া হয়েছে জার্ম্মানীর স্থানে স্থানে।

টাইম্‌-বম বা ডিলেড্‌-এ্যাক্‌শন্‌-বম (অর্থাৎ যা দেরী করে ফাটে) বলে আরও

একটি বিশেষ ধরণের বোমা আছে যেগুলি আসলে ঘুমন্ত বোমা—কখন ফাটবে তা নির্ভর করে এর নির্ম্মাণ কৌশলের মধ্যে। হয়তো এ বোমাটি ঘরের মেঝেতে পড়ে রইল চুপচাপ—নির্দ্দিষ্ট সময় পরে হঠাৎ সশব্দে ফেটে এ জানিয়ে দিল যে এ ছিল, এবং মারাত্মক ভাবেই ছিল। লণ্ডনের উপর বিমান আক্রমণে জার্ম্মানী এই ধরণের অনেক বোমা ব্যবহার করেছে। বিমান আক্রমণের সঙ্কেত



বিস্ফোরক বোমার ধ্বংসলীলা

পেয়ে নগরবাসী গেল নিরাপদ আশ্রয়ে—শত্রু এসে তার ঘরের দরজায় ফেলে গেল মারাত্মক বোমা—'অল্ ক্লিয়ার' হয়ে গেলে গৃহস্থ ফিরে এল বাড়ীতে—সেদিনকার মত বিপদ কেটে গেছে মনে করে সকলেই আশ্বস্ত বোধ করছে এমন সময় বোমা গেল ফেটে আর সবই হল ধ্বংস। সহরের কোন জায়গায় যদি 'টাইম-বম' পাওয়া যায় বা যে সব বোমা পড়েও ফাটল না এই রকম বোমা যদি

দেখতে পাওয়া যায় তবে ওগুলোকে সহরের বাইরে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া হয়। এই কাজ করবে কারা? জ্যান্ত বোমা নিয়ে যাদের কাজ করতে হয় তারা যে কোন সময়ে মরতে পারে। এই ধরণের কাজ করবার জন্য প্রত্যেক দেশেই Suicide squad বা 'আত্মঘাতী দল' থাকে।

২৳পাউণ্ড—আড়াই পাউণ্ড ওজনের আর এক ধরণের ছোট বোমা আছে সেগুলিকে বলা হয় আগুনে বোমা। খানিকটা বিস্ফোরক এর মধ্যেও থাকে এবং বোমা ফাটলে বেশ অনেকক্ষণ ধরে ভিতরের chemical গুলি জ্বলতে থাকে। জার্ম্মানী যে আগুনে বোমা ব্যবহার করেছিল তার তাপে লোহা বা ঘরের মেঝে পর্য্যন্ত গ'লে যায়। জল ঢেলে ওগুলোকে নেভানো যেত না—কাছে যাবার কোন উপায় ছিল না—ভিজে কম্বলে সবটা দেহ মুড়ে বালির বস্তা ছুঁড়ে চাপা দিয়ে ঐ ধরণের বোমাগুলিকে আয়ত্তে আনা হোত।

জার্ম্মানীর তেল বোমা আর জাপানীর মোম বোমার মূল উদ্দেশ্য আগুন নেভাতে না দেওয়া, অন্ততঃ পক্ষে নিভিয়ে ফেলার চেষ্টাতে যতদূর সম্ভব বাধা দেওয়া। বোমা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই যদি আগুনে বোমা নিবিয়ে ফেলা যায় তবে এই ধরণের বোমা কোন অনিষ্ট করতে পারে না। কিন্তু তেল বোমা ও মোম বোমা এভাবে তৈরী করা হয়েছে যে এদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন, কারণ এতে জল পড়লে আগুন যায় আরও ছড়িয়ে। তেল বোমার খোলটা হয় লোহার—খোলটার ওজন প্রায় দেড় মণ এবং ওর মধ্যে বিস্ফোরক থাকে প্রায় ঐ ওজনেরই। এই বিস্ফোরক তৈরী হয় পেট্রল আর এক ধরণের তেল দিয়ে আর তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় খানিকটা কয়লার গুঁড়ো—ম্যাগনেসিয়ামের গুঁড়ো—কাঠের গুঁড়ো আর খানিকটা টি, এন্, টি। পড়বামাত্র এই বোমা যায় ফেটে এবং বিস্ফোরকটা ছড়িয়ে পড়ে প্রায় তিন শ' বর্গ গজ জুড়ে। যদি কোন বোমা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই না ফাটে তবে সেটা সাধারণ শক্ত মাটিতে প্রায়ই ৮ থেকে ১০ ফুট পর্য্যন্ত ডেবে যায় দেখা গিয়েছে।

জাপানীরা ঠিক এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তেলের বদলে মোমের ব্যবহার

উদ্ভাবন করেছে। এই নূতন ধরণের বোমা সম্বন্ধে অবশ্য বিশেষ খবর কিছু জানা যায় নাই। তবে এর ওজনও দেড় মণের মতই এবং বোমার মধ্যে ছোট একটা চোঙ্গের ভিতর থাকে দাহ্য পদার্থ এবং বাইরে থাকে মোম। বিস্ফোরণের ফলে গলান মোম চারদিকে ছিটকে পড়ে আর তা পুড়তে থাকে। যত জল এর উপর পড়বে, জ্বলন্ত মোম ততই চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং অগ্নিকাণ্ড ক্রমেই বিস্তার লাভ করবে। বলা বাহুল্য এ ধরণের জাপানী বোমা কাঠের ঘরবাড়ীর অনেক অনিষ্ট করতে পারে কিন্তু পাকা দালান কোঠার উপর এর প্রভাব তেমন কার্য্যকরী নয়।

জাপানীদের আর এক মারাত্মক ধরণের আগুনে বোমা হচ্ছে ফস্‌ফরাস্ বোমা। এই জাতীর বোমার মধ্যে থাকে ফস্‌ফরাসে ভিজানো কতকগুলি টিলের মত জিনিস। এগুলি সাধারণতঃ রবারের ইঞ্চিখানেক চওড়া ও তার চেয়ে একটু লম্বা টুকরা। বোমাগুলি তিন ফুট লম্বা আর খোলটা হালকা লোহার পাতের। পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বোমাটি যায় ফেটে আর রবারের টুকরোগুলি যায় চারদিকে ছড়িয়ে প্রায় ৫০ গজ দূর পর্য্যন্ত। রবার জ্বলতে থাকে এবং যে কোনও অন্য জিনিসের সংস্পর্শে এলেই সে সবগুলিতেও যায় আগুন ধরে।

এ আগুন অবশ্য জল ঢেলে নিবিয়ে ফেলা যায় কিন্তু উপর থেকে জল শুকিয়ে গেলেই আবার জ্বলতে আরম্ভ করে। আগুনের সাথে সাথে রবার পোড়া বিশ্রী গন্ধ ও ভারী ধোঁয়ায় সমস্তটা জায়গা ভরে যায়। চিম্‌টে বা সাঁড়াশী দিয়ে এই টুকরাগুলিকে ধরে বালতীতে করে ডাষ্টবিনে ফেলে দিলেই এদের সদগতি করা হয়।

কিন্তু আগুন জ্বলে বলেই যে বোমা মারাত্মক তা নয়, আগুনে বোমায় আগুন তো জ্বলবেই কিন্তু সব রকম আগুনে বোমার মধ্যে ফস্‌ফরাস্ বোমা সব চেয়ে কদর্য্য। একটু অসাবধান হওয়ার ফলে যদি এই বোমার টুকরো গায়ে লাগে তবে এক কদর্য্য ঘায়ের সৃষ্টি হয় এবং এই ফস্‌ফরাসের বিষক্রিয়া মারাত্মক হয়ে শরীরে ফুটে উঠে।

জঙ্গী বিমান বা ফাইটার

তৃতীয় শ্রেণীর বিমানের নাম জঙ্গী বিমান বা ফাইটার (Fighter)। সন্ধানী বিমান ও বোমারু বিমান সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর দেওয়া হ'ল। এইবার আর এক ধরণের বিমানের কথা বলবার সময় এসেছে।

এগুলির কাজ হ'ল বিপক্ষের যে কোন বিমানই আসুক না কেন উপরে উঠে যুদ্ধ ক'রে তাদের ঘায়েল করা আর স্বপক্ষের বিমানগুলির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ফিরে তাদের শত্রু বিমানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। এই দুটো কাজ ক'রতে হ'লে এদের হ'তে হবে দুর্ভেদ্য আর অত্যন্ত দ্রুতগামী। শত্রুপক্ষের বোমারুর চেয়ে এদের গতিবেগ যতটা বেশী হবে—শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে ততই হবে এদের সুবিধা। একটি গুলি যেখানে হোক লাগলেই যদি ফাইটারখানা ভেঙ্গে চৌচির হ'য়ে যায় বা টুকরা টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে কাজ হয় না। সুযোগ পেলেই বিপক্ষ বিমান এদের খাতির করবে না। ফাইটারকে যেমন শক্ত হ'তে হবে তেমনি হালকা হ'তে হবে, আর হালকা না হ'লে এরা ক্ষিপ্রগতি হ'তে পারবে না। এত কথা চিন্তা করতে হয় বলেই অনেক ভেবে চিন্তে নানা দিক থেকে তবে ফাইটার তৈরী করতে হয়। আজকাল যে সব ফাইটার তৈরী হচ্ছে তাদের এমন ভাবে কঠিন ধাতু দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয় যে ফাইটার এক দিকে হয় হালকা—অথচ খুব দুর্ভেদ্য। এই ফাইটার গুলি ছোটে কমপক্ষে তিন-শ থেকে চার-শ মাইল বেগে এবং একটানা ছুটতে পারে বারশ থেকে আঠার-শ মাইল।

প্রত্যেকটি ফাইটারে অনেকগুলি ক'রে মেশিনগান সাজান থাকে। সাধারণত মেশিনগানগুলি থাকে বিমানের দুই পাশে ডানার উপর আর পাইলটের হাতের কাছে থাকে একটি বোতাম। এই বোতামটা টিপে দিলেই মেশিনগান থেকে বেরিয়ে আসে গুলির ঝাঁক। এই মেশিনগানের সংখ্যা হয় ছয় থেকে আটটা পর্য্যন্ত এবং এগুলি এমনভাবে সাজানো থাকে যে ইচ্ছামত সেগুলিকে

ঘোরান ফিরান চলে। এগুলো কোন দিক দিয়েই যাতে ভারী না হয় সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়।

মেশিনগানের এই সব হালকা গুলি দিয়ে দুর্ভেদ্য বড় বড় বোমারু ও ফাইটারকে ঘায়েল করা সব সময় সম্ভব হয় না। এই জন্যই আজকাল ফাইটারের আকার একটু বড় ক'রে—তাতে মেশিনগান ও কামান দুই-ই রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জঙ্গী বিমানগুলির মধ্যে ইংরেজদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য প্রথম গ্ল্যাডিয়েটর তারপর হারিকেন, স্পিট্‌ফায়ার ও ডিফায়াণ্ট। জার্ম্মানীর 'হাইঙ্কেল ১১২,' 'মেসারমিট ১০৯' ও 'মেসারমিট ১১০' যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছে। আমেরিকার প্রথম আমলের 'কার্টিস্ পারস্যুট প্লেন' 'ল্যান্সার' 'লাইটনিং' ও পরবর্ত্তী আমলের 'মুস্তাঙ', 'কিটি হক' প্রভৃতিতে জঙ্গী বিমানের অসামান্য উন্নতি দেখা গিয়েছে।

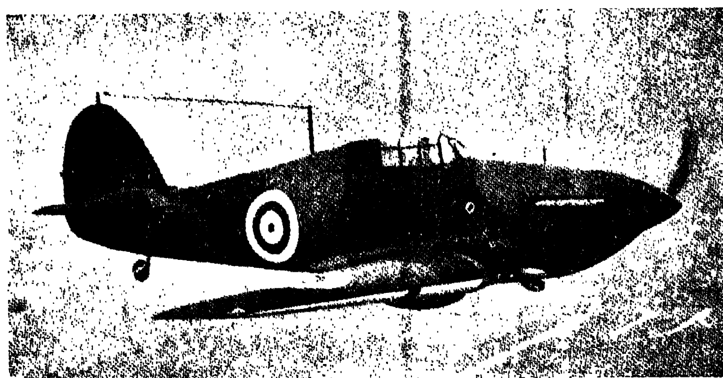
'গ্ল্যাডিয়েটর' ইংরেজদের সব চেয়ে পুরানো জঙ্গী বিমান—গত যুদ্ধের বিমান আক্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে তৈরী হয়েছিল।

প্রথম দিকে নরওয়েতে যখন জার্ম্মান সৈন্য অবতরণ করছিল ও জার্ম্মান বিমানগুলি নরওয়েতে যখন হানা দিচ্ছিল তখন একদল গ্ল্যাডিয়েটর পাঠান হয় বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। আঠারখানি গ্ল্যাডিয়েটর জমানো বরফের একটা হ্রদের উপর নেমে সেইখান থেকে জার্ম্মান বোমারুগুলিকে আক্রমণ ক'রছিল। সারাদিন যুদ্ধ করবার পর গ্ল্যাডিয়েটরগুলি প্রায় সবই নষ্ট হ'য়ে গেল—কিন্তু শত্রুর বোমারু বিমানবহরের একটা বড় অংশ এদের হাতে মারা পড়লো।

জার্ম্মান বোমারুর কার্য্যকলাপ দেখে ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য তৈরী হ'ল প্রথমে 'হকার হারিকেন।' ছোট ছিমছাম প্লেন, লোক থাকে একজন, এর গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৩৫ মাইল আর এতে থাকে দুই পাশে চারটি করে আটটি মেশিনগান।

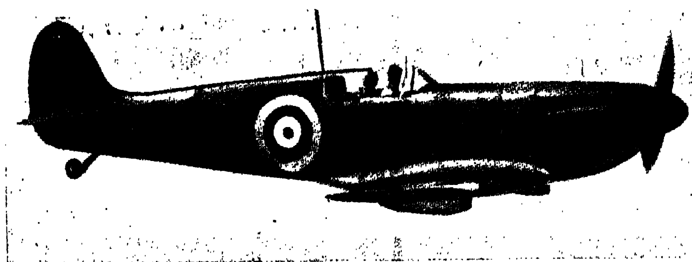
স্পিট্‌ফায়ার ইংজেদের অদ্ভুতকর্ম্মা ফাইটার। এদের গতি প্রায় ৪০০

মাইল—ডাইভ করবার সময় ৫০০ মাইল পর্য্যন্ত গতি হয়। স্পিট্‌ফায়ারেও লোক থাকে একজন আর মেশিনগান থাকে আটটি। স্পিট্‌ফায়ার ব্যবহারের সব চেয়ে সুবিধা এই যে এগুলি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই খাড়া এগার হাজার ফুট

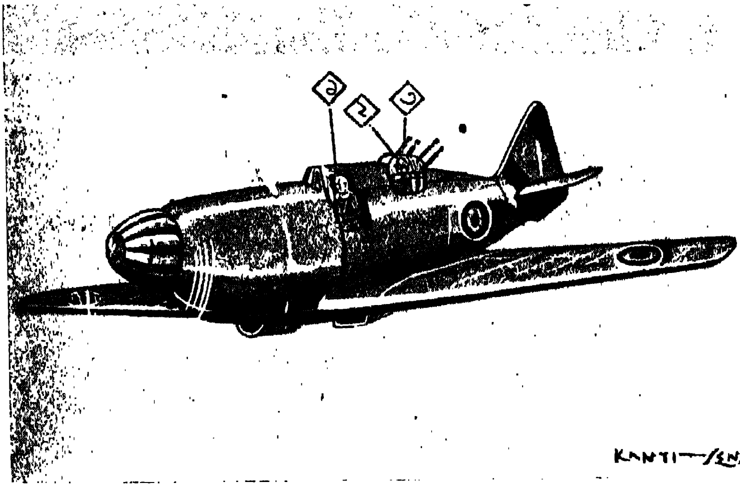


হারিকেন

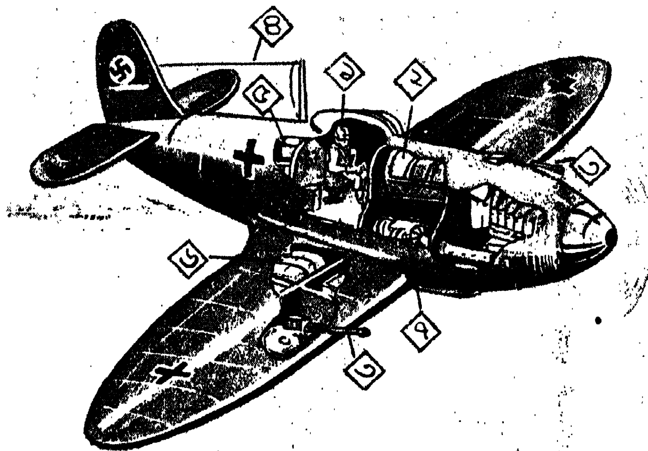
উঁচুতে উঠে যেতে পারে। এগুলি খুব বেশীক্ষণ আকাশে থাকতে পারে না। জার্মান বোমারু যখন ইংলণ্ডে বোমা ফেলতে আসে তখন ইংলণ্ডের আকাশে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে এরা অদ্বিতীয়। কিন্তু আক্রমণকারী বিমানের সঙ্গে এদের



স্পিট্‌ফায়ার



ডিফায়াণ্ট—(১) পাইলট (২) গোলন্দাজ (৩) মেশিনগান



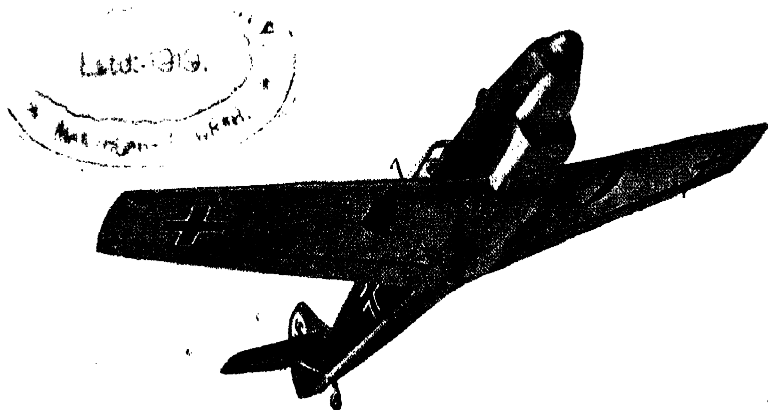
হাইঙ্কেল—(১) পাইলট (২) তৈলাধার (৩) কামান (৪) বেতারের এরিয়াল (৫) বেতার যন্ত্র (৬) বোমা (৭) মেশিনগান

দূরপাল্লায় পাঠান চলে না। এদের একটানা ৫০০ মাইলের বেশী উড়বার ক্ষমতা নেই।

এই ক্ষমতা আছে 'ডিফায়াণ্ট' জাতীয় বিমানগুলির। ডিফায়াণ্ট হচ্ছে এক ডানাওয়ালা দুর্ভেদ্য প্লেন এবং এতে থাকে দুপাশে দু'টি করে চারটি মেশিনগান। ডিফায়াণ্টে কিন্তু লোক থাকে দুজন, একজন বিমানখানাকে চালায় আর একজন করে যুদ্ধ।

জার্মানীর হাইঙ্কেল—১১২ তে লোক থাকে একজন, মেশিনগান থাকে দুটি আর হালকা কামান থাকে দুটি। কামানের গুলির সুবিধা হচ্ছে যে মেশিনগানের গুলির চেয়ে দূরের পাল্লায় কামানের গুলি যেতে পারে। এ সব নিয়েও এ ছোটে নেহাৎ কম নয়—ঘণ্টায় তিনশ দশ মাইল।

মেসারমিট ১০৯ ছোটে ঘণ্টায় তিনশ চুয়ান্ন মাইল। দেখতে একটা ইটের মত বলে চলতি ভাষায় একে বলা হয় 'উড়ন্ত ইট' (Flying Brick)।



'উড়ন্ত ইট'—মেসারমিট—১০৯

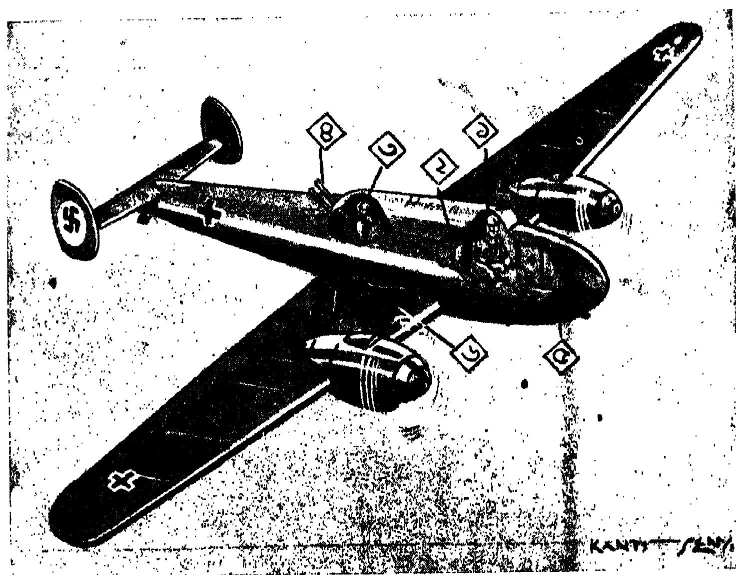
এরই একটা উন্নততর সংস্করণ 'Me 100 R' ঘণ্টায় চারশ সত্তর মাইল বেগে যেতে পারে। এতেও থাকে দুটি মেশিনগান এবং দুটি কামান। এই কামান থেকে গুলি ছোঁড়া যায় প্রতি মিনিটে পাঁচটি।

স্পিট্‌ফায়ার, হারিকেনের মত এরাও ছিল জার্ম্মানীর ছোট পাল্লার জঙ্গী বিমান। ইংরেজদের ডিফায়াণ্টের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য জার্ম্মানী যে ME 100



মেসারামিট—১১০

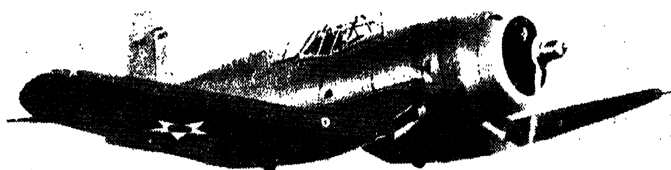
নামে জঙ্গী বিমান তৈরী করেছিল তাতে তেল রাখবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। ঘণ্টায় একশ ষাট মাইল বেগে সতেরশ মাইল চলতে অর্থাৎ দশ ঘণ্টার উপর



মেসারমিট—১১০ (১) পাইলট (২) বেতার যন্ত্র (৩) বেতার চালক গোলন্দাজ (৪) জোড়া মেশিনগান (৫) জোড়া কামান (৬) তৈলাধার

আকাশে ভেসে থাকতে হ'লে এর দরকার হয় চারশ গ্যালন তেল এবং এই তেল রাখা হয় বিমানের ডানার ভিতর। তেল রাখবার এই ব্যবস্থা কেবল নূতন নয়, অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্যও বটে। তেলের ট্যাঙ্কগুলো সম্পূর্ণভাবে দুর্ভেদ্য—তেল চুইয়ে পড়বে না, আগুনে পুড়বে না, গুলিতে ভাঙ্গবে না। খুব জোরে ছুটলে এই জঙ্গী বিমানখানি এক ঘণ্টায় যেতে পারে কম পক্ষে তিনশ পঁয়ষটি মাইল।

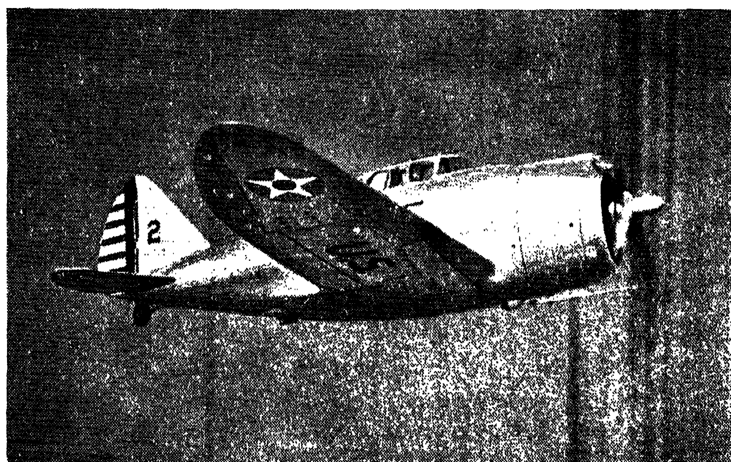
আমেরিকার জঙ্গী বিমানগুলির মধ্যে ল্যান্সার বা পি-৪৩, লাইটনিং বা পি-৩৮, ওয়াইল্ড ক্যাট, কোরসেয়ার জাতীয় বিমানগুলি সত্যি সত্যিই উল্লেখযোগ্য।



ল্যান্সার

ল্যান্সার জাতীয় জঙ্গী বিমানগুলির সুবিধা এই যে এগুলি উঁচুতে ওঠে প্রায় সাত মাইল। বিমানযুদ্ধে যে বিমান যত উঁচুতে থাকবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার সুবিধা তার থাকবে তত বেশী। এইজন্যই জঙ্গী বিমান হিসাবে ল্যান্সার বোধ হয় সব চাইতে বেশী কার্য্যকরী হ'য়েছে। ল্যান্সারের গতিবেগ হয় ঘণ্টায় সাড়ে তিনশ মাইলেরও বেশী।

লাইটনিং জাতের জঙ্গী বিমানগুলিকেই বলা হয় পি-৩৮। প্রথম মিনিটে এগুলি সোজা উপরে ওঠে পুরো এক মাইল। এদের গতিবেগ হয় ঘণ্টায় ৪০০ মাইল। এতে যত কামান আর বন্দুক থাকে কোনও জঙ্গী বিমানে তা থাকে না। কামান বন্দুক সবই থাকে একেবারে সম্মুখের দিকে, ডানার ভিতরে নয়। এক ডানার প্রান্ত থেকে আর এক ডানার প্রান্ত পর্য্যন্ত দূরত্ব হয় ৫২ ফুট।

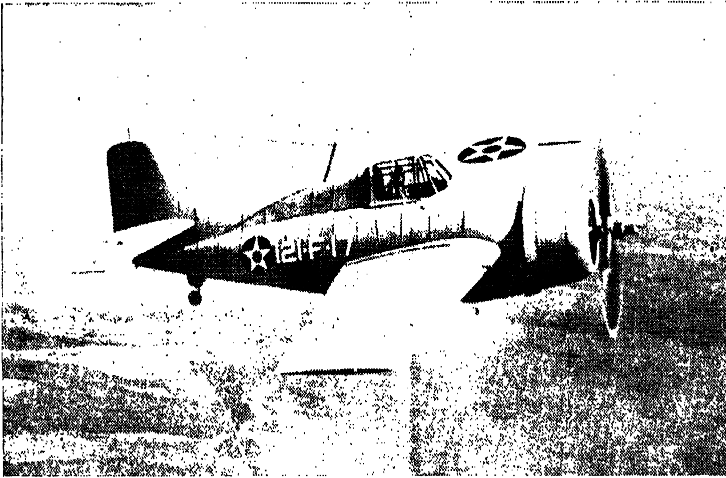


পি—৩৮

আমেরিকার বোমারু যখন কোন স্থানে বোমা ফেলতে যায় 'ওয়াইল্ড ক্যাট' জাতীয় জঙ্গী বিমানের পাহারায়ই বোমারুগুলি সাধারণতঃ এগিয়ে যায়। এক কথায় ব'লতে গেলে ব'লতে হয় আত্মরক্ষার চেয়ে আক্রমণমূলক কাজ করাই হচ্ছে এ ধরণের বিমানের বৈশিষ্ট্য। এর ডানার নীচে চারটি ক'রে মেশিনগান আর অনেকগুলি ক'রে হাত বোমা জাতীয় ছোট ছোট বোমা থাকে। এগুলি এক ইঞ্জিনের হালকা বিমান, গতিবেগ এর ঘণ্টায় ৩৫০ মাইল আর একটানা চলতে পারে ১১০০ মাইল।

বিমানবাহী জাহাজ থেকে যে সব বোমারু বিমান শত্রুর দেশে হানা দিতে

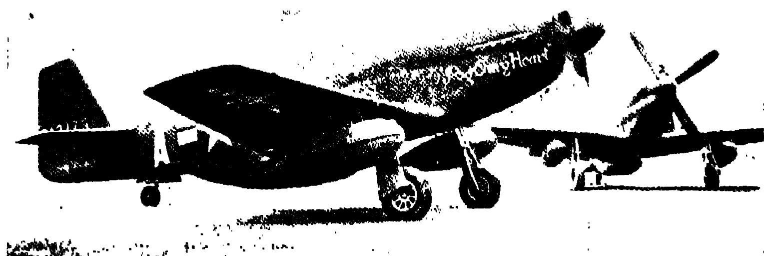
যায় তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই কোরসেয়ার জাতীয় জঙ্গী বিমানের সৃষ্টি। এগুলি লম্বায় হয় মাত্র ৩০ ফুট আর ডানার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত এরা চওড়া হয় মাত্র ৪০ ফুট। এগুলি অন্যান্য জঙ্গী বিমানের চেয়ে ক্ষিপ্রগতি এবং যেতেও পারে অনেক দূর।



কোরসেয়ার

এগুলি ছাড়া জার্ম্মানী, আমেরিকা ও বৃটেন আরও অনেক নূতন নূতন ধরণের বিমান তৈরী করেছে ও পুরানো মডেলগুলির এক আধটু পরিবর্ত্তন করে যুদ্ধের বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহার করেছে। সেই সব বিমান ঘণ্টায় কত মাইল যায়, একটানা কতটা উড়তে পারে, আত্মরক্ষা ও আক্রমণের কি কি নূতন ব্যবস্থা এতে করা হয়েছে সে সব সংবাদ যাতে বাইরে প্রকাশ না পায় তার জন্য প্রত্যেক দেশের কর্ত্তৃপক্ষই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। শান্তির সময়ই কোন দেশের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ নিজের দেশের বলাবল সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করতে চান না—যুদ্ধের সময় তো কথাই নাই!

মুস্তাঙ্ আমেরিকার নূতন জঙ্গী বিমান। এরা চলতে পারে একটানা অনেক দূর—এক ইঞ্জিনের ফাইটারের মধ্যে এরাই সব চেয়ে দূর পাল্লায় যায়—এদের পাইলট একজন—আর ডানার নীচে পেট্রল ট্যাঙ্ক থাকে। জার্ম্মানীর একেবারে কেন্দ্রস্থানে বোমা ফেলবার জন্য যে সমস্ত বোমারু যায় তাদের জার্ম্মান ফাইটার গুলি (নূতন মডেলের মেসারমিট) রকেট ছেড়ে আক্রমণ করে। এর পর থেকে আমেরিকা ও বৃটেনের বমারগুলি মুস্তাঙের পাহারায় চলতে থাকে। পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উঁচুতেও এগুলি ঘণ্টায় চারশ মাইল বেগে চলতে পারে এবং এই জন্যই মেসারমিটের আক্রমণ শক্তিকে এরা পঙ্গু করে দিয়েছিল। এর আর



মুস্তাঙ্

এক চমৎকারিতা হচ্ছে প্রয়োজন হলে ডানার নীচে পেট্রল ট্যাঙ্ক খুলে ফেলে দিয়ে ৫০০ পাউণ্ড ওজনের দুটি বোমাও এরা নিতে পারে এবং তখন এরা হয়ে দাঁড়ায় দুর্দ্ধর্ষ ফাইটার-বমার।

ফক্-উল্ফ ১৯০ (Focke wulf—190) জার্ম্মানীর নূতন ধরণের জঙ্গী। মিত্রশক্তির বিমান আক্রমণে বাধা দেবার জন্যই এর ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু মেসারমিটই জার্ম্মান জঙ্গীর সব চেয়ে ভাল মডেল। এরই অংশবিশেষের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করে জার্ম্মানী নানা ধরণের জঙ্গী তৈরী করে।

মিত্রপক্ষের বিমানগুলি যখন অতিমাত্রায় প্রবল হয়ে ওঠে এবং ঘরে বাইরে

উভয় স্থানেই যখন জার্ম্মাণ বিমান বলকে বার বার পরাভূত করে তখন জার্ম্মান সমর-কর্ত্তারা নানা রকম গোপন অস্ত্র আবিষ্কার ও প্রয়োগ করবার দিকেই ঝুঁকে পড়লেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্ম্মানীর প্রতিভা যেমন নূতন নূতন বিমান তৈরী ক'রে সমস্ত জগতের বিস্ময় আকর্ষণ করেছিল শেষের দিকে পরাজয় সুনিশ্চিত জেনে সে প্রতিভা অন্যান্য রকমের ভীষণ ও মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কারে মন দিয়েছিল। ১৯৪৪ সালের মার্চ্চ মাসে মিত্র শক্তির বোমারু বার্লিনের আকাশে ঝাঁকের পর ঝাঁকে পনর মাইল জুড়ে উড়ে গিয়েছিল ও এসেছিল —দুই হাজার বোমারুর মধ্যে মাত্র ৬৮ খানা সেদিন নষ্ট হয়েছিল আর জার্ম্মানীর ফাইটার মারা পড়েছিল ১৭৬ খানা। কেবল একদিন নয়, এইরকম ক্ষতি জার্ম্মানীর দিনের পর দিন ধরে হচ্ছিল। এই রকম ক্ষতি সামলে উঠে আবার দাঁড়ানো—কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, জার্ম্মানীর পক্ষেও নয়।

'কিটি-হক' (Kitty hauk) আমেরিকার একটি আধুনিকতম ফাইটার-বমার। একটি ইঞ্জিন, একজন চালক, ছয়টি মেশিনগান, একেবারে মাটির উপর দিয়ে দ্রুত উড়ে যাবার ক্ষমতা এই বিমান খানাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বড়ই কার্য্যকরী করে তুলেছে। জার্ম্মানী প্রথমটা Stuka dive-bomber দিয়ে যে কাজ করতো, কিটি-হক সেই কাজই করছে কিন্তু এর ছোঁ মারার দরকার হয় না। শত্রুর গোলন্দাজদের একেবারে সামনে গিয়ে এরা ৫০০ পাউণ্ডের বোমা ফেলে দিয়ে উধাও হয়—একেবারে মাথা ছুঁয়ে এরা এত দ্রুত চলে যায় যে গোলন্দাজ তাক করবার কোনও অবসরই পায় না। যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে চলার সময় শত্রুর যান্ত্রিক বাহিনী নষ্ট ক'রে নিজ দলের পথ ক'রে দিতে এরা অদ্বিতীয়। ৫০০ পাউণ্ডের বোমা দুটি ফেলে দিলেই এরা আবার দুর্দ্ধর্ষ ফাইটার হয়ে দাঁড়ায়। কিটি-হকের মুখটা হাঙ্গরের মুখের মত—একে খুব নীচে আসে তারপর আবার বীভৎস মুখ—শত্রু বড়ই ভ'ড়কে যায়।

জঙ্গী বিমান থেকে প্রতি তিনটি বা পাঁচটি গুলি ছোঁড়বার পর একটা ক'রে বিশেষ ধরণের গুলি ছোঁড়া হয়। এই গুলি বাতাসের ভিতর দিয়ে যাবার সময়

নিজেরা পুড়ে যায়—আর রেখে যায় একটা ধোঁয়ার লাইন যাতে ক'রে গোলন্দাজ বুঝতে পারে তার গুলি ঠিক তাকমাফিক ছুটেছে কিনা। এই গুলিকে বলে ট্রেসার বুলেট। এর গতির রেখা দেখেই গোলন্দাজ তার কামান বা বন্দুক প্রয়োজন মত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেয়।

বিমানে বিমানে লড়াই

বিমান-যুদ্ধে জয় পরাজয় যার উপর নির্ভর করে, এক কথায় তার নাম দেওয়া যেতে পারে 'এয়ার সুপিরিয়রিটি' (air superiority)। আকাশে আধিপত্য কোন দলের তার মীমাংসা সব সময় বিমানের সংখ্যা দিয়েই করা যায় না। স্থলযুদ্ধে, জলযুদ্ধে, বিমানযুদ্ধে অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার যুদ্ধেই বলাধিক্য হচ্ছে জয়ের কারণ—এটা এত সাধারণ কথা যে সকলেই জানে। শত্রুর যদি ত্রিশ লক্ষ সৈন্য থাকে আর সেই ত্রিশ লক্ষের বিরুদ্ধে যদি পঞ্চাশ লক্ষ নিয়োগ করা যায়, তবে জয়ের সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু যুদ্ধে এরকম ব্যাপার তো ঘটে না, যে কোন একটা জায়গায় শত্রুর ত্রিশ লক্ষ সৈন্যকেই একখানে পাওয়া যাবে এবং পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্য দিয়ে তাকে পিষে মারা যাবে। যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের মীমাংসার জন্য ছোট বড় নানা রকমের খণ্ড-যুদ্ধ বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি ঘটে। বলাধিক্যের সব চেয়ে বড় কথা মোট সৈন্য সংখ্যা যতই থাকুক না কেন, এক একটি খণ্ড-যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে অধিকতর বলের ব্যবহার করা। আকাশের আধিপত্য মানে এ নয় যে সমস্ত আকাশ জুড়ে নানারকমের বিমান সর্ব্বদা ঘুরে বেড়াবে ও শত্রু বিমানকে কাছে ঘেঁষতেই দেবে না। তেমন ব্যাপার হওয়া সম্ভব নয়। আক্রমণ বা প্রতিরোধ যখনই যেখানে বিমানযুদ্ধ চলবে সেখানে শত্রুর বিরুদ্ধে বেশী শক্তি প্রয়োগ ক'রে শত্রুকে কাবু করা, তখনকার মত সেখান থেকে শত্রু বিমানকে (বোমারুই হউক বা জঙ্গীই হোক) তাড়িয়ে দেওয়া। কেবল বিমানের সংখ্যার উপর নির্ভর করলেই বিমান-যুদ্ধে জয়লাভ হয় না। দলে ভারী হয়েও অনেক বিমান-বাহিনীকে শত্রুর আক্রমণ থেকে লেজ দেখিয়ে (লেজ গুটিয়ে নয়)

পালাতে দেখা গিয়েছে। এয়ারোপ্লেনের কলকজা যদি ভাল হয়, পাইলট যদি সুদক্ষ হয় আর বিমানের অস্ত্রসজ্জা (gun power) যদি বেশী হয় অর্থাৎ একই সময়ে শত্রুর চেয়ে সংখ্যায় বেশী গুলি ছুঁড়বার যদি ব্যবস্থা থাকে তবে অল্প সংখ্যক বিমানও বেশী সংখ্যক বিমানকে হারিয়ে দিতে পারে।

খুব উন্নত ধরণের এয়ারোপ্লেন তৈরী করে শত্রুকে প্রথম প্রথম খানিকটা জব্দ করা যায় বটে কিন্তু শত্রু তো আর চুপ করে বসে নেই। বিমান যত ভালই হোক না কেন তার প্রতিদ্বন্দী বিমান অন্যপক্ষ বের করে ফেলবেই। বিমানের দল শত্রুর দেশে গেলে দু চার খানা ঘায়েল হবেই। তখন তার কলকজা, মেশিনগান ও কামান, তেল ও বোমা রাখবার ব্যবস্থা শত্রুপক্ষ তন্ন তন্ন করে দেখবে এবং অল্পদিনের মধ্যেই ঐ ধরণের বিমান তারাও আকাশে পাঠাবে। সংখ্যা দিয়েও যেমন হয় না, তেমনি কেবল উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যেও যুদ্ধ জয় করা যায় না। কিন্তু সংখ্যাও দরকার, কার্য্যকরী বিমানও দরকার। সব চেয়ে বড় প্রয়োজন—সমস্ত যুদ্ধের পরিকল্পনাটি ঠিক করে বিমানের সাহায্যে কোথায় কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধ চালাতে হবে সেই কথা মনে রেখে রকমারি বিমান তৈরী করে যাওয়া ও বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে পাইলটদের শিক্ষিত, সুদক্ষ ও কর্ম্মপটু করে তোলা। বড় বড় ব্যাটলশিপ ও ক্রুজার মারবার জন্য একরকম বিশেষ ধরণের বিমানের প্রয়োজন এবং তাদের পাইলটদের বিশেষ শিক্ষার দরকার। জাহাজ ধ্বংস করার জন্য যে সব বিমান তৈরী হ'ল ও বৈমানিককে শিক্ষা দেওয়া গেল তাদের দিয়ে যদি স্থলযুদ্ধে অগ্রসর সেনাদলের সহায়তা করার চেষ্টা হয় তবে ফল হবে অত্যন্ত খারাপ। আকাশে আধিপত্য লাভের জন্য চাই প্ল্যানিং ও ষ্ট্র্যাটেজি। তবে ছোট খাটো খণ্ড-যুদ্ধে জিতবার কতকগুলি ট্যাক্‌টিক্‌স বা সঙ্কেত আছে।

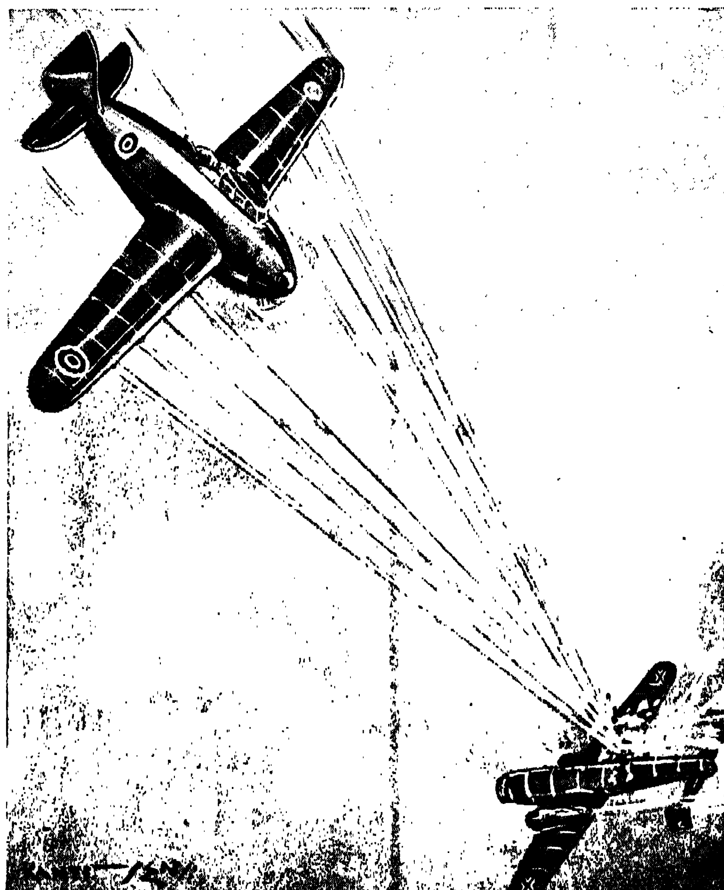
দিনের বেলায় সূর্য্যকে পিছনে রেখে যদি শত্রুর বিমান আক্রমণ করা যায়, কাছাকাছি মেঘের ভিতর থেকে যদি অতর্কিতে আক্রমণ চালান যায়, রাত্রি বেলায় নীচ থেকে শত্রুর এক এক খানা বিমানের উপর যদি দুটো তিনটে করে সার্চ লাইটের আলো ফেলা যায় আর নিজেদের বিমানগুলিকে যদি অন্ধকারে রেখে

দেওয়া যায়, তাতে বিমান-যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা বেশী। আসল আক্রমণের স্থান যেখানে সেখান থেকে একটু দূরে একটা মিথ্যা আক্রমণের অভিনয় দেখিয়ে শত্রু বিমানগুলিকে অনেক সময় প্রতারিত করা হয়। বিমানের যুদ্ধে সোজাসুজি ষাঁড়ের লড়াই করলে, দুখানা বিমানেরই ধ্বংস অনিবার্য্য। সেইজন্য ক্ষিপ্রতা ও কৌশল—এই দুটি জিনিস বিমান-যুদ্ধে বড়ই দরকার।

বিমান যুদ্ধে সত্যিকারের দায়িত্ব থাকে জঙ্গী বিমানের। বোমারুই হোক বা পর্য্যবেক্ষক বিমানই হোক, আক্রান্ত হলে এরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে মাত্র, তেড়ে গিয়ে যুদ্ধ করা এদের কাজ নয়। বরং এরা সব সময়ই চেষ্টা করে যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার। কারণ যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়লে এদের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না। বোমারু গিয়েছে বোমা ফেলতে, সে যদি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেয়, তবে বোমা ফেলা তার ভাগ্যে ঘটে উঠবে না। আবার বোমা ফেলবার আগেই শত্রু যদি গোলাগুলি ছুঁড়ে আকাশের বুকে বোমারুকে আঘাত করে তবে সেই বোমাগুলি হয় তো ঐখানেই ফেটে যাবে। বিপদ যা কিছু ঘটবার ঘটবে শুধু বোমারুর, শত্রু থাকবে নিরাপদে। পর্য্যবেক্ষণের বেলাও তেমনি—পর্য্যবেক্ষণের কাজ তার আর কিছুই হবে না—হয় গুলি খেয়ে মরতে হবে, না হয় ফিরতে হবে পালিয়ে।

এলোপাথারি গুলি ছুঁড়ে শত্রুর বিমানকে মাটিতে নামানো অসম্ভব। তাতে শত্রু বিমানের ক্ষতি করা যায় বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে পারে। তারপর বিমানখানা মেরামত করে কাজে লাগালেই হ'ল। যাতে এই রকমটি না হ'তে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে জঙ্গী বিমানের কামান বন্দুকগুলি একটু নূতন ধরণে সাজিয়ে রেখে। এমনভাবে এগুলি জঙ্গী বিমানের ডানার উপর সাজানো থাকে যে গুলি ছুঁড়লেই সব গুলি যেয়ে পড়ে শত্রু বিমানের উপর—পর পর একটি সরল রেখায় আর একই সঙ্গে। যদি আঘাতটা লাগে শত্রু বিমানের ডানায়, তবে ঠিক একটা সরল রেখায় ডানাটা কেটে গিয়ে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে পড়বে। এ রকম হলে আর কোন মতেই বিমানখানাকে ঘরে ফিরে যেতে হবে না।

এক যোদ্ধার জঙ্গী বিমান নিয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা বড় কঠিন সেটা সহজেই বুঝা যায়। শত্রু যদি পাশ থেকে বা পিছন থেকে ধাওয়া করে, তবে



মেশিনগানের গুলির মুখে শত্রু বিমানের অবস্থা

কি ভাবে যুদ্ধ করা যেতে পারে সেটা সত্যিই একটা সমস্যা; কারণ যোদ্ধাটি রয়েছেন এয়ারোপ্লেন চালাবার নানারকম কলকব্জা নিয়ে ব্যস্ত। এ সমস্যার সমাধান

করা হয়েছে বিমানের অস্ত্রশস্ত্র স্থির রেখে—এগুলো ঘুরানো ফিরানো যায় না ; তার বদলে গোটা বিমানখানাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শত্রুর উপর ছোঁড়া হয় গুলির ঝাঁক।

দুই-যোদ্ধার বিমানে দরকার মত কামান বন্দুক ঘোরাবার ব্যবস্থা থাকে। কারণ সেখানে এমন একজন লোক আছে যার কাজই হচ্ছে এইগুলি ঘুরিয়ে শত্রুকে তাক করা।

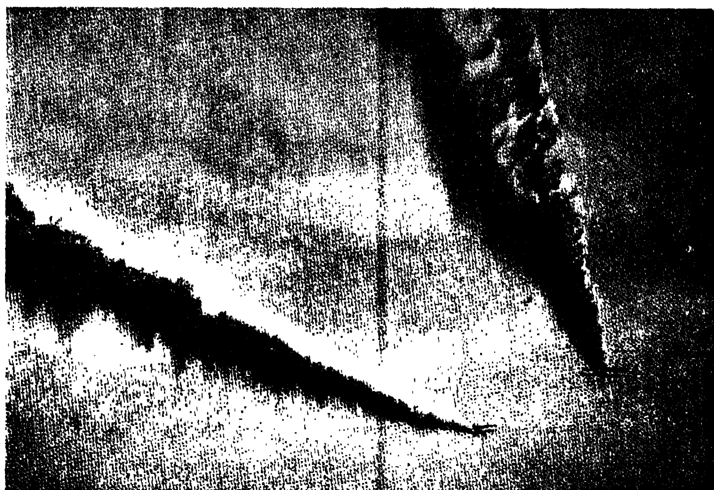
অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কামান বা মেশিনগান কোনটা বেশী কার্য্যকরী! কামানের পাল্লা বড়, তাই দূর থেকে যুদ্ধ করার সুবিধা কামানে বেশী। কিন্তু শত্রু বিমানের উপর কামানের গোলা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, এরকম হ'লে কামান-যুদ্ধ ব্যয়-বহুল হয়ে পড়ে অথচ সাফল্যও হয় অনিশ্চিত। মেশিনগানের পাল্লা কম—মাত্র একশ কি দেড়শ গজ। তা ছাড়া মেশিনগানের গুলিতে দুর্ভেদ্য বোমারুকে ঘায়েল করা বড়ই কঠিন। এই জন্যই আজকাল বিমানের আকার একটু বাড়িয়ে কামান ও বন্দুক দুই-ই জঙ্গী বিমানে রাখা হয়ে থাকে।

ঘণ্টায় আড়াইশ মাইল বেগে যদি দুখানা বিমান পরস্পর সম্মুখ থেকে আক্রমণ করে তবে আধ সেকেণ্ডের মধ্যে ঠোকাঠুকি হয়ে দুটোই ধ্বংস হয়ে যাবে। এই জন্যই যুদ্ধের সময় জঙ্গী-বিমানগুলো সম্মুখ থেকে শত্রুবিমানকে আক্রমণ না করে তার পাশ থেকে অথবা পিছন থেকে ধাওয়া করে।

পাশ থেকে আক্রমণ চালানো কিছু সহজ নয়। প্রথমত আক্রান্ত হলে কোন বিমানই সোজা সহজ পথে চলে না। প্রাণভয়ে একখানা বিমান ছুটে চলেছে আর একখানা বা কয়েকখানা তাকে ধাওয়া করেছে হয়তো সমান বেগে। বাঁচবার জন্য তখন তাকে চলতে হয় এঁকে বেঁকে—উপরে উঠে অথবা নীচে নেমে, প্রতি-মুহূর্ত্তে গতি পরিবর্ত্তন ক'রে—যাতে শত্রু বিমান সহজে তার নাগাল না পায়। আক্রমণকারী বিমানকে দূরে রাখবার জন্য আক্রান্ত বিমান অনেক সময়েই চলে ধোঁয়ার জাল ছড়িয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে।

বৃটেনে কেণ্টের বিমান ঘাঁটির উপর বোমা ফেলতে এসেছিল যে সব জার্ম্মান বোমারু তাদের সঙ্গে কয়েকখানা 'মেসারমিট ফাইটার' ছিল। তাদেরই একটি

ফাইটারের সঙ্গে বৃটিশ ফাইটারের বাধল আকাশযুদ্ধ। বিশ হাজার ফুট উঁচুতে অনেকক্ষণ ধরে নানা রকম কৌশল করে একটি আর একটিকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ মেসারমিটের একটা কামানের গোলার ঘায়ে বৃটিশ ফাইটারটির পেট্রল জ্বলতে আরম্ভ করল ও প্লেনখানাতে আগুন ধরে গেল। জ্বলন্ত

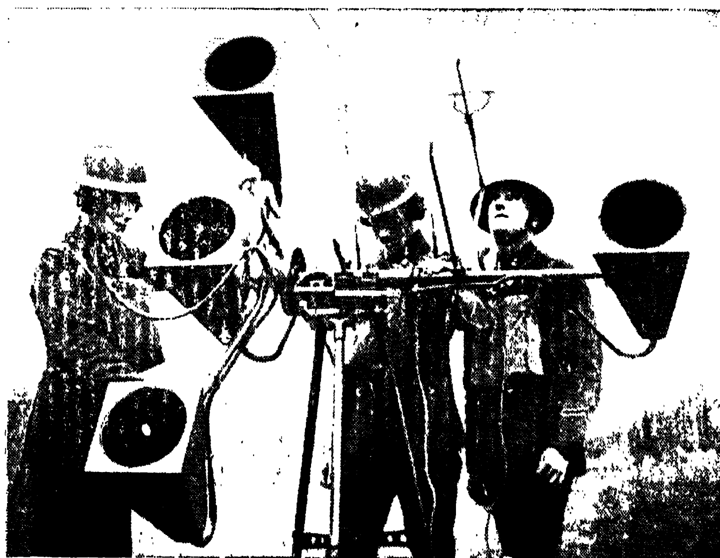


আকাশে ধোঁয়ার জাল ছড়িয়ে বিমান পালাচ্ছে

প্লেনখানি সহরের উপর পড়লে বাড়ীঘর নষ্ট হতে পারে ও নীচের লোকজনের অনেকের জীবনহানিও হতে পারে। এই অবস্থায় সৈনিকের যা করা উচিত তিনি তাই করলেন। জ্বলন্ত প্লেনখানাকে চালিয়ে তিনি নিয়ে গেলেন সমুদ্রের উপর, প্লেনখানাও ডুবল—তিনিও রক্ষা পেলেন না। এই ধরণের কাণ্ড করেছিলেন আর একজন রুশ বৈমানিক। বিমান-ভর্ত্তি বোমা সুদ্ধ প্রকাণ্ড প্লেনখানায় পেট্রল ট্যাঙ্ক জ্বলে উঠেছে—প্যারাস্থট নিয়ে লাফিয়ে পড়লে পাইলট রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু রুশ বৈমানিকটি করলেন এক অদ্ভুত কাণ্ড। তিনি জ্বলন্ত বিমানখানা নিয়ে ডাইভ্ করে পড়লেন একেবারে জার্ম্মান বাহিনীর মধ্যখানে। তিনি অবশ্য প্রাণ

দিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ নিয়ে গেলেন অনেকের। এঁর নাম ক্যাপ্‌টেন নিকোলাই গেষ্টালো। এঁকে (মৃত্যুর পর) Hero of the Soviet union—এই সর্ব্বোত্তম সম্মান দেওয়া হয়।

শত্রুপক্ষের বিমান যখন আক্রমণ করতে আসে তখন শব্দগ্রাহী যন্ত্রের সাহায্যে অনেক দূরে থাকতেই পাওয়া যায় তার সন্ধান। আর এই সন্ধান পাওয়া মাত্রই



শব্দগ্রাহী যন্ত্র

সন্ধানী কর্ত্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন কোন দিক থেকে শত্রু আসছে। কর্ত্তৃপক্ষ তখন আদেশ দেন জঙ্গী বিমানগুলিকে এগিয়ে যেয়ে শত্রুকে প্রতিহত করতে। যন্ত্রের মত সবাই কাজ করে—কোথাও এতটুকু বিলম্ব হয় না।

জঙ্গী বিমানগুলো এগিয়ে গিয়ে প্রথমেই চেষ্টা করে শত্রুকে ঘিরে দাঁড়াতে, যাতে করে এড়িয়ে যাবার বা পালিয়ে যাবার পথ শত্রু না পায়। তারপরই আরম্ভ হয় মারণ যজ্ঞ। প্রত্যেকখানি বিমান থেকে গর্জ্জে ওঠে মেশিনগান।

মিনিটে এক এক খানি জঙ্গী বিমান থেকে ছুটতে থাকে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচশ গুলি। জীবন মরণ তুচ্ছ করে একপক্ষ চায় পথ কেটে নিতে—আর বুকের রক্ত ঢেলে আর একপক্ষ চায় তাকে ঠেকিয়ে রাখতে—অকর্ম্মণ্য করে দিতে। কামান আর বন্দুকের শব্দে মুখর হয়ে ওঠে নীচের সমস্ত জনপদ। আকাশের বুকে চলে আগুনের খেলা। নীচের বাড়ীঘর, বনজঙ্গল থাকে কাঁপতে। তীব্র বিস্ফোরকের গন্ধে বাতাস হয়ে ওঠে ভারী ও বিষাক্ত।

এমনি ভয়াবহ আবেষ্টনীর মধ্যেই দিনের পর দিন চলে বিমান যুদ্ধ।

দুপক্ষের দুখানা জঙ্গী বিমানের মধ্যে খোলা আকাশে যে যুদ্ধ হয় তাকে বলা হয় Dog fight বা কুকুরের লড়াই। সামনে বা ডানার পাশে যখন কামান বা মেশিনগান সাজানো থাকে তখন একথা সকলেই বুঝতে পারে যে একখানা আর একখানার সামনে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না। এই অবস্থায় একখানা বিমান চক্রাকারে ঘুরতে থাকে এবং অন্যখানা তার পিছনে পিছনে ঐ রকম বৃত্তপথে ঘুরতে ঘুরতে ধাওয়া করে। উভয়েরই লক্ষ্য এক, শত্রুর বিমানের পেছনের দিকটা মেশিনগানের সামনে পড়লে পূরাদমে দুখানা প্লেনই গুলিবৃষ্টি করে যায়। এইরকম করতে করতে যে প্লেনখানা এরই মধ্যে হঠাৎ একটু স্পীড বাড়িয়ে শত্রু বিমানখানাকে ঠিক মুখের সোজাসুজি পায় সেই জেতে। আকাশে কিন্তু এই লড়াই দেখতে খুব ভাল লাগে। সহরের কাছাকাছি দিনের বেলায় আকাশে যখনি এই ডগ্ ফাইট্ হয়েছে তখন সহরের অনেক লোক সাইরেণের নিষেধ অমান্য করে নিজের জীবনের কথাও ভুলে এই বাজের লড়াই দেখবার জন্য খোলা জায়গায় এসে জমা হয়েছে। এতে বিপদ হয়েছে অনেকের, প্রাণও দিয়েছে কেউ কেউ কিন্তু তবু শেষ পর্য্যন্ত কৌতূহল দমন করা সম্ভব হয় নি।

পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করার জন্যে বিমান দুখানির এই যে বৃত্তাকারে ভ্রমণ এটা অনেকক্ষণ পর্যান্ত চলতে থাকে। এর মধ্যে হঠাৎ যদি কোন তৃতীয় বিমান এসে পড়ে অর্থাৎ একপক্ষেরই যদি দুখানা প্লেন হয় তবে আর রক্ষা নাই। অপর বিমানখানির ধ্বংস অনিবার্য্য। এখনকার কালের ভাল জঙ্গী যেগুলি ঘণ্টায়

তিনশো বা চারশো মাইল বেগে চলে সেগুলিকে এ রকম ছোট জায়গায় বৃত্তাকারে ঘুরোতে গিয়ে পাইলট্ যদি বেগ বেশী দেয় তাহলে তার অজ্ঞান হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং পাইলটকে মাথা খুব ঠাণ্ডা করে কাজ করতে হয়।

এখন জঙ্গী বিমানের পাইলটকে আকাশে অনেকদিন ধরে ঘুরিয়ে বিমান চালাবার নানা রকম সঙ্কেত শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। নানা রকম কৌশল না জানলে শত্রুর জঙ্গী বিমানের সামনে পড়ে রক্ষা পাওয়া যায় না। ধরা যাক এক-খানা বিমান ছুটে চলেছে আর তার দুশো গজ পেছনে মেশিনগান বাগিয়ে ধাওয়া করেছে আর একখানা জঙ্গী। সামনের বিমানখানা তখন করবে কি—সোজা চললে পেছন থেকে তো গুলির ঝাঁক ছুটে আসবে। বাঁচতে হলে তাকে কখনো উপরে কখনো নীচে, কখনো বাঁয়ে কখনো ডাইনে একটু বেঁকে ছুটতে হবে। এতে পেছনের জঙ্গীখানা ধাওয়া করা ছেড়ে দেবে না। কিন্তু সামনের খানা ডাইনে বেঁকল না বাঁয়ে বেঁকল এটা বুঝতে পেছনের পাইলটের একটু সময় লাগবেই। এই রকম দু'তিনবার যদি সে পেছনের জঙ্গীখানাকে ধাপ্পা দিতে পারে, এবং এই সমস্ত কৌশল বুঝতে পেছনের পাইলটের যদি এক সেকেণ্ড সময়ও লাগে, তবে এর মধ্যেই সামনের জঙ্গীখানা এক সেকেণ্ডের মধ্যেই আরও ২০০ গজ এগিয়ে যাবে। এই রকম কয়েকবার যদি সে ফাঁকি দিতে পারে তবে তার প্রাণ নিয়ে ফেরবার সম্ভাবনাই অত্যন্ত বেশী।

জঙ্গী যখন বমারকে আক্রমণ করে, তখন তার লক্ষ্য হয় বোমারুর ল্যাজের মধ্যে যে গানার বসে আছে তাকে জখম করা। এই গানারের গোলার ঘায়ে জঙ্গী বিমানের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়। সেইজন্যেই বোমারুর গানারের উপর জঙ্গীর এত আক্রোশ। এই গানার যদি জখম হয়ে পড়ে তা হলে বোমারুকে রক্ষা করবার আর কেউ থাকে না। জঙ্গীগুলো তখন একেবারে খুব কাছে এসে বোমারুর পেছনে গুলি গোলা চালাতে থাকে, এবং এতে বোমারু একেবারে মারা না পড়লেও তার ক্ষতি হয় গুরুতর।

মালবাহী বিমান ও গ্লাইডার

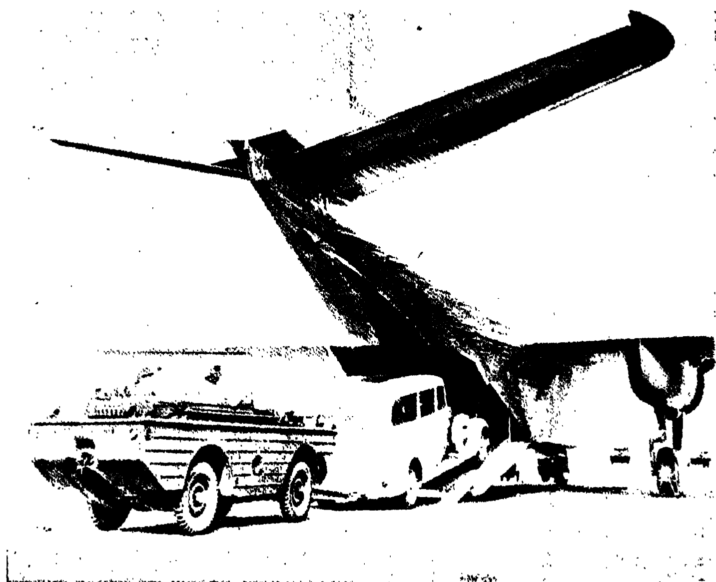
যুদ্ধের প্রয়োজনে অনেক সময় দূরদূরান্তে সৈন্য অস্ত্র ও বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অতি দ্রুত সরবরাহ করা একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠে। জলপথে বা স্থলপথে মালপত্র সর্ব্বদাই যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয় যে আকাশপথে অবিলম্বে লোকজন বা বিশেষ বিশেষ জিনিস না পাঠিয়ে আর উপায় থাকে না। আফ্রিকায় যুদ্ধ যখন প্রবল হয়ে উঠল আর ভূমধ্য সাগরে ব্রিটিশ রণতরীগুলিকে ফাঁকি দিয়ে আফ্রিকায় সৈন্য ও অস্ত্র যখন পাঠান সম্ভব



জার্ম্মানীর অতিকায় ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন

হল না তখন জার্ম্মানী বিরাট আকারের সৈন্যবাহী বা মালবাহী বিমানে করে সৈন্য ও অস্ত্র আফ্রিকায় পাঠাতে লাগল। এই বিরাট আকারের প্লেনগুলিকে বলা হয় ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন। এই রকম বড় বড় বিমানে করে আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রে সাজ্যাতিক ভাবে জখম মিত্রপক্ষের সৈন্যগণকে জরুরী চিকিৎসার জন্যে ইংলণ্ডে নিয়ে আসা হত। ভারতবর্ষ থেকে অনেক অস্ত্র শস্ত্র ও ওষুধপত্র চীনে পাঠিয়ে

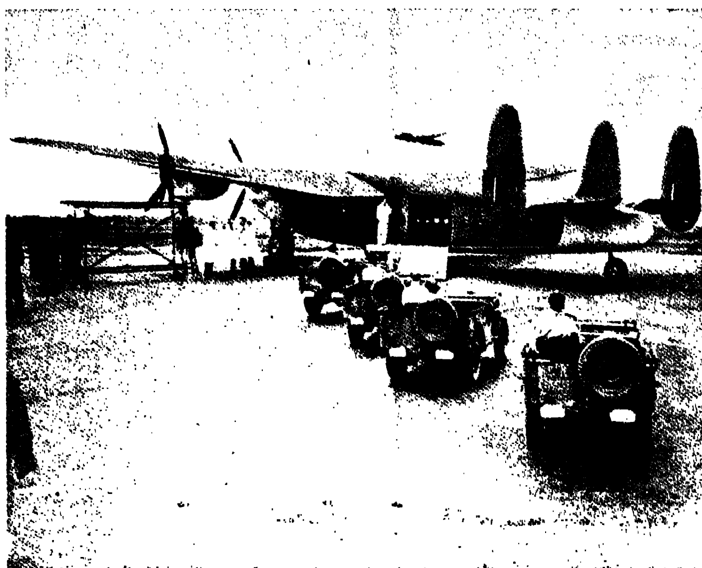
সাহায্য করা হত। আমেরিকা চীনকে যে সাহায্য করত সেই সব জিনিসপত্র ভারতবর্ষের ভেতর দিয়েই চীনে যেত। এই সব মাল নিয়ে প্রতি মাসে হাজার হাজার মোটর লরি বর্ম্মা রোড দিয়ে চীন সীমান্তে গিয়ে উপস্থিত হত। জাপানীরা যখন এই বর্ম্মা রোড অধিকার করে নিল তখন চীনে মাল পাঠান বন্ধ হল। সাহায্য না পেলে চীনের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া মুস্কিল। কিন্তু সাহায্য পাঠান



আমেরিকার ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন

হবে কোন পথে। একটিমাত্র পথ, তাও শত্রুর অধিকারে। কয়েক সপ্তাহ মাল পাঠান বন্ধ রইল। কিন্তু একদিন জাপানীরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখল যে আকাশে এক নূতন বর্ম্মা রোড সৃষ্টি হয়েছে। ব্রিটিশ ও আমেরিকার অতিকায় ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনগুলি আকাশ দিয়ে উড়ে একেবারে চীনের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। এই সব বিমানে দুখানা থেকে চারখানা মোটরগাড়ী ও পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ জন সশস্ত্র সৈন্য অনায়াসে যেতে পারে।

জেপ্‌লিনের মত গ্লাইডারকেও আমরা বলতে পারি বিমানের অগ্রজ। বিমানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্লাইডারের মূল্য অনেকখানি কমে এসেছিল একথা বলা যেতে পারে। কেননা গ্লাইডার চালানোর হাঙ্গামা যা ছিল তাতে তার সুবিধার দিকটা অনায়াসে উপেক্ষা করা চলত। ক্রীটের যুদ্ধে জার্মানী বহুসংখ্যক গ্লাইডার ব্যবহার করার পর থেকে লোকের গ্লাইডারের দিকেও বেশ কিছুটা নজর পড়েছে।



বৃটিশ ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন

গ্লাইডার তৈরী করতে কোন ব্যয়বহুল ইঞ্জিনের দরকার হয় না, এতে কোন ইঞ্জিনই থাকে না মোটেই। বাইরের কোন শক্তির সাহায্যে—তা সে হাত দিয়ে দড়ি টেনেই হোক, অথবা মটর দিয়ে গ্লাইডারকে খানিকটা টেনে নিয়েই হোক প্রাথমিক গতি সঞ্চার করা হয়। তারপর গ্লাইডার অনুকূল বাতাসে ভাসতে থাকে।

ব্যয়বহুল ইঞ্জিন না থাকাটা যেমন গ্লাইডার তৈরীর মস্ত বড় সুবিধা তেমনই আবার অনুকূল বায়ুর উপর নির্ভর করে বসে থাকাটা হচ্ছে মস্ত বড় অসুবিধা।

যন্ত্র যদি আত্মনির্ভরশীল না হয়—প্রকৃতির খেয়ালের উপর, বাতাসের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে যদি যন্ত্র নিয়ে বসে থাকতে হয় তবে যন্ত্র তৈরী করে লাভ কি ? আর শেষ পর্য্যন্ত সে যন্ত্রের সার্থকতা কোথায় ?

ভার্সাই সন্ধির ফলে জার্ম্মানীর বিমানবলকে যখন ক্ষুণ্ণ করা হল তখন থেকেই এই গ্লাইডারের উন্নতিসাধন করবার জন্য সে মন দিল। এ বিষয়ে সে উন্নতি-সাধন করেছেও অনেক। গ্লাইডারকে এখনও হাওয়ার মর্জ্জির উপর অর্থাৎ অনুকূল বাতাসের জন্য চুপ করে বসে থাকতে হয় বটে কিন্তু সমুদ্রের উপকূলে বাতাসের গতির তেমন অদল বদল ঘটে না, সেখানে দিনের বেলা মাটি থেকে সমুদ্রের দিকে আর রাতের বেলায় সমুদ্র থেকে মাটির দিকে বায়ুর স্রোত চলতে থাকে। সুতরাং এজায়গায় অনির্দ্দিষ্টকাল অনুকূল বায়ুর জন্য অপেক্ষা করার কোন দরকার করে না। এরকম ক্ষেত্রে গ্লাইডার হয়ে দাঁড়ায় বিমানের চেয়েও বেশী কার্য্যকরী।

গ্লাইডারে কোন ইঞ্জিন থাকে না বলে এর দাম হয় খুবই সস্তা। একখানা মটর সাইকেল তৈরী করতে যা খরচ হয় একখানা গ্লাইডার তৈরী করতে তার চেয়ে বেশী খরচ হবার কথা নয়। অবশ্য খুব বড় আকারের গ্লাইডারে মাল-মশলা বেশী লাগে বলে খরচ একটু বেশী হয়। গ্লাইডারের আরও একটা মস্ত সুবিধার কথা হচ্ছে এই যে এতে এক ফোঁটা তেলের দরকার হয় না। যুদ্ধের দিনে তেল সব দেশেই দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। সুতরাং এটা কম লাভের কথা নয়।

গ্লাইডার চালান এয়ারোপ্লেন চালান থেকে অনেক সোজা বলে এতে কোন সুদক্ষ চালকের দরকার হয় না। শত্রুর দেশে বিশেষ করে সমুদ্রের উপকূলে তাই এয়ারোপ্লেন পাঠানর চেয়ে গ্লাইডার পাঠান সুবিধা। কারণ যদি দশ বিশখানা গ্লাইডার মারাও পড়ে তবে যা ক্ষতি হয় তা অনায়াসে উপেক্ষা করা যায়।

এখন সব দেশই গ্লাইডার দিয়ে মালপত্র চলাচলের দিকে নজর দিয়েছে। এগুলি এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটা রেলের মালগাড়ীর মত। রেলে যেমন

লাইনবন্দী মালগাড়ীকে শক্তিশালী ইঞ্জিন দিয়ে দূরদূরান্তরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় আকাশপথেও ঠিক তেমনি শক্তিশালী একখানি বিমানের পিছনে মাল বোঝাই কতকগুলি গ্লাইডার বেঁধে দেওয়া হয়। আকাশপথের এই মালগাড়ীর সাহায্যে আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত্রুর অধিকৃত দেশে আবদ্ধ সৈন্যদলকে অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ্ করা হ'য়ে থাকে।

বিমান-বাহিনীর আর এক অঙ্গ

যারা যুদ্ধ করতে আকাশে ওড়ে তাদের নিয়েই শুধু বিমান-বাহিনী—এ ধারণা ভুল। উড়ন্ত পোতের প্রত্যেকটি লোকের জন্য মাটিতে থাকে কমপক্ষে পাঁচটি করে লোক। এরা আকাশে উঠে যুদ্ধ করে না সত্যি কিন্তু আকাশ-বাহিনীর কাজ এদের বাদ দিয়ে সুচারুরূপে চলতে পারে না। সহজভাবে যখন কাজ চলে তখন এরা কি করে, কতটা করে তা বাইরে থেকে বুঝা যায় না। কিন্তু কিছু ঝড়তি পড়তি হলেই বেশ বুঝা যায় আকাশ-বাহিনীতে এদের মূল্য ঠিক কতটা। এই সব কর্ম্মিদল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকে, কিন্তু বিপক্ষ বোমারুগুলি প্রথমেই চেষ্টা করে এদের কাজে বাধা দেবার। তাই সুযোগ পেলে বিমান ঘাঁটির উপর হয় প্রথম আক্রমণ।

এই সব কর্ম্মিদের সত্যিকারের কাজ কি? এই সব কর্ম্মিদলে আছে ফিটার, ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রবিদ্, বেতার-বিশেষজ্ঞ, ফোটোগ্রাফার, নার্স প্রভৃতি। এদের প্রথমতঃ ভাগ করে নেওয়া যায় দুভাগে। প্রথম, যারা বিমানের কলকব্জা পরীক্ষা করে, যারা অস্ত্র শস্ত্র দেখে বেড়ায় আর দরকার মত সেগুলো মেরামত করে। আর দ্বিতীয়, যারা বৈমানিকদের খাদ্য, পানীয়, সুখসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখে।

এই সব কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকে মেয়ে আছেন। এঁদের উপর পড়েছে প্রধানতঃ শেষোক্ত কাজের ভার। কিন্তু বেতার যন্ত্র চালনা প্রভৃতি বিশেষ কাজেও এঁরা পিছপা নন।

আকাশের বুক থেকে নেমে যেই মাত্র একখানি বিমান নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে এল, অমনি শেষ হল বৈমানিকদের কাজ। কঠোর পরিশ্রমের পর তাঁরা

যান বিশ্রাম করতে। আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়, ঘাঁটির বিভিন্ন ধরণের কর্ম্মীদের কাজ। প্রত্যেকটি কলকব্জা তন্ন তন্ন ক্বরে পরীক্ষা করে দেখা হয়। বিমানের যদি কোন ক্ষতি হয়ে থাকে, তবে সে ক্ষতির সংশোধন করা হয় অবিলম্বে।

গুপ্তচর-বিমান বা পর্য্যবেক্ষক বিমান যখন ঘাঁটিতে এসে নামে, কর্ম্মীদের একজন তখন ছুটে গিয়ে বৈমানিকের হাত থেকে নিয়ে আসে তার তোলা ফোটোগ্রাফ, এবং সেটাকে তখনি ডেভালপ করবার জন্য উপযুক্ত লোকের হাতে দেয়।

এ ছাড়া বিমান ঘাঁটিতে থাকে আর এক ধরণের কর্ম্মী—যাদের কাজ হচ্ছে আকাশগামী বোমারু, জঙ্গী, পাহারাদার, এক কথায় সব রকম বিমানের সঙ্গে বেতারে সংবাদ আদান প্রদান করা। কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে যখনই যে নির্দ্দেশ আসছে সেগুলোকে সাঙ্কেতিক ভাষায় উড়ন্ত বিমানে পৌছে দিতে হয়। এমনি ক'রে বৈমানিকেরা কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে পারে, অথবা উড়ন্ত বিমানখানি ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা, অথবা কোন বিপদে পড়েছে কিনা—যে কাজের ভার নিয়ে গিয়ে ছিল তা সফল হয়েছে কিনা সেটা যত শীঘ্র সম্ভব কর্ত্তৃপক্ষকে এঁরাই বেতারযোগে জানিয়ে দেন।

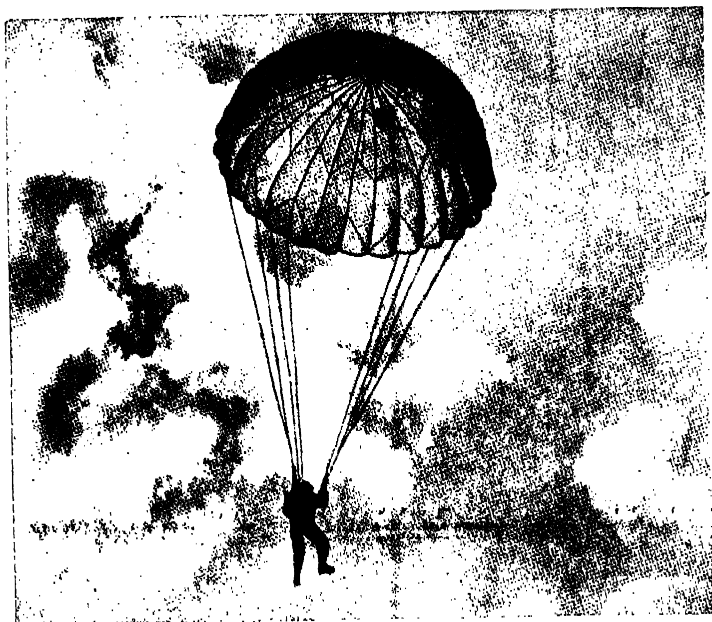
বিমান ঘাঁটিতে আর এক দল কর্ম্মী থাকে যাদের কাজ হচ্ছে বৈমানিকরা ফিরে এলে তাদের প্রত্যেকটি প্যারাস্যুট পরীক্ষা করা ও দরকারমত সেগুলো মেরামত করা। এ কাজটি মোটেও ছোট কাজ নয়—কেন তা বুঝিয়ে বলছি।

প্যারাস্যুট

আকাশে উঠবার আগে প্রত্যেক বৈমানিক একটি করে প্যারাস্যুট সঙ্গে নেয়। প্যারাস্যুট হচ্ছে বৈমানিকদের লাইফ্‌বেল্ট (Life Belt)। বিমানের যন্ত্র বিকল হয়েই হ'ক বা অন্য কোন কারণেই হ'ক—হঠাৎ যদি চলন্ত বিমান থেকে

বৈমানিককে নীচে নামতে হয়—তখন এই প্যারাস্থটই হচ্ছে তার আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

প্যারাস্থট আসলে একটা ছাতার মত—তবে আকারে অনেক বড়। গুটিয়ে অনায়াসে একটা ফিতে দিয়ে সঙ্গে ঝুলিয়ে নেওয়া চলে। দরকারমত ব্যবহারের জন্য সব সময়ই বৈমানিকের পিঠে একটা করে প্যারাস্থট থাকে।



প্যারাস্থট নামছে

প্যারাস্থটের সাহায্যে নীচে নামা যেতে পারে দুরকমে—যখন অল্প উঁচু থেকে মাটিতে নামতে হয় তখন বৈমানিক এয়ারোপ্লেনের ডানার উপর দাঁড়িয়ে টেপে প্যারাস্থটের বোতাম। সঙ্গে সঙ্গে প্যারাস্থটটি খুলে যায় আর বাতাসে বৈমানিককে একটু উপরে ঠেলে তুলে। তারপরেই নিজের ভারে বৈমানিক নীচে নামতে থাকে। প্যারাস্থটে বাতাস বেধে যাওয়ায় নীচে পড়বার বেগ যায় অনেকটা কমে।

ঠিক যে সময় বাতাস বৈমানিককে উপরে ঠেলে তোলে, সেই সময়ের মধ্যে বিমান-খানা খানিকটা যায় এগিয়ে। তাই প্লেনে প্যারাস্যুট জড়িয়ে গিয়ে বৈমানিকদের প্রাণহানি হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এইভাবে নামার ধরণকে বলা হয় "লিফ্‌ট্‌ অফ্‌ (Lift off)।

অনেক উপর থেকে নামতে হলে এভাবে না নেমে বৈমানিক সোজা নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিমানের যে কোন স্থান থেকে।

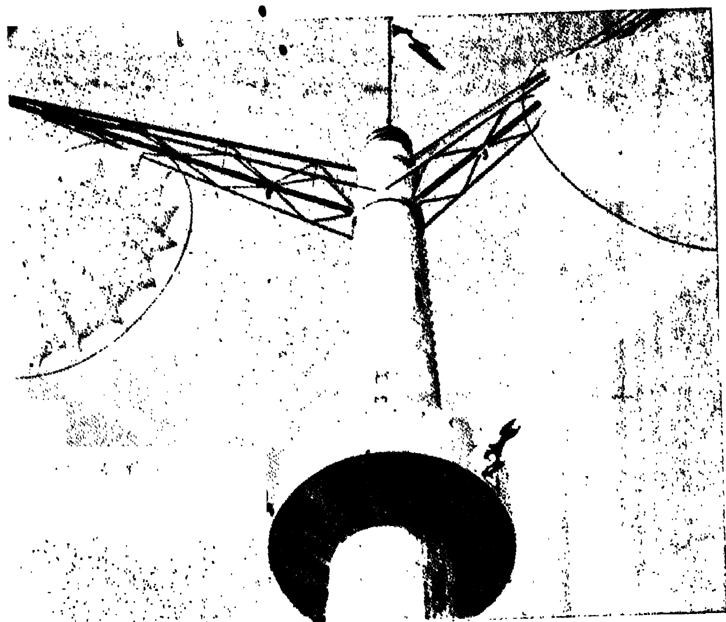
ঝাঁপিয়ে পড়ার কয়েক সেকেণ্ড পরে যখন বিমানখানি সামনের দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে অর্থাৎ যখন ছড়ানো প্যারাস্যুট-খানা চলন্ত বিমানের গায়ে বেধে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই, তখনই বৈমানিক প্যারাস্যুটের বোতাম টিপে দেয়। বোতাম টিপতেই বেরিয়ে পড়ে ছোট্ট একটা প্যারাস্যুট—যাকে বলা হয় পাইলট প্যারাস্যুট (Pilot parachute) এরই টানে খুলে যায় আসল প্রকাণ্ড প্যারাস্যুট। প্যারাস্যুট থেকে নামবার এই পদ্ধতিকে বলে "ফ্রি ফল্‌" (Free fall)। প্যারাস্যুট যত বড় হবে, তাতে বাতাস আটকাবে তত বেশী। আর যত বেশী বাতাস প্যারাস্যুটে বাধবে, ততই ভারী জিনিস উপর থেকে নীচে নামতে পারবে ধীরে ধীরে।

গুটানো একটি ছাতা নিয়ে অজানা অনিশ্চিতের মধ্যে পাঁচহাজার কি দশহাজার ফুট উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া—সময় মত বোতাম টিপলেই ছাতা খুলবে কি না—আর যদি না খোলে তবে একেবারে সব শেষ—এই সব কথা লাফিয়ে পড়বার আগে নিশ্চয়ই মনে পড়ে। সেইজন্য প্রত্যেক দেশেই প্যারাস্যুট লাফ শিখতে হয়। অল্প উঁচু একটা স্তম্ভ থেকে প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। রাশিয়াতে প্যারাস্যুট নিয়ে অনায়াসে লাফিয়ে পড়তে পারে এরূপ সৈন্যের সংখ্যা যুদ্ধের আগেই ছিল পঞ্চাশ হাজারের উপর। সেখানে পার্কে পার্কে উঁচু জায়গা থেকে লাফিয়ে পড়বার ব্যবস্থা আছে। স্কুলের ছেলেমেয়েরা দলে দলে প্যারাস্যুট জাম্প শিখতে আসে। একশ' বার যে প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়েছে তাকে বিশেষ পারদর্শিতার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।



ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্ব্ব মূহূর্ত্ত ; বোতামের উপর আঙুলটি লক্ষ্য করবার মত.

সে তখন ট্রেনার হয় ও অন্যান্য আরও ছেলেমেয়েকে শেখায়। যুদ্ধের সময় রাশিয়ায় অভিজ্ঞ প্যারাস্যুট বাহিনীতে সৈন্য ছিল প্রায় বিশলক্ষ নরনারী।



প্যারাস্যুট জাম্প শিখ্‌ছে

ঠিক নীচে নামার মুহূর্তে বেশ একটু বিপদ আছে। প্যারাস্যুটধারী ধীরে ধীরে টুপ করে মাটিতে এসে পড়ে না। বার ফুট উঁচু থেকে পড়লে মানুষ যতখানি আঘাত পায়, প্যারাস্যুট ধারীও ততখানি আঘাত পায় যখন এসে সে মাটি ছোঁয়। তা ছাড়া বাতাসে ভর্ত্তি থাকায় প্যারাস্যুটখানি তাকে নিয়ে যায় খানিকটা টেনে হিঁচড়ে। একবার একজন বৈমানিক প্যারাস্যুট নিয়ে সমুদ্রতীরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা দমকা বাতাস এসে প্যারাস্যুটধারীকে জলের উপর দিয়ে এমনভাবে টেনে নিয়ে গেল যে দ্রুতগামী মোটর বোটও তার নাগাল ধরতে পারল না। ফলে বৈমানিকের হ'ল সলিল সমাধি। এই সব বিপদ এড়াবার জন্য মাটি ছোঁবার

অল্প আগেই বৈমানিক একটি দড়ি টেনে প্যারাস্যুটকে যথাসম্ভব গুটিয়ে ফেলে। এতে বিপদের সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়।

অবাঞ্ছিত স্থানে যাতে নামতে না হয় তার ব্যবস্থা প্যারাস্যুটধারী নিজেই অনেকটা করতে পারে। কেননা তাকে কোন জায়গায় নামতে হবে এটা পূর্ব্বেই ঠিক থাকে এবং উপযুক্ত স্থানে এসে তবে সে প্যারাস্যুট ছড়িয়ে নীচে লাফ দিয়ে পড়ে। বাতাসের ধাক্কায় অথবা অন্য কোন কারণে যদি এক আধটু সরে যেতে হয় তবে সে আগে থাকতেই প্যারাস্যুটের দড়ি টেনে এদিকে ওদিকে একটু সরে যেতে পারে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের আগে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আটাশ ফুট ব্যাসের প্যারাস্যুট সাহায্যে সৈন্য স্থানান্তরিত করে, রাশিয়া প্যারাস্যুটের একটা নূতন রকম ব্যবহারের সম্ভাবনা প্রচার করে।

হল্যাণ্ডের এবং ফ্রান্সের যুদ্ধে, জার্ম্মানী এমনিভাবে প্যারাস্যুটের সাহায্যে সৈন্য চালনা করেছিল। এই সব সৈন্যদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল একটা হাল্কা মেশিনগান, একটি দূরবীণ, কিছু গোলাবারুদ, একটা বেতার যন্ত্র, একটা ভাঁজ-করা সাইকেল, কিছু খাদ্য, পানীয় আর প্যারাস্যুটের তার কেটে দেবার জন্যে একটা ছুরি।

সৈন্যদের এইভাবে শত্রুর দেশে নামা যে কত বিপদজনক তা না বললেও চলে। প্রথমতঃ আকাশ থেকে নামলে মাটিতে কোথায় এসে পড়তে হবে তার কোন স্থিরতা নেই। হয়ত প্যারাস্যুটে নেমে শেষ পর্য্যন্ত এসে পড়তে হল একেবারে শত্রুপক্ষের ছাউনীর মধ্যে সবার চোখের সামনে অথবা কোন বাড়ীর ছাতে। এ রকমটা হলে প্যারাস্যুট ধারীর কোন মতে নিস্তার নাই। মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুর গুলিতে তার জীবন শেষ হয়ে যাবে। একটা প্যারাস্যুট নিয়ে মাত্র একজন সৈন্যই নীচে নামতে পারে। শত্রুপুরীতে শত্রু যদি প্রস্তুত থাকে তবে প্যারাস্যুট সাহায্যে দুশ পাঁচশ সৈন্য নামিয়েও কোন ফল হবে না। শত্রু এদিকে সজাগ না থাকলে উদ্দেশ্য যে কতকটা সফল হতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে হল্যাণ্ডে।

হল্যাণ্ডে জার্ম্মানী যে সব প্যারাস্যুটধারী সৈন্য নামিয়েছিল, তারা ছিল ওলন্দাজ সৈন্যদের পোষাক পরা। এতে প্রথমটা দেশের লোকে ততটা সন্দেহ করতে পারেনি—তা ছাড়া পঞ্চম বাহিনী আগে থেকেই তৈরী থাকায় এই সব প্যারাস্যুটধারীদের ততটা বিপদ হয়নি।

প্যারাস্যুটে নামবার পর মাটি ছোঁবার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় প্যারাস্যুটধারীর বিপদ। শোনা যায় শত্রুকে অন্যমনস্ক করে ফেলবার জন্য জার্ম্মান প্যারাস্যুটধারীরা আগে থাকতে একটা রবারের মানুষ ফেলে দেয়—আশে পাশের লোকেরা যখন সেটার দিকে লক্ষ্য করতে এগিয়ে যায় তখন প্যারাস্যুটধারী নিজে নেমে তার আসল কাজের জন্য তৈরী হয়। সাধারণতঃ খুব অন্ধকার রাত্রে, ঝড় বৃষ্টি ও কুয়াসার মধ্যে শত্রুর দেশের কোন নিভৃত বা অরক্ষিত স্থানে প্যারাস্যুট নিয়ে এয়ারোপ্লেন থেকে লোক লাফিয়ে পড়ে। এরা সংখ্যায় হয়ত পঞ্চাশ ষাট জন, সবাই কাছাকাছি পড়েছে। মাটিতে পড়েই এরা প্যারাস্যুট গুটিয়ে রেখে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ঠিক করে নেয়, তারপর চেষ্টা করে দলবদ্ধ হবার। সকলে এক সঙ্গে মিলে ছোট্ট একটি দল গঠন করে। যেখানে এরা পড়লো সেখানকার ম্যাপ ও নক্সা এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই থাকে। কোথায় জলের কল, কোনদিকে রেল ষ্টেশন, কোথায় নদীর উপর সেতু, কোথায় টেলিগ্রাম অফিস—সব এদের জানা থাকে। এমন কি কোন গ্রামে কার বাড়ীতে গেলে অনেক গুপ্ত খবর ও সাহায্য পাওয়া যাবে তাও এরা আগে থাকতেই জেনে আসে। তারপর ছোট ছোট মেশিনগান নিয়ে, হাল্কা সাইকেলে চড়ে হঠাৎ এরা সুবিধামত একটা কিছু আক্রমণ করে গোলমাল বাধিয়ে দেয়।

বিপক্ষের প্যারাস্যুটধারী সৈন্য-বাহিনী যাতে ইংলণ্ডে না নামতে পারে তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। প্রথমতঃ যে সব স্থানে প্যারাস্যুট-বাহিনী নামবার আশঙ্কা আছে, সেখানে দিনরাত্রি কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। দিনের বেলা মেয়েরা এবং রাত্রিবেলা পুরুষেরা এই সব স্থানের উপর রীতিমত পাহারা দেয়। তাদের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কেউই সেখানে

নামতে পারে না। আর একটা কথা—ইংলণ্ডের প্রত্যেকটি নরনারীর দেশপ্রেম এবং কর্ত্তব্যবোধের জন্য ইংলণ্ডে পঞ্চম বাহিনী গড়ে ওঠেনি। পঞ্চম বাহিনীর সাহায্য না পেলে শুধু প্যারাস্থট সৈন্য দিয়ে শত্রুপক্ষের বিশেষ কোন ক্ষতি করা যায় না, বরং তাতে নিজেদেরই লোক ক্ষয় হয়। এই সব কারণে ফিন্‌ল্যাণ্ডে রাশিয়ার প্যারাস্থটধারী সৈন্যেরা একেবারে শোচনীয় ব্যর্থতা বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। আকাশ থেকে কোন রাশিয়ান সৈন্য নামা মাত্রই ফিন্‌ সৈন্যেরা তাকে শেষ করে দিচ্ছিল। শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়ে রাশিয়া এই সব প্যারাস্থটধারী সৈন্য ফিন্‌ল্যাণ্ডে নামান বন্ধ করে দিয়েছিল।

রাশিয়ার প্যারাস্থট-বাহিনী

রাশিয়ার যে বিরাট প্যারাস্থট-বাহিনী ছিল একথা আগেই বলা হয়েছে এবং প্যারাস্থট-বাহিনী সৃষ্টি ও তাদের সাহায্যে নগর আক্রমণ ও অধিকার প্রভৃতি ব্যাপার যে করা যেতে পারে তাও রাশিয়াই সকলের আগে প্রচার ও প্রমাণ করেছে। যেখানে প্যারাস্থট সৈন্য বিশ লক্ষ এবং সকলেই বিশেষভাবে শিক্ষিত সেখানে এক সীমান্ত থেকে অন্য সীমান্তে, ফ্রণ্টের এক পাশ থেকে অন্য পাশে, অতি অল্প সময়ে অনায়াসে বহু ডিভিশন সৈন্য স্থানান্তরিত করে চলে। জার্ম্মানরা যেমন ক্রীটে করেছিল তেমন ব্যাপকভাবে রাশিয়া কিন্তু তার প্যারাস্থট-বাহিনী এই যুদ্ধে ব্যবহার করে নাই। হয়তো প্রয়োজন হয় নাই, হয়তো এতে বাধা ছিল।

কিন্তু তাই বলে রাশিয়ার প্যারাস্থট-বাহিনী এই যুদ্ধে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিল না। ছোট ছোট প্যারাস্থটধারী দল দিয়ে রাশিয়া যখন পাল্‌টা আক্রমণ চালিয়েছিল তখন এদের কার্য্যকারিতা বুঝা গিয়েছিল।

জার্ম্মানী যখন রাশিয়া আক্রমণ করে, তখন প্রথম অবস্থায় জার্ম্মানী অতি দ্রুত বেগে রাশিয়ার ভিতর ঢুকে যায়। গ্রামের পর গ্রাম, সহরের পর সহর জার্ম্মানীর কবলে পড়ছিল—আর রাশিয়া ক্রমাগত পিছু হটে যাচ্ছিল। রাশিয়া যখন পিছু হাঁটা বন্ধ করে আক্রমণ করল—যে সব স্থান ত্যাগ করে চলে আসছিল সেগুলি

আবার অধিকারের জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করল—তখন তাদের প্যারাসুটধারী ছোট ছোট দল কি ভাবে সাহায্য করেছিল তারই একদিনের একটা ঘটনা বলছি।

রাশিয়ার একটি সহর—নাম যেন তার এল্-টাউন (L-Town)। এই সহরটি জার্ম্মানরা অধিকার করে আছে অনেক দিন। এই সহরটি পুনরধিকার করবার জন্য একজন রুশ সেনাপতি সামনে থেকে আক্রমণ চালিয়েছেন—কিন্তু জার্ম্মানরা হটছে না। অনেকদিন ধরে সেখানে তারা আছে কিনা, ঘাঁটিকে তারা খুব দৃঢ় করে ফেলেছে। রুশ আক্রমণ প্রচণ্ড হয়েই আরম্ভ হয়েছে, ক্রমেই তার বেগ বাড়ছে কিন্তু জার্ম্মানরা কিছুতেই পিছু হটছে না। সহরের পিছনে দুটি রাস্তা—দুদিক থেকে এসে ঠিক সহরের পিছনে মিশেছে। এক পথ দিয়ে নূতন নূতন জার্ম্মান সৈন্য সহরে এসে ঢুকছে আর এক পথ দিয়ে আসছে তাদের জন্য খাদ্য, পানীয়, গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র। রুশ সমর পরিষদ আদেশ দিয়েছেন—এল্-টাউনটি দখল করা চাই-ই। ব্যবস্থা হয়েছে, জার্ম্মান লাইনের পিছনে—যেখানে দু'টি রাস্তা এসে মিশেছে—সেখানে নেমে রসদপত্র অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট করে ফেলতে হবে ও জার্ম্মান সৈন্যগণের পিছনে একটা অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের বিহ্বল করে তুলতে হবে। পিছনের এই বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গেই যদি সামনের আক্রমণটা প্রচণ্ড হয়ে উঠতে পারে—তবেই সহর দখল করা যাবে!

প্রায় একশ' মাইল দূরে একটা রুশ বিমানঘাঁটি থেকে এক ভয়াবহ শীতের রাতে হাউইয়ের মত একটা লাল আলো অনেক উপরে উঠে ফেটে পড়ল আর কয়েকখানা বড় বড় সৈন্যবাহী প্লেন প্যারাসুটধারী সৈন্য নিয়ে চলল। আরোহী সকলেই একটা কৌতূহল ও উত্তেজনার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের ভিতরেই প্লেনগুলি একটা স্থানে এসে গেল এবং সেই স্থানের উপর চক্রাকারে ঘুরতে আরম্ভ করে দিল! নীচ থেকে তীব্র শব্দ করে কতকগুলি আগুনের বল প্লেনগুলির পাশ দিয়ে ছুটে যেতে লাগল। এবার বুঝা গেল—এগুলি জার্ম্মান বিমান মারা কামানের অভ্যর্থনা। সহর থেকে দু মাইল দূরে একটা জঙ্গল—সেই জঙ্গলের ধারে প্লেন থেকে ঝুপঝাপ করে প্যারাসুট নিয়ে সৈন্যরা লাফিয়ে

পড়ছিল। চার পাঁচ খানা প্লেন থেকে প্যারাস্যুটধারীরা লাফিয়ে পড়বার পর নীচের জার্ম্মান সৈন্যরা বুঝতে পারল—রুশ বিমানগুলি বোমা ফেলতে আসে নাই, প্যারাস্যুট-সৈন্য নামাতে এসেছে। রাইফেল ও মেশিনগান নিয়ে জঙ্গলের দিকে রক্ষী সৈন্যদল ছুটে গেল। খানিক দূর যেয়েই প্যারাস্যুট লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। যারা এতক্ষণ জঙ্গলের ধারে নেমে পড়ছিল তারা তখন গুলি ছুঁড়ে তার উত্তর দিচ্ছিল। সবগুলি প্লেনের প্যারাস্যুটধারীরা যখন নেমে পড়ল তখন যারা যেখানে পড়েছিল সেই অনুসারে সুবিধামত পাঁচ সাতটি দলে ভাগ হয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

জঙ্গলের ও-পারেই রুশদের কয়েকখানি গ্রাম—গ্রামগুলিও জার্ম্মানদের কবলে। গ্রামবাসীরা দিনে কোন রকমে চুপ করে জার্ম্মান রক্ষীদের কথা মেনে চলে কিন্তু রাত হলেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঢোকে গিয়ে জঙ্গলে—সেখানে ছোট ছোট দলে তারা সকলে মিলিত হয়—মিলিত হয়ে সকলে পরামর্শ করে—এরা হল রাশিয়ার গোরিলা। শত্রুর লাইনের পিছনেই এদের কাজ।

প্যারাস্যুটধারীরা এসে মিলিত হল এই গোরিলাদের সঙ্গে—সোনায় সোহাগা। হাতের মুঠোয় শক্ত করে হাতিয়ার ধরে তারা কাণ খাড়া করে রইল। পনর-বিশ মিনিট কেটে যেতেই আরম্ভ হল—রুশের কামান গর্জ্জন। রুশ সেনাপতি প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছেন সহরের সম্মুখে, বনজঙ্গল কাঁপিয়ে যে গোলাগুলি আসছে এ তারই সঙ্কেত। এবার এরা যদি এদের কাজ ঠিক মত করতে পারে, তবে এক ঘণ্টার মধ্যেই সহরটি দখল হয়ে যাবে। উত্তেজনায় আনন্দে আতঙ্কে সেই শীতের রাতেও এদের কপাল ঘেমে উঠল।

সাদা জামায় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা, বরফের সঙ্গে দেহ মিশিয়ে এরা চলল। একটি দুটি—দশ পনরটি—ষাট সত্তরটি—দু'শ আড়াইশ। দু'টি রাস্তার সংযোগ স্থল আর বেশী দূরে নয়। জার্ম্মান রক্ষীদলের আট দশ জন সৈন্য রাইফেল উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা কিছুই এপর্য্যন্ত টের পায় নাই। টের পাবার কোন সুযোগও এরা দেয় নাই। হঠাৎ কতকগুলি হাত বোমা ছুটে এল—একবার

শব্দ হল একটুখানি—তারপরই সব নিস্তব্ধ একজন রক্ষীও বেঁচে নেই। টেলিফোনের তার আগেই কাটা হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ পেট্রলের একটা ট্যাঙ্কে আগুন জ্বলে উঠল—ডিনামাইটে রাস্তার বার তের ফুট উড়ে গেল—লরীগুলিকে কে যেন আগুনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে দেখা গেল—পাশের গুদামের ছাদে আগুন জ্বলছে। এবার জার্ম্মান সৈন্যের একটি দল এগিয়ে এল—কোথা থেকে রাইফেলের গুলি আসছে, কে হাত বোমা ফেলছে কিছু বোঝবার উপায় নাই—সৈন্যেরা আহত হতে লাগল দলে দলে। মিছামিছি সাইরেন আর্ত্তনাদ করে উঠল—গোলন্দাজরা ছুটে বিমান মারা কামানের কাছে গেল—যারা গেল তারা দেখল কামানগুলি ঘোরানো যাচ্ছে না—কলকব্জা কে যেন ভেঙে দিয়েছে।

সামনে কামানের গর্জ্জন বেড়ে চলেছে—রুশ সৈন্য এগিয়ে আসছে। পিছনের লঙ্কাকাণ্ডও ক্রমেই বাড়ছে। হাত বোমার ঘায়ে ট্যাঙ্কগুলি অচল হচ্ছে, মটরের ষ্টীয়ারিং হুইল জখম—ফোন ক'রে কারও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অস্ত্রাগারে আবার প্রবল একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

আড়াল ছেড়ে এবার প্যারাস্থটধারীরা প্রকাশ্যে এল। ছোট ছোট ফিল্ডগান সাজিয়ে এরা গোলাবর্ষণ করতে লাগল—জার্ম্মান সৈন্যের সম্মুখে পশ্চাতে অগ্নিবর্ষণ। ছুটে পিছু হটবার উপায় নাই—রাইফেলের অব্যর্থ লক্ষ্য কাউকে বাদ দিচ্ছে না।

সহর অধিকার সম্পন্ন হল। সেনাপতি প্যারাস্থট-বাহিনীর নেতার সঙ্গে করমর্দ্দন করলেন। গোরিলারা গ্রামে ফিরে গেল জার্ম্মান রক্ষীদের খোঁজে।

এইটি একদিনের ছোট একটি ঘটনা। দিনের পর দিন এই রকম যে কত ঘটনা ঘটেছিল তার সংখ্যা নাই।

বিমান-ঘাঁটি

বিমান-বাহিনী সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে বটে কিন্তু একটা দরকারী কথা এপর্য্যন্ত বলা হয়নি। বিমান-যুদ্ধে বা বিমান-বাহিনীর প্রয়োজনের দিক দিয়ে বিমান-ঘাঁটির স্থান কারও নীচে নয়। একটা দেশের কয়েকটা বিমান-ঘাঁটি

দখলে আনতে পারলে সেই দেশ অধিকারের অনেক খানি কাজ এগিয়ে গেল। বিমান-ঘাঁটিগুলি যদি শত্রুর অধিকারে থাকে তবে দেশ জয়ের কোন মূল্যই থাকে না। আধুনিক যুদ্ধে সেইজন্য ভাল বিমান ঘাঁটি অধিকার করবার জন্য একপক্ষ যেমন প্রাণপণে আক্রমণ চালায় অন্য পক্ষ তেমনি মরিয়া হয়ে বাধা দেয়।

প্রত্যেক জাতিরই যে নিজ নিজ এলাকায় ভাল বিমান-ঘাঁটি থাকবে একথা



নরম মাটিতে বিমান-ঘাঁটি তৈরী হচ্ছে

না বল্লেও চলে। কিন্তু শত্রুর দেশে গিয়ে যখন জমির পর জমি ক্রমশঃ দখল করা হতে থাকে তখন উপযুক্ত বিমান-ঘাঁটি তৈরী করা অবশ্যই গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। পরাজিত শত্রু যখন পিছু হটতে আরম্ভ করে তখন যাবার পথে যুদ্ধের দিক দিয়ে যার একটুও প্রয়োজন আছে সে সমস্তই নষ্ট করতে করতে যায়। সব কিছু নষ্ট করবার সময় না পেলেও বিমান-ঘাঁটিটি সে নষ্ট করে যাবেই— যাতে শত্রু এসেই বিমান-ঘাঁটিটিকে তাদের কাজে ব্যবহার করতে না পারে।

এইজন্যই বিজয়ী সৈন্যের সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য হয়, তাড়াতাড়ি বিমান-ঘাঁটি তৈরী করে নেওয়া।

দুই চার ঘণ্টার মধ্যে বিমান-ঘাঁটি অন্ততঃপক্ষে বিমান অবতরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিতে না পারলে শত্রু এসে পাল্টা আক্রমণ করতে পারে।

বিমান-ঘাঁটিতে প্রথমেই চাই বিমান অবতরণের জন্য বেশ খানিকটা খোলা মাঠ। এই মাঠের মাটি বেশ শক্ত না হ'লে ভারী ভারী বিমানগুলি কিছুতেই স্বচ্ছন্দে উঠানামা করতে পারে না। এরকম ক্ষেত্রে অর্থাৎ নরম মাটিতে বিমান-ঘাঁটি তৈরী করতে হ'লে মাটির উপর একটা লোহার খাঁজ-কাটা পাত বিছিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

আত্মরক্ষা

আক্রমণের বিভিন্ন প্রথা সম্বন্ধে কিছু ধারণা হ'লে যে প্রশ্ন প্রথমেই মনে আসে তা হচ্ছে এই যে এর প্রতিকারের উপায় কি? আক্রমণের যেমন নূতন নূতন রীতির প্রচলন হচ্ছে তার হাত থেকে বাঁচবারও ঠিক তেমনিই নূতন নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। এই সব আক্রমণ প্রতিরোধের উপায়গুলিকে দুই পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্য্যায়ে পড়ে সেই সব ব্যবস্থা যা নাকি ধাপ্পা দিয়ে শত্রুকে দূরে রাখার জন্য অবলম্বন করা হয়। এ ছাড়া ধাপ্পায় না ভুলে শত্রু যদি সত্য-সত্যই আক্রমণ চালায় তবে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার অথবা তার অগ্রগতি বন্ধ করবার জন্য যে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে সে গুলিকে ফেলা হয় দ্বিতীয় পর্য্যায়ে।

ধাপ্পা বা কামোফ্লেজ

প্রথমে ধরা যাক শত্রুকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই ধাপ্পা দেওয়ার রকম অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে হবে ভিন্ন ভিন্ন। কেননা লক্ষ্য বস্তুর আকার, আয়তন, বৈশিষ্ট্য, আক্রমণের সম্ভাবনা ও তীব্রতার উপরই নির্ভর করে সব কিছু। সুতরাং দরকার মত ব্যবস্থা না করলে চলবে কেন? কয়েকটা

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের উদাহরণ নিয়ে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। প্রথমেই দেখা যাক্ কোন একটা বিমান-ঘাঁটির উপর শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা কতটুকু এবং এ ক্ষেত্রে শত্রুকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্যই বা কি করা যায়। শত্রুপক্ষ প্রথম সুযোগেই উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবে সেই সব বিমান-ঘাঁটি—যাতে করে আকাশ-বাহিনীর সব চাইতে বড় জিনিস বিমানপোত, যা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ঘাঁটিতে মজুদ রয়েছে, তা নষ্ট হবে; বৈমানিকদের রসদপত্র, যন্ত্রপাতি



বিমান লুকিয়ে রাখা হয়েছে

প্রভৃতি অব্যবহার্য্য হবে আর তাদের সমস্ত ব্যবস্থা যাবে একদম ওলট পালট হয়ে। আকাশ থেকে বিমান-ঘাঁটির ঘরবাড়ীগুলি ও প্রকাণ্ড মাঠ,—যার দরকার বিমান উঠাবার বা নামাবার জন্য—বিপক্ষ বৈমানিক স্পষ্ট দেখতে পাবেন, সুতরাং

শত্রুকে ধাপ্পা দিতে হলে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে এই সবগুলি আকাশচারী শত্রুর নজরে না পড়ে।

শুধু বিমান-ঘাঁটি কেন—যেখানে বড় বড় দালান কোটা রয়েছে সেখানটা শত্রুর নজর পড়বে আগে। তাই দালানের ছাদ এমনভাবে ভিন্ন ভিন্ন রং দিয়ে রাঙিয়ে দেওয়া হয় যাতে উপর থেকে দেখলে সারবন্দী দালান মনে হবে না—মনে হবে এবরো থেবরো ঘরবাড়ী আর তার মধ্যে মাঠ। যাতে মাঠ দেখতে পেয়ে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে শত্রু বৈমানিক কোন ধারণা করতে না পারে,

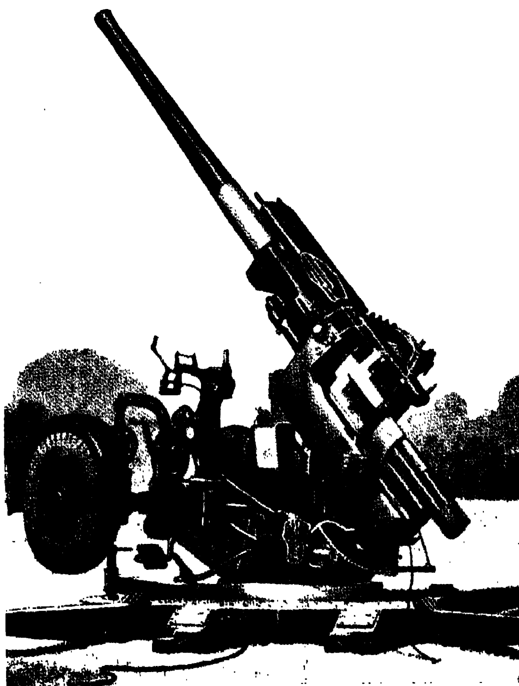


বিমান ঘাঁটির মাঠ—রাস্তা আর গাছ কিন্তু আঁকা

সেইজন্য বালি আর আলকাতরা দিয়ে মাঠের বুকে নকল রাস্তা, আর সবুজ রঙ দিয়ে আশে পাশে গাছ এঁকে রাখা হয়। বিমান-ঘাঁটির প্রকাণ্ড মাঠ এইজন্যই আকাশ থেকে দেখায় এক একটা ছোট ছোট গ্রামের মত।

বিমান আক্রমণের ভয়াবহতা সম্বন্ধে অনেক কিছু আমরা জানতে পেরেছি, এবং একথাও বেশ বুঝতে পেরেছি যে জলবাহিনী ও স্থলবাহিনী নিরস্ত্র নাগরিকগণের উপর নির্ব্বিচারে কোন আক্রমণ না চালালেও, আকাশ-বাহিনীর হাতে

নরনারীর নিস্তার নেই। আকাশ-বাহিনীর এই বর্ব্বর ও ব্যাপক আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য আবিষ্কার হয়েছে বিমান-বিধ্বংসী কামান। এই কামান-গুলি অনায়াসে প্রতি মিনিটে আটটি করে ছাপ্পান্ন পাউণ্ডের গোলা ছুঁড়তে পারে এবং আটাশ পাউণ্ডের গোলা ব্যবহার করলে চল্লিশ হাজার ফুট পর্য্যন্ত হ'তে



বিমানধ্বংসী কামান

পারে তার পাল্লা। বিমান আক্রমণ হয় সাধারণতঃ অতর্কিতে। তাই বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলো যাতে এক আধ মিনিটের মধ্যে স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া যায়—তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত যত রকম কামান আবিষ্কার করা হয়েছে বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তার কোনটাই এই কামানগুলোর কাছে

দাঁড়াতে পারে না। বিমান যত নিখুঁতই হোক, এর পাল্লায় পড়লে আর তার নিস্তার নাই।

বিমানগুলো অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি, আগে থেকে বিমানবিধ্বংসী কামানে গুলি ছুঁড়বার ব্যবস্থা না রাখলে তাদের ঘায়েল করা কোন রকমেই সম্ভব হবে না। গুলি ছুঁড়বার আগেই বিমানগুলো যাবে পালিয়ে। আজকাল বিমানবিধ্বংসী কামানের কাছাকাছিই থাকে একরকম শব্দগ্রাহী যন্ত্র—যাতে করে বহুদূরে থাকতেই আক্রমণকারী বিমানের শব্দ ধরা যায়, এবং বুঝতে পারা যায় তার গতিবেগ।

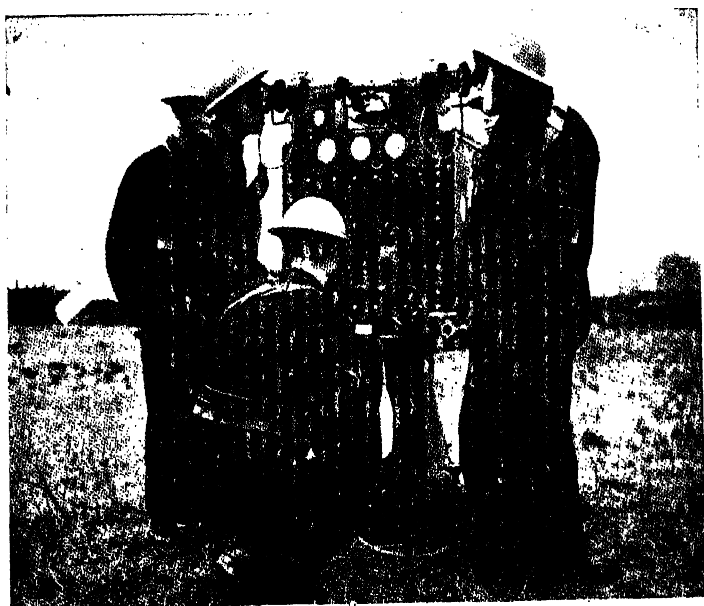


শব্দগ্রাহী যন্ত্র

এগুলি যেন বিমানবিধ্বংসী কামানের কান। কানের কাজ শেষ হলেই আরম্ভ হয় চোখের কাজ। বিমানবিধ্বংসী কামানের এই চোখগুলির ইংরাজী নাম প্রেডিক্টার (Predictor), বাংলায় আমরা বলতে পারি "গণকযন্ত্র"। গণনা করাই এদের কাজ। একবার যদি শত্রু বিমানের দিকে এই গণকযন্ত্র ফিরিয়ে বিমানের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে যন্ত্র থেকে অতি সহজে এবং নিখুঁত ভাবে জানা যাবে—কতটা উঁচু দিয়ে, কোন দিকে, শত্রু বিমান, কত জোরে অগ্রসর হচ্ছে এবং ঠিক কোন দিকে কতটা কোণ করে গুলি ছুঁড়লে বিমানের গায়ে

লাগবে। ঠিক এই মুহূর্তে বিমানখানি কোথায় আছে—এর হিসাব না দিয়ে গণকযন্ত্র বলে দেয় গুলি করবার মুহূর্তে শত্রু বিমানখানি কোথায় থাকতে পারে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে শত্রু-বিমান এই গণকযন্ত্রকে ফাঁকি দেবার জন্য আঁকাবাঁকা পথে উড়ে আসে, কিন্তু বোমা ফেলবার সময় স্থির হয়ে না দাঁড়ালে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার তাদের ষোল আনা সম্ভাবনা। এইজন্যই সবসময়ই

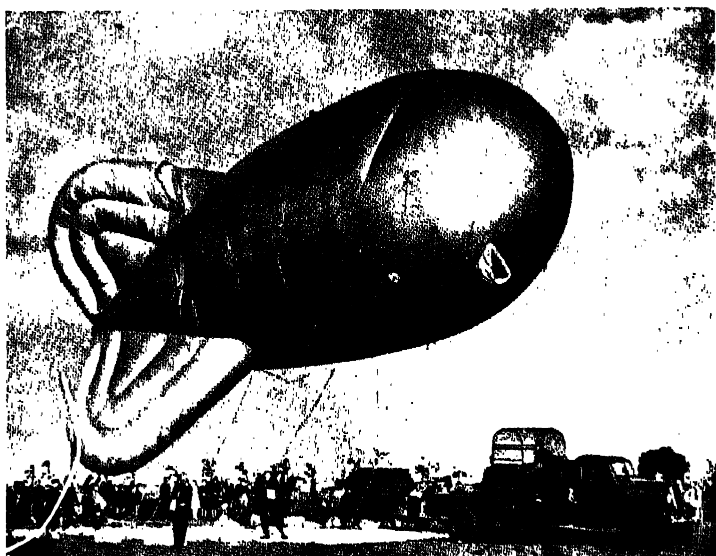


প্রেডিক্টার বা গণকযন্ত্র

তাদের নিতে হয় খানিকটা করে ঝুঁকি আর বিমানবিধ্বংসী কামানগুলির হয় একটু সুবিধা।

গণকযন্ত্রের প্রথম ব্যবহার হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধে, এবং আজকাল এগুলি চালাতে দরকার হয় দশজন লোকের। প্রতি আটটি বিমানবিধ্বংসী কামানের সঙ্গে এক জোড়া করে গণকযন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

জলে, স্থলে মাইন পেতে রেখে শত্রুকে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা যে করা হয় সে কথা সকলেই জানে। আকাশে এমন কিছু কি করা যায় না—যা ঠিক জল মাইনের কি স্থল মাইনের মত আকাশ মাইনের কাজ করবে? আত্মরক্ষার জন্য ব্রিটেন এমনিতর আকাশ মাইন আবিষ্কার করেছে যার নাম দিয়েছে বেলুন ব্যারেজ (Palloon Barrage)। অনেকগুলি বেলুন প্রচণ্ড



বেলুন ব্যারেজ

বিস্ফোরক পূর্ণ করে উঁচু নীচু বিভিন্ন স্তরে বিমান আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হতে পারে—এমনি জায়গায় ছড়িয়ে রাখা যায়।

ঠিক কতটা উপরে বেলুন রাখলে সুবিধা হবে সেটা প্রথমেই অনুমান করে নিয়ে এইগুলিকে সরু তার দিয়ে মাটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। দশ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উঁচুতে অনেক সময় বেলুন বাঁধা হয়। দিনের আলোতে বিমান চালক অবশ্য বেলুন স্পষ্ট দেখতে পান, কিন্তু পান না—যে তারের সঙ্গে সেগুলি বাঁধা

থাকে সেইগুলিকে—আর লক্ষ্য বস্তুটিকে। তাই বিমানের ডানায় বেঁধে এগুলো যে কোন মুহূর্ত্তে যেতে পারে খুলে—আর বিমানের ঘটতে পারে ভয়ঙ্কর বিপদ। বেলুন ব্যারেজের অবস্থান দেখলে শত্রু বৈমানিক সকল সময়েই চেষ্টা করেন উপর দিয়ে উড়ে যাবার—এতে তাদের একদিকে বোমা নিক্ষেপ করাই কঠিন—আর অন্যদিকে বিমানবিধ্বংসী কামানগুলি চালানোর হয় সুবিধা কারণ শত্রু যতটা উপরে থাকবে এই কামানের গুলি হবে ততটা অব্যর্থ।

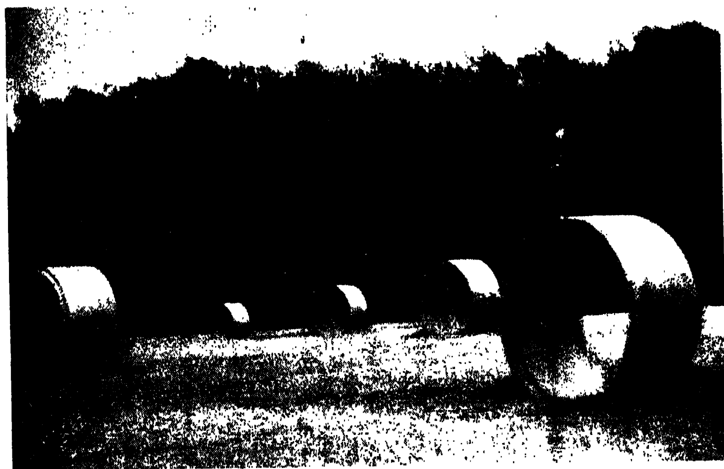
রাত্রির আকাশে চতুর্দ্দিক যখন থাকবে আঁধারে ঢাকা, তখন যাতে গোপনে শত্রু এসে অলক্ষ্যে তার আক্রমণ চালাতে না পারে এর জন্যও ব্যবস্থার ক্রটি করা হয় না। যখন শত্রু সত্যসত্যই এসে পড়ে তখন চারিদিকে সার্চ্চলাইট বা সন্ধানী আলোক ফেলে রাত্রির আকাশকে করে দেওয়া হয় দিনের মত আলোকোজ্জ্বল। এই সন্ধানী আলোগুলি ইলেকট্রিক্ আর্ক (electric arc) এর সাহায্যে জ্বলে এবং এক একটা প্রায় আশী কোটি মোমবাতির সমান উজ্জ্বল হয়। এই আলোক রেখাকে ফাঁকি দিয়ে কে আসবে শত্রুপুরীর সিংহদ্বারে ?

কিন্তু সব রকম ব্যবস্থা সত্ত্বেও শত্রু যদি সত্যসত্যই এসে নামতে চেষ্টা করে বিমানযোগে, তবে কি হবে—তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন বিমান যদি মাটিতে নামতে চায়, তবে তার দরকার অন্ততঃ দুই শত ফুট টানা মাঠ। এ না হলে বিমান মাটিতে কোন রকমেই নামতে পারে না। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—সেখানে এক বিমান-ঘাঁটি ছাড়া দুশো ফুট খোলা জায়গা কোথাও রাখা হয় নাই—সব জায়গাতেই আবশ্যক মত তোলা হয়েছে কংক্রীটের থাম—উদ্দেশ্য যে এই সব বাধা ডিঙ্গিয়ে শত্রু বিমান যদি সৈন্য নিয়ে আসেই, তবুও তাদের ইংলণ্ডে নামা সম্ভব হবে না।

আকাশ-বাহিনী যখন নাগরিকগণের উপর বেপরোয়া বোমা বৃষ্টি করে, তখন এই নাগরিকেরা আত্মরক্ষার জন্য ছুটে যায় শেলটারগুলিতে এবং শত্রু যখন তার আক্রমণ শেষ করে দেশে ফেরে তখন সঙ্কেতধ্বনি পেয়ে তারা বাইরে যে যার নিত্যকার কাজে আত্মনিয়োগ করে। নাগরিকগণের বিমান আক্রমণ

প্রতিরোধের যে ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হয়েছে সে সম্বন্ধে দু চারটি কথা বলা যাক।

যুধ্যমান দেশগুলিতে বিমান আক্রমণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নিত্যকারের কথা; দিন নাই, রাত নাই লোকজন সব রয়েছে সদাসন্ত্রস্ত—এই বুঝি বাঁশী বেজে উঠল। তাদের আত্মরক্ষায় সচেতন করবার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখবার



খোলা যায়গায় কংক্রীটের বাধা—যেন এয়ারোপ্লেন নামতে না পারে

জন্য বাঁশী বাজিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম দিকে লোকজন কেউই এতে অভ্যস্ত থাকে না, কাজে কাজেই তাড়াহুড়া করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবার প্রচুর সম্ভাবনা। অনেকে আবার কৌতূহল দমন করতে না পেরে বাইরে এসে দাঁড়ায়; শেলটারে ঢুকলে তো আর মজা দেখা হবে না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু যখন তখন এমনি আক্রমণ একেবারে গা-সহা হয়ে দাঁড়ায়, তখন লোকে শেল্টারে ঢোকে সত্যসত্যই। অযথা ব্যস্ততা, অহেতুক ভয়, এসবও যে দেখা যায় না তা নয়—কিন্তু বিশৃঙ্খলা আর বড় একটা দেখা যায় না।

ইংলণ্ডের উপর জার্মান বিমান-আক্রমণের সময় সাধারণ নাগরিকেরা কি ভাবে

কি করে তার একটা চিত্র এখানে দেওয়া যেতে পারে। নাগরিকগণের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কত সুন্দর হয়ে গড়ে উঠেছে তা বেশ বুঝা যেতে পারে এই থেকে যে অনবরত প্রচণ্ড বিমান-আক্রমণ সত্ত্বেও লণ্ডনের মত কর্ম্মব্যস্ত ও ঘন বসতি সম্পন্ন সহরে হতাহতের সংখ্যা এমন ভয়াবহ কিছু হয় নাই। সুতরাং ইংলণ্ডের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা কি ভাবে কার্য্যকরী হয় সে কথা আলোচনা করা যাক।

স্বেচ্ছাসেবক

ইংলণ্ডে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যে ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছে তার জন্য দায়ী জনসাধারণের সাহস, কর্ত্তব্যবোধ আর সেবাপ্রবৃত্তি। প্রথমেই এই কথাটা উল্লেখ করা দরকার যে এই সব স্বেচ্ছাসেবকরা কেউ বা ব্যবসায়ী, কেউ বা চাকুরীজীবী, কেউ বা আবার পরিচারক মাত্র। দেশের উপর যখনই শত্রু বিমানের আনাগোনা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল, যখনই বুঝা গেল শত্রু নিরীহ নাগরিকগণের উপরও প্রচণ্ড আক্রমণ চালাবে,—এমন সম্ভাবনা আছে, তখনই অতি সাধারণ লোক পর্য্যন্ত এগিয়ে এ'ল বিপদের দিনে তার প্রতিবেশীকে সাহায্য ক'রতে। এর জন্য ইংলণ্ডে কোন আইনও পাশ ক'রতে হয় নাই বা কর্ত্তৃপক্ষের দিক থেকে কোন চাপও ইংরাজজনসাধারণের উপর দেওয়া হয় নাই। স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে অনুসন্ধান ক'রে জানা গেছে যে প্রতি একশ' জন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে সাঁইত্রিশ জন এসেছেন নিছক সেবাপ্রবৃত্তির বশে, আর ঊনত্রিশ জন এসেছেন স্বেচ্ছাসেবক হওয়া কর্ত্তব্য মনে ক'রে। এটা ঠিক কিন্তু দেশপ্রেম নয়—এই সব লোক যদি অন্য দেশেও থাকতেন তবুও তাঁরা এ কাজ করতেন আনন্দের সঙ্গেই। নিছক দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এ কাজ বরণ ক'রে নিয়েছেন মাত্র পনের জন; একটা নূতন কিছু শিখতে পারা যাবে ব'লে ছয় জন, আর অন্য কিছু ক'রবার নাই ব'লে এ কাজ ক'রতে এসেছেন শতকরা পাঁচজন মাত্র। এ ছাড়া ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রতে এদিকে তৎপর হ'য়েছেন শতকরা দু'জন, উপরওয়ালার চাপে এসেছেন শতকরা একজন মাত্র।

এই সব স্বেচ্ছাসেবকদের নানা রকম কাজই ক'রতে হয়। হাতিয়ার হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব সৈনিক যুদ্ধ ক'রে এরা কিছু তাদের চাইতে কম কাজ করে না—যদিও এদের কাজের সত্যিকারের মূল্য দেওয়ার সময় যুদ্ধের সময় আসে না। যারা যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলি কামান বন্দুকের শব্দের মধ্যে এগিয়ে যায়, তাদের থাকে একটা উন্মাদনা, তারা যেমন প্রাণ দেয় তেমনই প্রাণ তারা নিতেও পারে—অন্ততঃ সে চেষ্টা তারা করে; কিন্তু এই সব নাগরিক স্বেচ্ছাসেবককে শুধু ব্যস্ত থাকতে হয় আত্মরক্ষায়, আক্রমণ ক'রবার তাদের কোন সুযোগ থাকে না। তাই এদের কাজ স্বভাবতঃই হ'য়ে পড়ে একেবারেই উন্মাদনাবিহীন—অতি সাধারণ। দিন নেই, রাত নেই যখন তখন এই ধরণের কাজ যোগ্যতার সঙ্গে ক'রে যাওয়া কত কষ্টকর এবং এতে কতটা ধৈর্য্যের দরকার একটু ভাবলেই তা বেশ বোঝা যায়।

বিমান-আক্রমণের প্রাথমিক সঙ্কেত

অনেক আগে থাকতেই যাতে ভবিষ্যৎ বিমান-আক্রমণের সম্ভাবনা লোকজনকে জানিয়ে দেওয়া যায়, সেজন্য বিধিমত চেষ্টা করার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। 'অবজারভার কোর' (Observer Corps) বা নিরীক্ষণ-বাহিনী শব্দগ্রাহী যন্ত্রের সাহায্যে অনেক আগেই বুঝতে পারে শত্রু বিমান আসছে কিনা—এবং এলেও কোন্ দিক্ থেকে, কত জোরে, কোন্ দিকে এগুচ্ছে। তাদের কাজ এই সংবাদ সংগ্রহ করা—এবং শত্রুবিমানের আগমন সংবাদ যথাসময়ে পাবার জন্যই চব্বিশ ঘণ্টাই তারা তৈরী হয়ে র'য়েছে। এরা সবাই পুরাদস্তুর সৈনিক অর্থাৎ সৈন্য বাহিনীতে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত, বাহিনীভুক্ত লোক—স্বেচ্ছাসেবক নয়। সমুদ্রতীরে, পাহাড়ের উঁচু চূড়ায়, ছোট ছোট কুটীরে এরা নিজ নিজ যন্ত্র নিয়ে অষ্টপ্রহর ব'সে আছে। ঝড়-বাদল, রোদ-বৃষ্টি, আলো-আঁধার কোন কিছুতেই তারা তাদের ঘাঁটি ছাড়বে না—কেননা শত্রু কখন আসবে এবং কোন্ দিক থেকে আসবে তার কিছুরই তো ঠিক নাই! শত্রুবিমান হয়তো উত্তর পশ্চিম দিক্ থেকে আসছে, শব্দগ্রাহী যন্ত্রে সংবাদ পেয়েই নিরীক্ষণ-মঞ্চ থেকে একজন কর্ত্তৃপক্ষের কাছে

টেলিফোন ক'রল, "উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে শত্রুবিমান এগিয়ে আসছে।" তারপরই হয়ত আর এক মঞ্চ থেকে ফের সংবাদ এ'ল—"উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে শত্রু বিমান এগিয়ে আসছে।" তারপরই আর একজন—আরও একজন—এমনি ক'রে হ'য়ত দু' মিনিটের মধ্যেই অনেকগুলি মঞ্চ থেকে সংবাদ এসে গেল—"শত্রু আসছে।" এই কর্ত্তৃপক্ষ হচ্ছেন 'ফাইটার কম্যাণ্ড' (Fighter Command) এবং এঁরা হ'চ্ছেন ব'লতে গেলে সমস্ত আকাশ-বাহিনীর মাথা। নিরীক্ষণ-মঞ্চ থেকে ফাইটার কম্যাণ্ডের দপ্তরে সংবাদ পৌঁছুতে দু'এক মিনিটের বেশী সময় লাগে না কিন্তু। ক্ষিপ্রগতিতে যে আক্রমণ চলে সে আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রতে দরকার হয় ক্ষিপ্রতর আয়োজন—তাই সময় নষ্ট করা সম্ভব নয় কোন মতেই।

ফাইটার কম্যাণ্ডের দপ্তরে একটা ঘরে থাকে অনেক রকম মানচিত্র ছড়ান। দূরে শত্রুবিমানের আগমন সংবাদ জানতে পারলে তৎক্ষণাৎ এই ম্যাপ-ঘরে সে সংবাদ পাঠান হয় এবং সেখানে বিস্তৃত ম্যাপের উপর নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই সব সংবাদগুলি নিশানের সাহায্যে এঁকে রাখা হয়। এই ম্যাপ-ঘরে র'য়েছে প্রত্যেকখানা জঙ্গী বিমান ও বিমান-ধ্বংসী কামানের অবস্থানের ম্যাপ। কোন জঙ্গী বিমানখানা কখন কোথায়, কি অবস্থায় আছে তা জানতে যাতে একটুও অসুবিধা বা দেরী না হয় সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। কারণ শত্রুবিমান আসছে এই সংবাদ পাবামাত্রই ফাইটার কম্যাণ্ড থেকে আদেশ জারী করা হয় জঙ্গী বিমান ও বিমান-ধ্বংসী কামানগুলির উপর। শত্রু দেশের সীমানার মধ্যে পৌঁছবার পূর্ব্বেই জঙ্গী বিমানগুলি উড়ে যেয়ে তাকে আক্রমণ ক'রে পরাস্ত ক'রতে পারলে, শেষ পর্য্যন্ত হয়ত শত্রুপক্ষের বোমারুগুলো ফিরে যেতে বাধ্য হবে। ফাইটার কম্যাণ্ডই বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলির উপরও হুকুম জারী করে—কখন তাদের শত্রুর উপর ক'রতে হবে গোলাবৃষ্টি।

নাগরিকগণকে সতর্ক করা হবে কি না এটা ঠিক করবার ভারও এই ফাইটার কম্যাণ্ডের উপর। একটা বাঁশী আওয়াজ ক'রে যখন তখন সাধারণ নাগরিকদের

নিত্য নৈমিত্তিক কাজ-কারবার বন্ধ ক'রে দেওয়া কিছু সহজ নয়—সুবিধাও নয় তাই সহসা কারণে অকারণে সঙ্কেতধ্বনি করা হয় না। ফাইটার কম্যাণ্ড যখনই বুঝতে পারে যে জঙ্গী বিমানের সঙ্গে লড়াই হ'লেও শত্রুর বোমারু বিমান-গুলির পক্ষে দেশের মধ্যে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা আছে—সে সম্ভাবনা যত কমই হোক না কেন—তখনই তারা নাগরিকগণকে সতর্ক ক'রে দেবার ব্যবস্থা করে।

কি ভাবে নাগরিকগণকে সতর্ক করা হয় এবারে তাই বলি। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে শত্রু আসছে—এ কথাটা আগে জানতে পারলেও শত্রুর লক্ষ্যবস্তু কি হবে সেটা কিন্তু আগে জানা সম্ভব নয়। তাই ফাইটার কম্যাণ্ডকে প্রথম দিকে একটু অনুমানের উপর নির্ভর ক'রতে হয়ই। 'শত্রু আসতে পারে তোমরা প্রস্তুত থাক', এ সংবাদটা ব্যাপকভাবে সব কর্ম্মকেন্দ্রেই জানিয়ে দেওয়া হয়। এই সংবাদটা একেবারেই প্রাথমিক, এবং ঠিক নাগরিকগণের জন্য নয়। যারা আক্রমণের সময় স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করে, আর গভর্ণমেণ্টের কয়েক বিশেষ বিভাগ—যথা পুলিশ, দমকল, হাসপাতাল ইত্যাদি—এক কথায় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যাদের ছোট বড় কোন না কোন কাজ ক'রতে হয়—তাদেরই জন্য দেওয়া হয় এই সংবাদ। ফাইটার কম্যাণ্ড সংবাদ দেন পাঠিয়ে জেনারেল পোষ্ট আফিসে, এবং সেখান থেকে টেলিফোনযোগে এই সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয় পুলিশের বড়-কর্ত্তার দপ্তরে আর বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের কেন্দ্রীয় আফিসে। এই সময়ে পথে যেখানে আলো দিয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হয় সেখানে একটা ক'রে হ'লদে রংএর আলো জ্ব'লে ওঠে। স্বেচ্ছাসেবকরা এই হ'লদে আলো দেখতে পেলেই বুঝতে পারে অচিরেই বিমান-আক্রমণ ঘটবার সম্ভাবনা আছে এবং নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে যেয়ে কর্ত্তব্যপালন ক'রবার জন্য তারা তৈরী হয়।

পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষ জেনারেল পোষ্ট অফিস থেকে সতর্কতা-সূচক সংবাদ পাবামাত্রই সে খবর নিজেদের অধীনস্থ ঘাঁটিগুলিতে আর দমকলের অফিসে পাঠিয়ে দেন। এই সব পুলিশ ঘাঁটিগুলিতে আছে 'সাইরেন' বা বাঁশী।

সত্যিকারের বিমান-আক্রমণের সময় দমকলগুলির কাজ ভয়ানক কঠিন হ'য়ে প'ড়তে পারে। এক একখানা বোমারু বিমানে কম-সে কম হাজার আগুনে বোমা থাকতে পারে এবং শত্রু যদি সেগুলি যেমন তেমন ভাবেও ছড়িয়ে যায় তা হ'লে এক সঙ্গেই অন্ততঃ হাজার জায়গায় আগুন লেগে যেতে পারে। যদি কুড়িখানা বিমানের একটা বহর এসে আক্রমণ চালায় তবে তো কুড়ি হাজার জায়গায় একসঙ্গে আগুন ছড়িয়ে যাবে। সে যে কী ভীষণ লঙ্কাকাণ্ড তা কল্পনা করা নিশ্চয়ই কঠিন নয়। হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে একখানা বোমারু যদি চলতি পথে 'আগুনে বোমা' ছড়িয়ে যেতে থাকে, তবে একশ' গজ পর পর কম পক্ষে চার শ' ফুট বিস্তৃত জায়গায় অন্ততঃ দশ পনেরটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠ্‌তে পারে। এই জন্যই এক একখানা দমকল অনেক জায়গার উপর নজর রাখে।

এ. আর. পি. অফিস

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের কেন্দ্রীয় অফিসকে সংক্ষেপে বলা হয় 'এ. আর. পি.' অফিস। বিমান-আক্রমণের সময় ক্ষতি যাতে কম হয়, আক্রমণ-শেষে ধ্বংসস্তূপ যাতে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে ফেলা যায়, হতাহতগণের চিকিৎসায় যাতে কোন বিলম্ব না হয়, নাগরিকগণ যাতে ঠিক সময় মত এসে শেলটারগুলিতে আশ্রয় নিতে পারে, আর অযথা ভয়ে যাতে কেউ কোন বিশৃঙ্খলা ঘটাতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখাই হচ্ছে 'এ. আর. পি.' স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ।

বিপদের প্রাথমিক সঙ্কেত পাওয়ার পর এই 'এ. আর. পি.' অফিসে কি ধারায় কাজ চ'লতে থাকে তার একটা সুন্দর ছবি এখানে দেওয়া যেতে পারে। অফিসের কর্ত্তা যেই "সাজ-সাজ" সঙ্কেত পেলেন অমনি বোতাম টিপে নিজের অধীনস্থ লোকদের সে কথা দিলেন জানিয়ে। বোতাম টিপতেই সমস্ত বাড়ীখানার প্রত্যেকটার ঘরে ঘণ্টা বেজে উঠল—যারা ব'সে ছিল তারা দাঁড়িয়ে পড়ল, যারা ঘুমিয়ে ছিল তারা বিছানা ছেড়ে তড়াক্ ক'রে উঠে দাঁড়াল—একটা মিনিট দেরী

না ক'রে যে যার নির্দ্দিষ্ট কাজে লেগে গেল। যারা পথের লোকজন, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ক'রবে তারা এসে যে যার স্থানে স্থির হ'য়ে দাঁড়াল—যারা আক্রমণের সময় হতাহতের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কাজের ভার পেয়েছে তারা গাড়ীতে চেপে ব'সল ছুটে বেরুবার জন্য তৈরী হয়ে। অফিসের কণ্ট্রোল ঘরে (যে ঘর থেকে সমস্ত কাজ করা হয় তাকে বলা যেতে পারে কণ্ট্রোল ঘর) থাকে অনেকগুলি টেলিফোন। ঘণ্টা বাজতেই টেলিফোনগুলিতে এসে একে একে কর্ম্মীরা সব ব'সে গেল। এই সব টেলিফোনের কোনটা বা সহরের জল সরবরাহের, কোনটা বিদ্যুৎ সরবরাহের, কোনটা গ্যাসের, কোনটা আবার টেলিফোন লাইনে কর্ম্মীদের সমস্ত খবর দেওয়া-নেওয়ার কাজ করে। এক একটা বিভাগের এক একটা টেলিফোন। প্রত্যেক মিনিটে সহরের নানা অংশ থেকে প্রত্যেক বিভাগের লোক তাদের পক্ষে জরুরী খবর কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠাচ্ছে—আর দরকার মত সেখান থেকে যাচ্ছে তাদের উপর যত কিছু উপদেশ, নির্দ্দেশ। টেলিফোনে যারা কাজ ক'রছে তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকে একটা ক'রে খোলা নোট বুক। জরুরী খবর পেলেই তারা সেটা এই নোট বুকে লিখে তখন তখনই সেটা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর কাছে পাঠাবে এবং সেটা দেখে তিনি তখনই তাঁরে আদেশ লিখে দিবেন। এই সব লেখা-লেখির ব্যাপারে কিন্তু সময় নষ্ট করা হয় না মোটেই। এই কণ্ট্রোল ঘরে সব বিভাগের প্রতিনিধিই র'য়েছেন, এবং টেলিফোন যোগে যে যার আপন বিভাগের লোকজনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ক'রে চ'লছেন।

আত্মরক্ষার সব কিছু ব্যবস্থা ওলট পালট ক'রে শত্রু যখন হানা দেবেই—তা সে দিনের আলোতেই হ'ক অথবা রাতের অন্ধকারেই হ'ক—তখন নিরস্ত্র নাগরিকগণ কোথায় দাঁড়াবে একটু আশ্রয়ের জন্য? বোমার আঘাতে তারা যতটা না মরবে তার অনেক বেশী মরবে তারা ইট, পাথর, লোহা-লক্করের নীচে চাপা প'ড়ে। বোমার ঘায়ে বাড়ী যখন ভাঙ্গবে, বাড়ীর মালিককে চাপা দিতে এতদিনের বাড়ী এতটুকুও কসুর ক'রবে না। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ক'রতে এ প্রশ্নটাকে একেবারে তুচ্ছ করা যায় না। পয়সা যাদের আছে তারা

নিজ নিজ বাড়ীতে মাটির নীচে অথবা উপরেই নীচু করে কংক্রীটের ঘর গেঁথে তোলে ; উদ্দেশ্য—বিমান-আক্রমণ যখন হ'বে তখন তা'রা এই সব ঘরে আশ্রয় নেবে। যাদের পয়সা নেই তাদের জন্যে গভর্ণমেণ্ট পল্লীতে পল্লীতে এই ধরণের অনেক ঘর ক'রে দেন। এই সব ঘরের উপরে চাপান হয় বালির বস্তা আর মাটির তাল। বর্ত্তমান যুদ্ধে লণ্ডনে এমনিতর যে সব ঘর তৈয়ারী হয়েছে তা'দের বলা



শেলটারের প্রবেশ-পথ

হয় 'এণ্ডারসন শেলটারস্' (Anderson Shelters)। বাংলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর সার জন এণ্ডারসন যখন ছিলেন ইংলণ্ডের দেশরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, তখনই তিনি এই সকল আশ্রয়-স্থল নির্ম্মাণের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করেন। তাই তাঁর নামেই করা হয়েছে এইগুলির নামকরণ। সমস্ত দেশের লোককে একটা বা দু'টো আশ্রয়স্থলে আশ্রয় দেবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। তাতে সুবিধার চাইতে অসুবিধাই হবে অনেক বেশী। তাই পল্লীতে পল্লীতে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ঘর তৈয়ারী করা হ'য়েছে—যতটা সম্ভব বোমা ও গ্যাস-প্রতিরোধক করে।

এখানে কিন্তু সবাই চুপচাপ ব'সে থাকে না, কেননা সে রকমটা হ'লে লোকের মনের ভয় বেড়ে যাবে আর বিমান-আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য সফল হবে। শেলটারগুলি এখন এমনভাবে পরিকল্পিত যে যদি শেলটার না ব'লে একে ক্লাব-হাউস বলা যায় তবুও অন্যায় কিছু হবে না। এগুলির মধ্যে রাখা হয় পানীয় জল,



শেলটারের ভিতরের দৃশ্য

গরম চা, কফি, গরম দুধ, আর থাকে বেতার যন্ত্র, গ্রামোফোন, ঘরে ব'সে খেলা চলে এমনিতর অনেক রকম খেলার সরঞ্জাম, বইপত্র, নানারকম খবরের কাগজ, মাসিক পত্রিকা এই সব। দিনে রাতে কখন যে আক্রমণ হবে তার তো কিছু ঠিক নেই—কাজেই সব রকম টুকিটাকি দরকারী জিনিস এখানে না থাকলে চ'লবে কেন! তাছাড়া সব রকম বয়সের লোকই এসে এই সব শেলটারে আশ্রয় নিতে পারে আর হাজার রকম হ'তে পারে তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ।

অবশ্য এই সব নানা বয়সের ভিন্ন ভিন্ন রকম রুচির লোকের বিভিন্ন মত অনুযায়ী। হাজার রকম ব্যবস্থা করা কিন্তু সম্ভব নয়, তবুও যতটা পারা যায় তার ব্যবস্থা ক'রতে হবে বই কি! যে সব শেলটারে শুধু ছেলেরা আশ্রয় নেয়,—অন্ততঃপক্ষে যে সব জায়গায় ছেলে মেয়েরাই হয় সংখ্যায় বেশী—সে সব জায়গায় আরও একটু মজাদার ব্যবস্থা রাখার চেষ্টা করা হ'য়েছে। এই সব শেলটারে সাধারণতঃ 'মিকিমাউস' জাতীয় ছবিগুলি ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে দেখান হ'য়ে থাকে। এতে ছেলেরা প্রচুর আনন্দ পায় আর কোন রকম দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদের কথা তাদের মনে আসে না।

এই সব আশ্রয়স্থানে এলে সবাই সমান। প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল সাহেব একবার একটা শেলটারে ঢুকেছিলেন বিমান-আক্রমণের সময়। তাঁর মুখে ছিল একটা জলন্ত সিগার, কিন্তু শেলটারের মধ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ—চার্চ্চিল সাহেবের এই কথাটা স্মরণ ছিল না ব'লেই তিনি সিগার মুখে দিয়ে শেলটারে ঢুকেছিলেন। শেলটারে ঢুকতেই একজন লোক চার্চ্চিল সাহেবকে ব'লে ব'সল, "No cigar, Mr. Churchill." প্রধান মন্ত্রী একটু হেসে সিগারটি বালির বস্তার মধ্যে চেপে নিবিয়ে দিলেন আর সহাস্য বদনে ব'ললেন, "Thank you, sir. How do you feel ?" ভদ্রলোকটি বেশ সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিলেন, "O. K. Quite comfortable," এখানে এসে সাধারণ লোকের পর্য্যন্ত হাস্য পরিহাস বন্ধ হয় নাই! সম্প্রতি আবার এমন ব্যবস্থা করা হ'য়েছে যে আশ্রয়প্রার্থী নরনারীরা দরকার মত এই সব শেলটারে ঘুমাতেও পারবে।

প্রাথমিক সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় উদ্যোগপর্ব্ব। তারপর শত্রু যদি সত্য সত্যই এসে পড়ে তখনই আরম্ভ হয় সত্যিকারের কাজ। যদি শত্রু না আসে তবে বেশ খানিকটা সময় অপেক্ষা ক'রে এই সব স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ফিরে যায় যে যার কাজে। শত্রু এলে যে ভাবে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয় এবারে তারই একটা বিবরণ দিচ্ছি।

যখন শত্রুবিমান সহর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে এসেছে—বোঝা যায়, তখন

ফাইটার কম্যাণ্ড থেকে পাঠান হয় দ্বিতীয় সঙ্কেত। লাল আলো জ্বেলে সর্ব্বত্র এই আক্রমণ-সঙ্কেত জানান হয়। পুলিশঘাঁটির লোকেরা সংবাদ পাওয়া মাত্রই 'সাইরেন' বা বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করে এবং বাঁশীর শব্দে সমস্ত সহর হ'য়ে উঠে সচকিত ও সজাগ। শত্রুবিমানের আগমন-সংবাদ পাবা মাত্রই বেজে উঠে কলকারখানা, ষ্টীমার, জাহাজ ইত্যাদির বাঁশী—যাতে ক'রে দেশের সব লোকই এগুলো শুনতে পায়। এজন্য স্থানে স্থানে বিশেষ ক'রে পুলিশ ঘাঁটিগুলিতে ও অন্যান্য দূরবর্ত্তী স্থানে দরকার মত আলাদা বাঁশীও বসান হ'য়েছে। বাঁশীর আওয়াজ পেলেই লোকে ছোটে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে এই জনমণ্ডলীকে পথ দেখায়। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, নার্স আর দমকলের লোকেরাও তেমনিই যে যার গাড়ীতে চেপে তৈরী হয় পথে বেরিয়ে পড়বার জন্য।

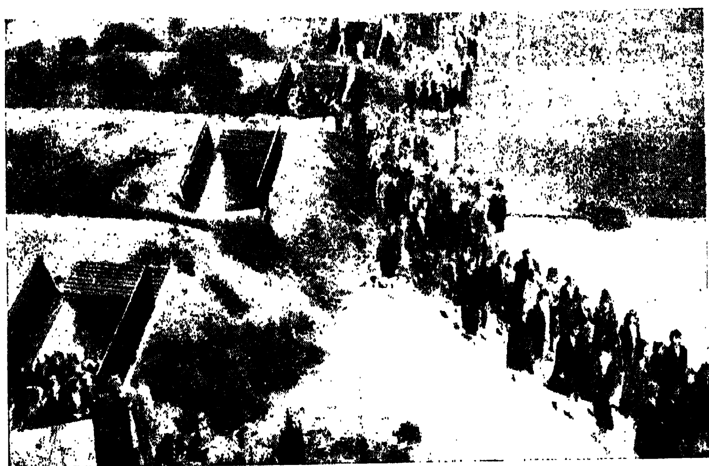
জঙ্গী বিমানগুলি আগেই আকাশে উঠে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ ক'রেছে—এদিকে বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলি ও তাদের সঙ্গের গণকযন্ত্রগুলিও একেবারে তৈরী। ফাইটার কম্যাণ্ড যেইমাত্র হুকুম দেবে—'গুলি ছোঁড়', অমনি আরম্ভ হবে কামান দাগা, তার পর চ'লতে থাকবে সহরের মাথার উপর একটা ভীষণ যুদ্ধ।

শেষ পর্য্যন্ত যদি শত্রুপক্ষ বোমা ফেলে ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ ক'রে দিয়ে যায়, তখন এই 'এ. আর. পি.র' কাজ আরম্ভ হয়। এক হাতে তাদের ধ্বংসস্তূপ সরাতে হ'বে অন্য হাতে যে সব হতভাগ্য নরনারী শত্রুর বোমার ঘায়ে আহত হবে তাদের ক'রতে হবে চিকিৎসার ব্যবস্থা। এ যে কত কঠিন কাজ তা ব'লে বোঝান যায় না। পথের উপর ধ্বংসস্তূপ প'ড়ে গাড়ী ঘোড়া চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেলে, না হবে লোকের দৈনন্দিন কাজ কারবার চালান, না যাবে কারও চিকিৎসা বা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা—তার উপর যদি শত্রুর আগুনে বোমার ঘায়ে স্থানে স্থানে আগুন জ্ব'লে ওঠে, তবে তো সোনায় সোহাগা!

যখন দলে দলে লোক এই সব শেলটারে ঢোকে বা বের হয়, তখন যাতে

তাদের মধ্যে অবাঞ্ছিত তাড়াহুড়ো না ঘটে এজন্য ইংলণ্ডে আবালবৃদ্ধবণিতাকে দেওয়া হ'য়েছে বিশেষ রকম শিক্ষা—তার ফলে কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ না ক'রলেও দেশের প্রত্যেকটি নরনারী যন্ত্রের মত এগুলিতে ঢোকে অথবা বের হয়—কখনও কোন গোলমাল হয় না।

আক্রমণ শেষ করে শত্রু যখন পালিয়ে যায় বা আক্রমণ না ক'রেই বিদায় নেয়—এক কথায় যখন বোঝা যায় শত্রু আর কাছে ভিতে নাই—তখন

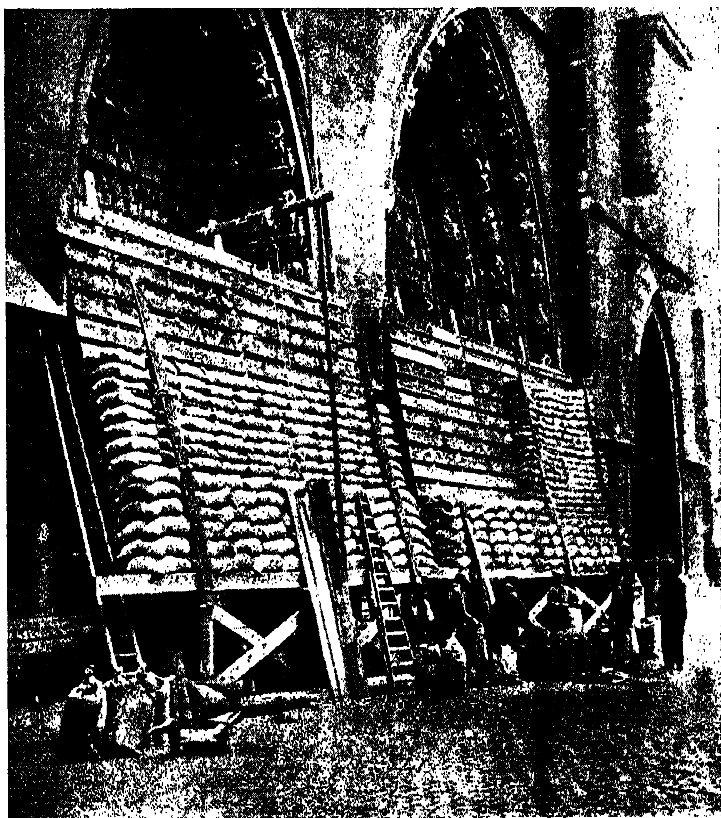


All clear হ'য়ে গেলে বাইরে আসছে

ফাইটার কম্যাণ্ডের নির্দ্দেশে ফের বাঁশী বেজে ওঠে আর 'এ. আর. পি.'র লোকেরা ছুটে বেরিয়ে পড়ে পথে। তাদের কাজ শেষ হ'লে তারপর শেষ বাঁশী বাজে একটানা অনেকক্ষণ ধ'রে। এই শব্দকে বলা হয় 'অল ক্লিয়ার' (All Clear)। এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হ'য়ে যায় নাগরিকগণের শেলটার-বাস—আরম্ভ হয় নিত্যকারের কাজ।

শেলটারে ঢুকে নিজের জীবন বাঁচান যায়, কিন্তু বাড়ীঘর দালান কোঠা কিছু সেখানে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়া যায় না। শত্রুর বোমার আঘাত খাওয়ার জন্য

তৈরী হ'য়েই এই সব ঘরবাড়ীগুলিকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। শত্রুপক্ষ বেপরোয়া বোমা ছুঁড়লে অবশ্য এগুলিকে বাঁচান যায় না, কিন্তু তবু ক্ষতি অনেকটা কমিয়ে দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে দালানের ছাদে, দরজা জানালা এই



বোমার টুকরো ফেরাবার জন্য বালির বস্তা সাজানো হয়েছে

সবের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় বালির বস্তার প্রাচীর। এই বালির বস্তা দিয়ে সব বাড়ীঘরই কতকটা রক্ষা করা সম্ভব হ'য়েছে।

আক্রমণের বিভিন্নতা অনুসারে আত্মরক্ষার পদ্ধতিরও বৈচিত্র্য বাড়বে। যুদ্ধে মানুষ মরে, বাড়ীঘর ভাঙ্গে, উর্ব্বর দেশ মরুভূমি হয়। একথা ভুলে গেলে চ'লবে না যে আত্মরক্ষা এই নির্ব্বিচার ধ্বংস বন্ধ করার জন্য নয়—এ শুধু মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে এড়িয়ে যাবার একটা চেষ্টা। মানুষ মরণকে বা পরাজয়কে সহজে স্বীকার করতে চায় না, বিপদ যত বড়ই হোক তা দেখে সে মুষড়ে যায় না—মানুষের এই আত্মরক্ষার কৌশলের মধ্যে আমরা পরিচয় পাই মানুষের বাঁচবার সেই আদিম আকাঙ্ক্ষার আর তার উদ্ভাবনী শক্তির। মানুষের সেই রকম একটি সাফল্যমণ্ডিত প্রচেষ্টার কথা বলেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থার কথা শেষ করব।

রেডিও লোকেটার বা রেডার

আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে যত প্রকার উপায় বা যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে "রেডার" (RADAR)। ইংরাজীতে Radar কথাটি হচ্ছে 'radio detection and ranging' শব্দগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ। এই জটিল যন্ত্রটির সাহায্য নিয়ে বৃটেন ও আমেরিকা যে কেবল আত্মরক্ষা করেছে তাই নয়, আক্রমণাত্মক যুদ্ধেও এর সুন্দর ব্যবহার করেছে।

কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা শুনেছিলাম যে দূর থেকে বিমানের গতিবিধি জানবার একটা নূতন ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে। যন্ত্রটির নাম হচ্ছে 'রেডিও লোকেটার' (Radio Locator)। ইংরেজ বেতার বিশারদ ওয়াট্‌সন্ ওয়াট্ এর আবিষ্কর্ত্তা। যন্ত্রটি নাকি বিশেষ রকম জটিল এবং এর কার্য্যধারাও গোপনীয়। সেদিন মাত্র এইটুকু জানা গিয়েছিল যে এর সাহায্য নিয়ে ইংলণ্ড জার্ম্মানীর বিমান-আক্রমণে শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

যন্ত্রটির মূলসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। ধাতব পদার্থ মাত্রেই ক্ষুদ্রতম বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত করতে পারে একথা অবশ্য বহু দিন আগে থেকেই বিজ্ঞানীদের জানা ছিল। বলতে গেলে ধাতুর এই মৌলিক গুণের সাহায্য

নিয়েই তৈরী করা হয়েছে রেডিও লোকেটার। প্রথমতঃ এতে থাকে একটা বিশেষ ভাবে তৈরী বেতার তরঙ্গ-প্রেরক যন্ত্র। তার সাহায্যে এক ঝলক অতি ক্ষুদ্র কতকগুলি বেতার তরঙ্গ ছেড়ে দেওয়া হয় খোলা আকাশে। বেতারের যা চিরন্তন ধর্ম্ম পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়া, তা এই তরঙ্গগুলি ছড়িয়ে পড়ে এবং বিমানের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে যথা সময়ে সে তরঙ্গগুলি আবার অন্যদিকে ছড়িয়ে যায়। এই প্রতিফলিত তরঙ্গগুলিকে ধরবার জন্য দেশময় ছড়িয়ে রাখা হয় গ্রাহক যন্ত্র। গ্রাহকযন্ত্রে যখন প্রতিফলিত তরঙ্গগুলি এসে লাগে তখনই বোঝা যায় কাছাকাছি কোথাও বিমান আছে।

প্রেরক যন্ত্র থেকে হাজার হাজার ছোট ছোট বেতার তরঙ্গের ঝাঁক উপর দিকে এবং সোজাসুজি সমুদ্রের অপর পারে চালান করা হয় এবং সারা দেশময় ছড়িয়ে থাকে হাজার হাজার গ্রাহক যন্ত্র। শত্রু বিমান যেমন এগুতে থাকে অমনি প্রতিফলিত বেতার তরঙ্গগুলি এসে একটার পর একটা গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়তে থাকে এবং এ থেকে শত্রু বিমানের গতিপথ ও গতিবেগ আর উচ্চতা সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করা যায়।

যুদ্ধ যত দিন চলছিল ততদিন আমাদের এইটুকুই জানা ছিল। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। যন্ত্রটির আসল পুরো নাম হচ্ছে "রেডিও ডিটেক্শন এ্যাণ্ড রেঞ্জিং" সংক্ষেপে 'রেডার'। বিমান বা জাহাজ বা অন্য কিছু যত দূরেই থাকুক না কেন, দিনে রাত্রে, কুয়াশায়, মেঘে বা ঝড়বৃষ্টির মধ্যে সব অবস্থাতেই তাকে বোঁঝা যায়। সমুদ্রের তলায় কোথায় ডুবো জাহাজ লুকিয়ে আছে তাও বেশ বোঝা যায়, জলের নীচে কোথায় পাহাড় আছে তাও এ যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায়। ভবিষ্যতে এ যন্ত্র সব দেশই ব্যবহার করবে এ কথা নিশ্চয় এবং সেদিন আর 'ট্রেন কলিশন' হবে না।

পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা যদি শব্দ করি তবে সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিধ্বনি ছুটে আসে, 'রেডার' হচ্ছে সেই রকম শব্দ করে তার প্রতিধ্বনি ধরবার যন্ত্র। একটা রবারের বল যদি শক্ত মাটিতে ফেলা যায় তবে মাটিতে পড়েই বলটা

আবার ধাক্কা খেয়ে ছুটে আসে। যন্ত্র থেকে বেতার তরঙ্গ ছাড়া হোলো, সেগুলি ছুটে যায় আলোর যে গতিবেগ সেই বেগে এবং বিমান বা জাহাজ যা কিছু রয়েছে চারদিকে তাদের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আবার তেমনি বেগেই ছুটে আসে। প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল হোলো এর গতিবেগ। সুতরাং তরঙ্গ প্রেরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল শত্রু দূরে নিকটে কোথাও আছে কিনা। বৃটেন ও আমেরিকার প্রতিটি বিমানে ও প্রতিটি জাহাজে এই যন্ত্র বসানো আছে, সেইজন্য প্রতিফলিত তরঙ্গ থেকে কে শত্রু বা কে মিত্র তা বুঝতে পারা যায়।

১৯৪০ সালের যে বিমান-আক্রমণ ইংলণ্ডের উপর হয়েছিল তাতে এই যন্ত্রের সাহায্য নিয়েই অল্প সংখ্যক বৃটিশ জঙ্গী বহুগুণ জার্ম্মান বিমানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহসী হয়েছিল। জার্ম্মানী থেকে উড়ে বা ফ্রান্সের বিমান ঘাঁটি থেকে উঠে কত বিমান, কয়টি ঝাঁক ইংলণ্ডের কোন দিকে আসছে তা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারা যেত এবং যে দিকে আক্রমণ চলবে সেইদিকে জঙ্গীগুলিকে কর্তৃপক্ষ পাঠিয়ে দিতেন। একটা আক্রমণ চলছে এমন সময় অন্য জায়গায় আবার একটা নূতন আক্রমণ আরম্ভ করলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকে বড়ই বিশৃঙ্খল করে দেওয়া যায়। সব খবরই পূর্ব্বেই পাওয়া যেত এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থাও পূর্ব্বেই করা হত বলে ইংলণ্ডের রক্ষা ব্যবস্থা শেষ পর্য্যন্ত অটুট রয়ে গেল।

'রেডার' বৃটিশের আবিষ্কার কিন্তু আমেরিকা এর সাহায্য নিয়েই তার পানামা খাল ও সুবৃহৎ উপকূল ভাগ রক্ষার ব্যবস্থা করে। আমেরিকা ও বৃটেন এই দুই দেশেই এই যন্ত্র হাজার হাজার তৈরী করা হয় ও এই দুই দেশের জাহাজে, বিমানে ও অন্যান্য বহু স্থানে এই যন্ত্র বসানো হয়। চালকহীন প্লেন, উড়ন্ত বোমা ও রকেট বোমার ব্যাপক প্রয়োগ করে জার্ম্মানী প্রকাণ্ড বিভীষিকার সৃষ্টি করে কিন্তু এই 'রেডারের' সাহায্যে এদের গতি কোন দিকে তাও বোঝা গিয়েছিল।

আকাশ যুদ্ধ

ব্যাট্‌ল্‌ অব্‌ বৃটেন বা বৃটেনের যুদ্ধ

১৯৪০ সালের জুন মাস! ফরাসী জাতির সমস্ত রক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিরোধের ক্ষমতা চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। বিজয়ী জার্ম্মানদের অগ্রগতিতে বাধা দেবার আর কেউ নেই। ইটালী স্থযোগ বুঝে জার্ম্মানীর সাথে যোগ দিয়েছে। ফ্রান্সের পতনে বৃটেন তার একমাত্র বন্ধু হারাল আর ইটালী যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে জার্ম্মানীর নূতন মিত্র লাভ হ'ল। নরওয়ের উপকূল থেকে আরম্ভ করে ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত সমস্তটা ভূখণ্ড জার্ম্মানীর দখলে—একটু লবণাক্ত জলের ফালি, তার পরপারেই ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড। সমুদ্রের ব্যবধান কতখানি—২৫ মাইলেরও কম—স্থানে স্থানে অবশ্য দু'শ, আড়াইশ' মাইল। বিমানের বেগ যেখানে মিনিটে পাঁচ মাইল, সেখানে এই দূরত্বটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। এইবার জার্ম্মানীর কাছে বৃটেন নতজানু হবে—আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার আর কোনও উপায় থাকবে না।

কিন্তু বৃটেন আত্মসমর্পণ করলো না। বৃটিশ জন সাধারণের স্বাধীনতা রক্ষার যে সঙ্কল্প তাকেই প্রকাশ করলেন চার্চিল—বৃটিশ আত্মসমর্পণ করবে না। যুদ্ধ করবে, যত দিন লাগুক, ক্ষয় ক্ষতি যতই হোক, তারা যুদ্ধ চালাবে। লণ্ডন এবং অন্যান্য নগর যদি ভস্মস্তূপেও পরিণত হয় তবু বৃটিশ জাতি আত্মসমর্পণ করবে না।

সেদিন জার্ম্মানী বৃটিশের এই আচরণ অশোভন দম্ভ বলেই মনে করেছিল। সমস্ত ইউরোপ যে শক্তির পদতলে লুটিয়ে পড়লো মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যেই, একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ সেই মহাশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায় কী স্পর্দ্ধায়! স্থতরাং বৃটেন যখন স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করল না তখন তাকে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করা হবে!

শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করতে হ'লে তার দেশ অধিকার করা দরকার। শত্রু রইল সমুদ্রের ওপারে আর এপার থেকে লম্ফ ঝম্প করলেই তো আর শত্রু

পরাজিত হবে না। সুতরাং প্রয়োজন ইংলণ্ড আক্রমণ ও ইংলণ্ড অধিকার। কিন্তু আক্রমণ কি করে করা যাবে? সমুদ্রের উপর দিয়ে মার্চ করে যাওয়ার উপায় নাই। বিরাট নৌবহর সাজিয়ে ইংলণ্ডের বন্দরে বন্দরে এসে জার্ম্মান সৈন্য



বিমানের পাহারায় লরী বোঝাই সৈন্য নিয়ে চলেছে জার্ম্মানী
ইংলিশ চ্যানেলের পারে

নেমে পড়তে পারে, এত বড় নৌবহর জার্ম্মানীর নাই। বৃটেনের নৌবহরকে অকেজো করে দিতে না পারলে বৃটেনের কাছাকাছি সমুদ্রে জার্ম্মান রণতরী দিয়ে জলপথে আক্রমণ করবার অন্তরায় বৃটিশ নৌবহর ও জঙ্গী বিমান। আবার প্যারাসুটে ক'রে স্থানে স্থানে সৈন্য নামিয়ে বা সৈন্যবাহী প্লেনে বা গ্লাইডারে হাজার

হাজার সৈন্য ঝড়বৃষ্টি অন্ধকার ও কুয়াশার সময় বৃটেনের কোন কোন স্থানে নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু যদি বৃটিশ জঙ্গী বিমানের বল অটুট থাকে তবে কোন প্রকার আক্রমণেই সাফল্য আসবে না।

বাধা যতই থাকুক, জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষ পশ্চাৎপদ হলেন না। আর কেনই বা তাঁরা পশ্চাদপদ হবেন? ইউরোপের কোন স্থানেই তো জার্ম্মান সৈন্যের আক্রমণে বাধা কেউ দিতে পারে নাই আর সামান্য একটুকরা সমুদ্রের আড়ালে বৃটেন অপরাজেয় থেকে যাবে আর জার্ম্মানীর বিশ্বজয়ের প্রথম প্রচেষ্টায়ই বাধা পড়বে এ কথা হিটলার কল্পনাও করতে পারেন না।

এই রকম চিন্তা করে জার্ম্মানী বৃটেন-জয়ের পরিকল্পনা করেছিল। বৃটিশকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করতে হলে আগে দরকার তার বিমান-বল চূর্ণ করা। গোয়েরিং আশ্বাস দিলেন কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি প্রাথমিক কাজটি শেষ করে দিতে পারবেন। জার্ম্মান বিমান-বাহিনীর আর কোন কাজ নাই—ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হয়েছে—বৃটেনের উপর আক্রমণের জন্য তোড়জোড় আরম্ভ হ'ল। জার্ম্মানীর এই পরিকল্পনায় সামরিক দিক দিয়ে কোন ভুল ছিল না। জার্ম্মান বিমানের সংখ্যা ছিল অন্ততঃ পক্ষে বৃটেনের তিন গুণ—বৃটিশ বিমান-বল একে অল্প, তাতে আবার আফ্রিকার যুদ্ধেও কিছু কিছু বিমান তাকে পাঠাতে হচ্ছিল। সুতরাং জার্ম্মানীর সমগ্র বিমানশক্তি যদি ইংলণ্ডের উপর প্রয়োগ করা হয় তবে জয়ের সম্ভাবনাই ষোল আনা। বিমান-যুদ্ধে অন্যান্য সুবিধাও জার্ম্মানীর বেশী। ফ্রান্সের উপকূল থেকে দশ মিনিটের মধ্যেই জার্ম্মান বিমান ইংলণ্ডে এসে পৌছুতে পারে কিন্তু ইংলণ্ডের বিমানক্ষেত্র থেকে জার্ম্মানী বহু দূর। দূরত্ব কম বলে একই জার্ম্মান বিমান ও একই পাইলট দুবার তিনবার ইংলণ্ডের উপর এসে হানা দিতে পারে কিন্তু বৃটিশ বিমানের পক্ষে তা সম্ভব নয়। বৃটিশ বিমানকে শত্রু দেশের উপর দিয়ে অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হয় (যেতে ও আসতে) এবং এর ফলে তাদের ঘায়েল হবার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

সব চেয়ে বড় কথা যে বৃটেনের অভাব অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে। জার্ম্মানী গত

আট বছর ধরে সব তৈরী করে রেখেছিল—গুলি, গোলা, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন, কামান কোন জিনিসেরই তার অভাব ছিল না। বিমান-যুদ্ধে মন দিয়ে বিমানের উৎকর্ষের দিকেই তার পক্ষে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করার সুবিধা ছিল। কিন্তু যুদ্ধ চালাবার মত সমস্ত জিনিসেরই অভাব ইংলণ্ডে ছিল গুরুতর। গুলি, গোলা, কামান, বন্দুক তার যথেষ্ট নাই—নূতন নূতন সৈন্যদল তৈরী হচ্ছে আর তাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করতে হচ্ছে—জাহাজ ডুবছে আর জাহাজ তৈরী করতে হচ্ছে—সুতরাং সমস্ত মনোযোগ তার পক্ষে মাত্র বিমান-যুদ্ধে প্রয়োগ করা অসম্ভব ছিল। সমস্ত সামরিক শক্তিকে একখানে পুঞ্জীভূত করে জার্ম্মানী আক্রমণ করতে পারে বৃটেনকে কিন্তু বৃটেনের শক্তি আছে চারদিকে ছড়িয়ে, বিক্ষিপ্ত হয়ে। সুতরাং সব দিক দিয়ে জার্ম্মানীর সুবিধা যে ছিল তাতে আর সন্দেহ নাই।

জার্ম্মানী বিমান-আক্রমণ চালাবে একথা বৃটেন অনেক আগেই জানতো এবং তার জন্য প্রস্তুতও সে ছিল। ফ্রান্সের পতনের পর জার্ম্মানী যে তার সমস্ত বিমান-বল নিয়ে ইংলণ্ডের উপর ভেঙে পড়বে এবং এই আক্রমণ যে কেবল ধ্বংস ও ক্ষতি করেই নিরস্ত হবে না, বৃটেনের খাস জমিতে যে জার্ম্মান সৈন্য এসে পড়বে এ আশঙ্কা তার যথেষ্টই ছিল। সুতরাং বিমান-যুদ্ধে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল নিজেদের অল্পসংখ্যক বিমানের বিনিময়ে কত বেশী সংখ্যায় শত্রু বিমান নষ্ট করা যায়। কেবল আত্মরক্ষার নীতি নিয়ে যুদ্ধ করলে যুদ্ধে জয়লাভ হয় না কিন্তু বল যেখানে সমান নয় সেখানে তেড়ে গিয়ে মারতে যাওয়া ভুল বরং দেখতে হয়, মার খেয়েও শত্রুর কতটা বেশী ক্ষতি করা যায়।

জুন মাসের শেষের দিকে জার্ম্মানীর অভিপ্রায় বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। এইবার বোঝা গেল জার্ম্মানীর আক্রমণের উদ্দেশ্য কি? জার্ম্মানী যে বিমান-আক্রমণ দীর্ঘ দিন ধরে চালিয়েছিল তা লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায় বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণের প্রবল বেগ পড়েছিল।

ইংলণ্ডের উপর প্রথম যে আক্রমণ আরম্ভ হ'ল তার লক্ষ্য বৃটিশ বাণিজ্য-তরী। যে সমস্ত জাহাজ বিভিন্ন দেশ থেকে যুদ্ধোপকরণ ও রসদ নিয়ে আসছে

তাদের উপর সংঘবদ্ধ ভাবে স্বরু হ'ল বিমান-আক্রমণ। বাইরের সমুদ্রে সাবমেরিন থেকে টরপিডো ছুঁড়ে এদের মারবার চেষ্টা তো চলছিলই, সাবমেরিনের হাত এড়িয়ে যে সব জাহাজ ইংলণ্ডের উপকূল দিয়ে বৃটিশ বন্দর প্রবেশ করতে আসছিল তাদের উপর এইবার ধারাবাহিক আক্রমণ আরম্ভ হ'ল।

যাকে ঠিক 'ব্যাট্‌ল অব্ বৃটেন' বলা হয় তা আরম্ভ হয় ৮ই আগষ্ট থেকে। শক্তির মত্ততায় সেই দিনই জার্ম্মানী ঘোষণা করে—এইবার বৃটেনের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। ব্যাপক ভাবে বৃটিশ বাণিজ্যতরীর উপর অবিরাম আক্রমণের স্থচনা এই দিন থেকেই। সমস্ত জুলাই মাস ধরে অবশ্য ইংলিশ চ্যানেলের উপর জাহাজ লক্ষ্য করে বোমা ফেলা চলছিল। জুলাই মাসে জার্ম্মানীর বমার খোয়া গেল ২১২ খানা আর এদের সঙ্গে যুদ্ধে বৃটিশ জঙ্গী নষ্ট হ'ল ৪৯ খানা। বোমারু ও জঙ্গীর এই যুদ্ধ সমুদ্রের উপর আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু অনেক সময় যুদ্ধ করতে করতে বিমানগুলি ইংলণ্ডের উপকূল ভাগে এসে পড়ছিল। এর ফলে যে সমস্ত বৃটিশ জঙ্গী বিমান নষ্ট হচ্ছিল সেগুলো থেকে সম্ভব হ'লে পাইলটেরা প্যারাস্থট নিয়ে লাফিয়ে নিজ দেশের উপরই পড়ছিল। বৃটিশ জঙ্গীর যে ক্ষতি হচ্ছিল তা শুধু বিমানের। অনেক ক্ষেত্রেই পাইলটেরা লাফিয়ে পড়ে বেঁচে যাচ্ছিল। জার্ম্মান বোমারুর ক্ষতি হচ্ছিল পুরাপূরি। বিমান ও চালক কেউ রক্ষা পাচ্ছিল না। ইংলিশ চ্যানেলের মধ্যে বিমান ও চালক উভয়েই সলিল সমাধি লাভ করছিল। এই সময় বৃটিশ মটরলঞ্চ দলে দলে ঘুরে বেড়াত ইংলিশ চ্যানেল দিয়ে।

৮ই আগষ্ট বহু বিজ্ঞাপিত আক্রমণ স্বরু হ'ল। জাঙ্কার ডাইভ্‌বমারের স্কোয়াড্রন তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে আসতে লাগল। প্রথম দল এল বেলা ৯টায়। দ্বিতীয় দল ৯৷৷০ টায়, তৃতীয় দল ১১৷৷০ টায়, শেষ দল বিকাল ৪৷৷০ টায়। উপকূল ঘেঁষে সমস্ত কনভয় চলেছে—সেই দলবদ্ধ জাহাজগুলির উপর আরম্ভ হ'ল দলবদ্ধ বিমানের আক্রমণ। প্রথম দিন জার্ম্মান বিমান মারা পড়ল ৬০ খানা, বৃটিশ জঙ্গী ১৬ খানা। তিন দিন পর আবার ৪০০ বিমান নিয়ে আর একটি ছোট কনভয়ের উপর আক্রমণ হ'ল। জাঙ্কার নষ্ট হ'ল ৬৬ খানা, হারিকেন মারা

পড়লো ২৬ খানা। এই রকম করে সমস্ত আগষ্ট মাস ধরে জার্ম্মান বোমারুর বহর ১২ বার আক্রমণ চালায়, ডোভার, টেমসের মোহানা, পোর্টসমাউথ বন্দর এবং কাছাকাছি বিমান-ঘাঁটিগুলি আক্রমণের লক্ষ্য ছিল।

বৃটিশের বাণিজ্য জাহাজগুলি নষ্ট করা ও বন্দরগুলি অকেজো করে দেওয়া এই উদ্দেশ্য নিয়েই আক্রমণের প্রথম পর্ব্ব আরম্ভ হয়। কিন্তু সাতদিন আক্রমণ চালিয়ে গোয়েরিং যখন দেখলেন জার্ম্মানীর ৬৯৭ খানা বিমান নষ্ট হয়েছে ও বৃটিশ



বৃটেনের এক দল ছেলে মেয়ে স্লিট-ট্রেঞ্চ থেকে জার্ম্মান বিমানের কাজ দেখছে
আতঙ্কের মধ্যেও একটা কৌতূহল প্রত্যেকের চোখে মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠছে

জঙ্গী মারা পড়েছে মাত্র ১৫৩ খানা তখন বাধ্য হয়ে তাঁকে আক্রমণের পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করতে হয়। ইংলিশ চ্যানেলের ভিতর দিয়ে জাহাজের কনভয়ও চলতে লাগল আর একটি বন্দরও অকেজো হ'ল না। গোয়েরিং ভেবে স্থির করলেন বৃটিশ জঙ্গী-বিমানগুলিই সব অনর্থের মূল। সুতরাং হারিকেন, স্পিট্‌ফায়ার আর ডিফায়াণ্টগুলিকে যদি শেষ করে দেওয়া যায় তবে বৃটেনের উপর

ও কাছাকাছি সমুদ্রে জার্ম্মান বিমান যথেচ্ছভাবে বিচরণ করতে পারে। সুতরাং ১৫ই আগষ্ট জাহাজ-আক্রমণের পালা শেষ করে জার্ম্মান বিমান-বাহিনী নূতন পরিকল্পনা নিয়ে কা'জ নামল। ১৮ই আগষ্ট বিপুল বিমান-বাহিনী নিয়ে বৃটেনের কতকগুলি বিমান-ঘাঁটি একসঙ্গে আক্রমণ করা হ'ল—ঘাঁটির মধ্যে যে বিমানগুলো আছে সেগুলিকে নষ্ট করা ও বাধা দেবার জন্য যে সব জঙ্গী আসবে তাদের ঘায়েল করা—এই উদ্দেশ্য নিয়ে। দ্বিতীয় পালার কথা বলবার আগে প্রথম পালার ফলাফল কি রকম দেখা যাক।

উভয় পক্ষের ক্ষতির হিসাব

বন্দর ও কনভয় আক্রমণে

	জার্ম্মানীর ক্ষতি	বৃটেনের ক্ষতি	আক্রমণকারী বিমানের আনুমানিক সংখ্যা
৮ই আগষ্ট	৬০	১৬	৩০০
১১ই আগষ্ট	৬৬	২৬	৪০০
১২ই আগষ্ট	৬২	১৩	৪০০
১৩ই আগষ্ট	৭৮	১৩	৫০০
১৫ই আগষ্ট	১৮০	৩২	১০০০

জার্ম্মানীর পক্ষে এই হারে ক্ষতি সহ্য করা সম্ভব হ'ল না—সুতরাং আক্রমণের ধারা বদলানো প্রয়োজন। ১৮ই আগষ্ট ক্রয়ডন, রষ্টার, গস্‌পোর্ট, কেন্‌লি প্রভৃতি সাত আটটি বিমান-ঘাঁটির উপর ছয় সাত শ ডাইভ-বমার দিয়ে সাংঘাতিক আক্রমণ করা হ'ল। বলা বাহুল্য বৃটেনের 'ফাইটার ফোর্স' নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এই পরিকল্পনাটি সামরিক দিক দিয়ে চমৎকার ও নিখুঁত। অনেকগুলি বিমান-ঘাঁটিই সাময়িক ভাবে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ল, আক্রমণ আরম্ভ হ'তেই জঙ্গীগুলি ঘাঁটি পরিত্যাগ করে গেল কিন্তু তারা দূরে সরে গেল না। ডাইভ্-বমার ডাইভ্

করছে কিন্তু তার পিছনে হারিকেনও ডাইভ্ করছে—প্রথম দিন অর্থাৎ ১৮ই আগষ্ট জার্ম্মান বিমান ধ্বংস হ'ল ১৪১টি আর ইংরেজের জঙ্গী গেল মাত্র ১৬ খানা তার মধ্যে ৮ জন পাইলট আবার রক্ষা পেল। জার্ম্মানীর বিশ্বাস ছিল বোমারুগুলি



লণ্ডনের উপর বিমানের যুদ্ধ দেখছে লণ্ডনের পথচারীরা

বিমান-ঘাঁটিতে বোমা ফেলবে আর মেসারসিট প্রভৃতি জঙ্গী বৃটিশ জঙ্গীগুলির সঙ্গে লড়বে—এই আক্রমণের রীতি যদি কিছু দিন চালিয়ে যাওয়া যায় তবে বৃটিশ ফাইটার গুণের দিক দিয়ে যত ভালই হোক না কেন সংখ্যায় যখন জার্ম্মানীর তুলনায় কম তখন একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেই। এই সময়টা বৃটিশ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের বড়ই দুশ্চিন্তায় কেটেছে। জার্ম্মানীর লক্ষ্য কেবল বৃটিশ ফাইটার ধ্বংস করা। বোমারুগুলি বোমা ফেলতে আসে, হারিকেন স্পিট্‌ফায়ার এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করে, হারিকেন স্পিট্‌ফায়ারের উপর আবার আক্রমণ চালায় মেসারমিট জঙ্গী বিমান। এই সময় বৃটিশ বৈমানিকদের দৃঢ়তা ও সাহস বৃটেনকে রক্ষা করেছিল। এই সময়ের কথা উল্লেখ করেই চার্চিল বলেছিলেন—অল্পকয়েকজনের

চেষ্টায় এত অধিক লোকের এতটা কল্যাণ আর কখনও হয় নাই (never was so much owed by so many to so few).

জার্ম্মান আক্রমণের এই দ্বিতীয় পর্ব্ব চলেছিল অনেক দিন ধরে। ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান এসে সমুদ্রের উপর ঘুরতে লাগল ; যেই ফাইটারগুলি এগিয়ে বাধা দিল অমনি বিমানবহর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন লক্ষ্যের দিকে ছুটতে



বিমান-আক্রমণে সব নষ্ট হয়ে যাবার পর বৃটেনে ইঞ্জিনিয়ারগণ নূতন টেলিফোনের তার বসাচ্ছে

লাগল। যে মুহূর্ত্তে ফাইটারগুলি ওদের পিছু নিয়েছে অমনি ওপর থেকে বা মেঘের আড়ালে থেকে বেরিয়ে এল অতর্কিতে জার্ম্মান জঙ্গী বিমানের দল, মেশিনগান ও কামানের শব্দে চারিদিকে হয়ে উঠল মুখর—ধোঁয়ার জাল ও পেট্রলের গন্ধ বাতাসে রেখে তারা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। এই রকম চলতে লাগল দিনের পর দিন। কোন পক্ষেরই বিরাম নাই—কেউ হার মানতে

চায় না। অবশেষে এল ১৫ই সেপ্টেম্বর—গোয়েরিং-এর আজ শেষ চেষ্টা। ৬০০ বমার ও ৬০০ ফাইটার এল ঝঁাকের পর ঝাঁকে—যুগপৎ আক্রমণ করা হ'ল পাশাপাশি কতকগুলি বিমান-ঘাঁটি—আকাশ জুড়ে বাধল প্রচণ্ড যুদ্ধ। শেষে দেখা গেল জার্ম্মানী হারিয়েছে ১৩১ খানা বমার ও ৫৪ খানা ফাইটার। বৃটিশ ফাইটার নষ্ট হ'ল সেদিন মাত্র ২৫ খানা। আক্রমণ যত প্রচণ্ড হয়,



জার্ম্মান বোমার ঘায়ে লণ্ডনের একটি প্রকাণ্ড দেয়াল ভেঙ্গে পড়ছে

জার্ম্মানীর ক্ষতি হয় তত বেশী—কিন্তু বৃটিশ জঙ্গী কেমন করে যেন নিজের ক্ষতিকে এত অল্প করে রাখে। জার্ম্মানী বুঝল—এই পদ্ধতির আক্রমণে ফল হ'ল না—অন্য পথ ধরতে হবে।

কিছু দিন গবেষণায় কাটিয়ে জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করলেন—বাজে জিনিস আক্রমণ না করে একেবারে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মর্ম্মস্থান লণ্ডন আক্রমণ করলেই হয়। ব্যাট্‌ল অব্ বৃটেনের তৃতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হ'ল—ব্যাট্‌ল অব লণ্ডন। বৃটিশ জঙ্গী

বিমানের শক্তি এর মধ্যে অনেকটা নষ্ট করা গেছে—দিনের পর দিন যদি লণ্ডনের উপর আক্রমণ চালানো যায় তবে অচিরেই এই মহানগরী জনশূন্য হয়ে যাবে।

আক্রমণ আরম্ভ হ'ল বিপুল বেগে। ক্ষতি হ'ল জার্ম্মানীর বিস্তর। কিন্তু হোক ক্ষতি, ক্ষতি স্বীকার না করলে কি যুদ্ধে জয় লাভ করা যায়।



রাত্রিতে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের পর দিন সকাল বেলা লণ্ডনের একটি দৃশ্য



বিধ্বস্ত স্থানের তুইটি শিশু—সুস্থ ও অক্ষত দেহ

গোয়েবল্‌স্ দিনের পর দিন ঘোষণা করে চলেছেন—লণ্ডন প্রায় ধ্বংস হয়ে এসেছে—আর তিন চার দিনের মধ্যেই গোটা সহরটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দশ দিন পরে

আবার বললেন—লণ্ডন সহরটা বড় কিনা, তাই সবটা এখনও ধ্বংস করা যায় নাই, তবে আর বেশী অবশিষ্ট নাই। এদিকে জার্ম্মানীর বিমানের ক্ষতি বেড়েই চলল। হঠাৎ একদিন তৃতীয় পালাও শেষ হ'ল। আক্রমণ চলতে লাগল রাত্রে। বোমা পড়তে লাগল যেখানে সেখানে। ঘর বাড়ী বিস্তর ভাঙ্গতে লাগল—লোকজনও কিছু কিছু হতাহত হতে লাগল—কিন্তু লণ্ডন ধ্বংস হওয়ার



বোমা বিধ্বস্ত লণ্ডনে ফলের দোকান

কোন লক্ষণ দেখা গেল না—স্বাভাবিক জীবন যাত্রারও বিশেষ পরিবর্ত্তন হ'ল না। এবার গোয়েরিং বুঝ্‌লেন যে লণ্ডন—ওয়ারস বা রট্যারড্যাম নয়।

লণ্ডনের সাধারণ নরনারী দিনে রাতে যখন তখন এই বিমানআক্রমণের মধ্য দিয়েই তাদের কাজকর্ম্ম করে চলেছে। রাত্রে বাড়ীঘর দোকানপাট ভেঙে চুরে সব এলোমেলো করে দিয়ে গেল—পরদিন সকালে দেখা গেল সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—

ঝকঝকে তক্‌তকে— বিমান-আক্রমণের চিহ্নই নাই। London can take it. এ আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা লণ্ডনের আছে—তা লণ্ডনের নরনারী বালকবালিকা ভাল করেই বুঝিয়ে দিল।

আবার প্ল্যানের পরিবর্ত্তন হ'ল। জার্ম্মানী যখন যা আরম্ভ করে একেবারে তার শেষ না দেখে ছেড়ে দেয় না। পরিকল্পনায় তো কোন ভুল হয় নাই,



ইংলণ্ডের জনবহুল একটি রাস্তা—দুধারে জার্ম্মানী বিমান-হানার নিদর্শন

তবে কেন বৃটিশ জঙ্গী বাহিনীর ধ্বংস হচ্ছে না। এবার লণ্ডন নয়, বিমান-ঘাঁটি নয়, কোনও একটা শিল্পাঞ্চল, কোনও একটা ছোট সহর বা বড় সহরের একটা অংশ লক্ষ্য করে দিনে বা রাতে একসঙ্গে চার পাঁচশ বিমান দিয়ে বোমা বর্ষণ করে একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেওয়া। কভেণ্ট্রির উপর এক রাত্রে অনেক এলোমেলো বোমা পড়ল—লোক মারা গেল অনেক কিন্তু বৃটিশ নরনারীর যুদ্ধেচ্ছা (will to fight) দমন করা গেল না। এই সময় জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করলেন ভারী দল পাঠিয়ে লাভ নাই, বড় বড় দল পাঠালে তারা প্রায়ই লক্ষ্যের কাছে যেতে পারে না।—সেখানে যাবার আগেই বৃটিশ জঙ্গীগুলি তেড়ে এসে আক্রমণ করে। এর মধ্যে জার্ম্মান বিমান খোয়া গেল ২৫০০ হাজারের উপর অথচ বৃটিশ জঙ্গীর

বহর দুর্ব্বল হয়েছে বলে মনে হয় না। সুতরাং আগে যে হারে বিমান নষ্ট হচ্ছিল সেই হারে আর বোমারু নষ্ট করতে জার্ম্মানী রাজী হ'ল না। আবার নূতন ধরণের বম্বিং আরম্ভ হ'ল। দুই ইঞ্জিনের মেসারমিটে হাজার পাউণ্ড বোমা নিয়ে ছোট ছোট দল বৃটেনের নানা স্থানে আসতে লাগল। বোমা ফেলেই তারা



কভেন্ট্রিতে জার্ম্মান বিমানের ধ্বংসলীলা

বৃটিশ জঙ্গীর সঙ্গে আরম্ভ করে দিত যুদ্ধ। ছোট ছোট মেসারমিট ফাইটারও ৫০০ পাউণ্ডের বোমা নিয়ে উৎপাত আরম্ভ করে দিল। বৃটিশ জঙ্গীগুলি যতক্ষণ মেসারমিট বোমা না ফেলছে ততক্ষণ তাড়া দিত—তারপর বোমা ফেলে দিলে নিজেরাই পাশ কাটিয়ে চলে যেত। মেসারমিটগুলি খানিকক্ষণ যুদ্ধং দেহি বলে ঘুরে ফিরে তারপর নিজেদের ঘাঁটিতে চলে যেত। এ কৌশলও জার্ম্মানীর ব্যর্থ হ'ল। তিনমাস দিনে রাতে সব রকম কায়দায় যুদ্ধ চালিয়ে জার্ম্মান বিমানবহর যুদ্ধে ভঙ্গ দিল। বৃটেনকে পরাভূত করা গেল না, জাহাজের চলাচল বন্ধ করা গেল না, জঙ্গীবিমানগুলিকে অকেজো করা করা গেল না—বেপরোয়া বোমা ফেলে সাধারণ নরনারীকে সন্ত্রস্ত করা গেল না। তিনমাসের যুদ্ধে বৃটেনের লোক মারা গেল ১৪,৩৬৩ ; আহত হ'ল ২০,৫০১, হতাহতের মোট সংখ্যা ৩৪,৯৩৪—একটা

বড় রকমের স্থলযুদ্ধে এর চেয়ে বেশী লোক একদিনেই মারা যায়। আর বৃটেনের অবস্থা—Britain is scarred but stands indomitable—ক্ষতি হয়েছে বৃটেনের কিন্তু তবু বৃটেন নির্ভীক ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো।



রেল লাইনের উপর জার্ম্মান বোমা পড়েছে

এই বিমান-যুদ্ধে ও বিমান আক্রমণে বৃটেন যদি হেরে যেত, বৃটিশ বৈমানিকেরা যদি এই কৃতিত্ব দেখাতে না পারত, বৃটিশ নরনারী যদি নির্ভীকভাবে বহুদিন ধরে বিমান-আক্রমণের এই ঝড় সহ্য করতে না পারত, তবে যুদ্ধ ১৯৪০ সালেই



লাইন সঙ্গে সঙ্গেই মেরামত করা হয়েছে।

শেষ হয়ে যেত। রাশিয়া যোগ দিয়েছে এক বছর পরে, আমেরিকা আরও পরে কিন্তু এই সময়—জার্ম্মান ঈগলের ডানার কালো ছায়া যখন সমস্ত পৃথিবীর উপর পড়বে বলে মনে হয়েছিল তখন বৃটেনের সামরিক ও বে-সামরিক নরনারীরা যা করেছে তার তুলনা নাই! ব্যাট্‌ল অব্‌ বৃটেন এই মহাযুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ

সন্ধিক্ষণ এবং ভবিষ্যতের ইতিহাসে এর যথাযোগ্য স্থান থাকবে। ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৪০) মনে হয়েছিল যে বৃটেনে বুঝি প্রলয় সুরু হ'ল কিন্তু এই দিনের কথার উল্লেখ করেই প্রধান মন্ত্রী চার্চিল বলেছিলেন—বৃটিশ সাম্রাজ্য যদি আরও হাজার বছরও বাঁচে তবুও এই সময়টার কথা উল্লেখ করেই ইতিহাস বলবে—"This is their finest hour."

ক্রীটের যুদ্ধ

গ্রীসের ষাট মাইল দূরে ক্রীট একটি দ্বীপ—চারিদিকে সমুদ্র-বেষ্টিত। জার্ম্মানী যখন গ্রীস অধিকার করে নিল তখন গ্রীসের রাজা জর্জ্জ সদল বলে ক্রীটে চলে এলেন। ক্রীটের লোক সংখ্যা সামান্য। এর মধ্যে আবার অনেকেই গ্রীসের সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল। গ্রীসের যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর তারা কেউ কেউ ক্রীটে চলে আসে। সামান্য কিছু নিউজিল্যাণ্ড ও ব্রিটেনের সৈন্য ক্রীটে গোড়া থেকেই ছিল। এই দ্বীপের উপর জার্ম্মানী ২০শে থেকে (১৯৪১) এক অদ্ভুত ধরণের আক্রমণ চালাল।

ক্রীট অধিকারের জন্য যে আক্রমণ তা সমুদ্রপথে হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু আক্রমণ সমুদ্রপথে চলতে পারে না, কারণ সমুদ্রে বৃটিশ নৌবহরের আধিপত্য অক্ষুন্ন। এই আধিপত্য যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ জাহাজে করে সৈন্য নিয়ে ক্রীটে নামানো অসম্ভব। খোলা সমুদ্রের যুদ্ধে বৃটিশ নেভিকে আহ্বান করা অসম্ভব আর বোমা ফেলে নৌবহরকে অকেজো করে দিতে সময় লাগবে, খরচ বেশী হবে, এবং ফলাফলও অনিশ্চিত থেকে যাবে। সুতরাং আক্রমণ করতে হবে ওপর থেকে বিমানযোগে। সমস্ত ক্রীট দ্বীপে বিমান উঠতে ও নামতে পারে এরকম ঘাঁটি ছিল মাত্র তিনটি। প্রথম দিন একদল অতিকায় জার্ম্মান বিমান ঐ তিনটি বিমান-ঘাঁটির উপর বোমা ফেলতে আরম্ভ করে আর বড় বড় গ্লাইডার ও সৈন্য-বাহী বিমান থেকে প্যারাসুট নিয়ে প্রায় দেড় হাজার সৈন্য নীচে লাফিয়ে পড়ে। অনেক সময়

আয়োজন দেখে শত্রুর উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে পারা যায় না। বিমান-বাহিত যে দেড় হাজার সৈন্য প্যারাস্থট নিয়ে নামল তাদের মধ্যে অনেকেই ধরা পড়ল। পরদিন আবার বিমানের দল এল ও প্যারাস্থট নিয়ে প্রায় তিন হাজার সৈন্য ক্রীটের নানাস্থানে নেমে পড়ল। এদের সঙ্গে নীচের সৈন্যদলের হাতাহাতি যুদ্ধ হল। তিন হাজারের মধ্যে আঠারশো হতাহত হল। কিন্তু তার পরদিন এবং তার পর আরও ক'দিন ধরে নূতন নূতন সৈন্য দল আসতে লাগল। সামান্য কিছু অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে এরা প্যারাস্থট নিয়ে লাফিয়ে পড়ল বিমান-ঘাঁটির উপর। কতক ধরা পড়ে, কতক হতাহত হয় কিন্তু সৈন্য আসার বিরাম নাই। জার্ম্মানী এই আক্রমণে প্রায় বারশো সৈন্যবাহী বিমান নিয়োগ করেছিল। এই সমস্ত বিমানের মধ্যে সবগুলি নিরাপদে আসতে পারছিল না। কামানের গোলার ঘায়ে কত বিমান টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোন রকম ক্ষয় ক্ষতির কথা চিন্তা না করে নিত্য নূতন সৈন্য কেবলই আসতে লাগল। ক্রমে ক্রীটে জার্ম্মান সৈন্যের সংখ্যা বেড়ে গেল। দলবদ্ধ হয়ে তারা বিমান-ঘাঁটি আক্রমণ করল এবং সাহস ও সংখ্যার জোরে হাতাহাতি যুদ্ধ করে তারা একটা বিমান-ঘাঁটি অধিকার করে নিল। পাল্টা আক্রমণ করে সে বিমান-ঘাঁটি আর ফিরে পাওয়া গেল না। এক ধার দিয়ে তখন জার্ম্মান বিমানের গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে আর এক ধার দিয়ে গ্লাইডারে করে নূতন নূতন সৈন্য নামছে। বার দিন ধরে এই অদ্ভুত ধরণের যুদ্ধ চলেছিল এবং ক্রীট সম্পূর্ণ দখল হবার পর এই যুদ্ধ শেষ হয়।

এই যুদ্ধের প্রধান কথা হল এই যে একটি দ্বীপ আক্রমণ করবার জন্য জলপথে বা স্থলপথে কোন দিক দিয়েই সৈন্য না পাঠিয়ে কেবল আকাশ পথে বিমান ও গ্লাইডারের সাহায্যে সৈন্য অবতরণ করানো হয়েছিল এবং এই বিমান-বাহিত সৈন্য দিয়েই দ্বীপ জয় করা হ'ল। ২৫০০০ হাজার জার্ম্মান সৈন্য যখন ক্রীটে নেমে পড়ল তখন তারা দলবদ্ধ হয়ে নানাস্থানে আক্রমণ চালাল এবং এই আক্রমণের বেগ সহ্য

করতে না পেরে বৃটিশ ও নিউজিল্যাণ্ডের সৈন্যদল দ্বীপ পরিত্যাগ করে জলপথে চলে গেল।

এই ক্রীটের যুদ্ধে ভাববার কথা অনেক আছে। বৃটিশের নষ্ট হয়েছিল প্রায় ১৫০০০ সৈন্য, জার্মান সৈন্য হতাহত ও বন্দী হয় প্রায় ১৭০০০ হাজার। বিমান-বাহিত সৈন্য দিয়ে, বোমা ফেলে ও প্যারাস্থটে সৈন্য নামিয়ে যদি একটি ছোট দ্বীপ দখল করা যায় তবে আরও বোমা ফেলে ও বহুসংখ্যক প্যারাস্থটধারী সৈন্য নামিয়ে বৃটেনের মত বড় দ্বীপ দখল করা যাবে না কেন? অনেকেই আশঙ্কিত হলেন জার্মানী যেমন অদ্ভুত উপায়ে ক্রীট দখল করেছে, তেমনি বৃটেন দখলও সে করতে পারবে।

কিন্তু আসল কথা যে বৃটেন ক্রীট নয়। ক্রীটে আক্রমণে বাধা দেবার মত জঙ্গী বিমান ছিল না, বিমান-মারা কামান ছিল সংখ্যায় অতি অল্প। বিমান থেকে সৈন্য যখন নেমে পড়লো তখন তাদের সঙ্গে সঙ্গেই নির্ম্মূল করে দেওয়ার মত ভারী কামান বা ট্যাঙ্ক ক্রীটে কিছুই ছিল না। তবুও জার্মানীর ক্ষতি হয়েছে ১৭০০০ হাজার সৈন্য। প্যারাস্থটধারী সৈন্যসংখ্যা যখন ক্রীটের রক্ষাকারী সৈন্যের চেয়ে বেশী হয়েছে তখনই পাল্টা আক্রমণ করে বিমান-ঘাঁটি অধিকার করা যায় নি। প্যারাস্থটে করে বৃটেনে কত লোক জার্মানী নামাতে পারে। অন্ধকার রাত্রে কোন জায়গায় হয়তো ২০।২৫ হাজার নামিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু তারপর যখন ওরা বহুলক্ষ সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হবে, তখন?

ক্রীটের যুদ্ধে বিমানের শক্তি যে কত তা বুঝতে পারা গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারা গেল আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দুর্ব্বল হ'লে বিমান-যুদ্ধে পরাজিত হতে বেশী সময় লাগে না। একে জঙ্গী বিমান বিশেষ ছিল না, তারপর বিমান-ঘাঁটির উপর বোমা ফেলার বিরাম ছিল না বলে বিমান-ঘাঁটিগুলি বৃটিশ সৈন্য দল ঠিক মত ব্যবহার করতে পারে নি।

বৃটিশ সমর-পরিষদকে এই ক্রীটের যুদ্ধের জন্য প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সৈন্য যদি আরও কিছু বেশী থাকতো, জঙ্গী ও বিমান মারা

কামানের সংখ্যা যদি একেবারে নগণ্য না হোত, ট্যাঙ্ক ব্যবহার যদি করতে পারা যেত, তবে এই যুদ্ধের ফল হোত বিপরীত।

একটা জিনিস কিন্তু এপর্য্যন্তও বোঝা গেল না। জার্ম্মানী এত সৈন্য ক্ষয় করে ক্রীট অধিকার করল কেন আর বৃটেনই বা গুরুতর ক্ষতি স্বীকার করে শেষ পর্য্যন্ত ওখানে যুদ্ধ চালিয়ে গেল কেন? যুদ্ধ চালাবার সংকল্প যদি ছিল তবে যুদ্ধ চালাবার মত ব্যবস্থা, অস্ত্রশস্ত্র ও উপকরণের এত অল্পতার কারণ কি? মাণ্টা এর চেয়ে ছোট জায়গা, এর উপর চার বছর ধরে জার্ম্মানী ও ইটালী হাজার বার আক্রমণ চালিয়েছে কিন্তু মাণ্টা অধিকার করা সম্ভব হয় নাই।

মিত্রশক্তির দ্বারা বিমানবলের প্রয়োগ

বৃটেনের উপর জার্ম্মানীর বিমান-আক্রমণ ১৯৪০ সালের শেষের দিকে শিথিল হয়ে আসল। এর পর যুদ্ধ চলল, আফ্রিকায় ও বল্কানে, ৪১ সালের মাঝামাঝি জার্ম্মানী রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়ল। জার্ম্মানীর সৈন্যবল ও বিমানবলের বেশীর ভাগই নিয়োগ করা হল জার্ম্মানীর পূর্ব্ব সীমান্তে। ব্রিটেন এই সময় জার্ম্মানীর আক্রমণের আতঙ্ক থেকে মুক্ত হল এবং এবার সত্যিসত্যি আত্মরক্ষার পরিকল্পনা ছেড়ে আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করল। কিন্তু জার্ম্মানী রাশিয়া আক্রমণ ক'রে বৃটেনকে যে সুযোগ দিয়েছিল পূরোপূরি সে সুযোগ ব্রিটেনের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব হল না। কারণ এ বছরই শেষের দিকে জাপান প্রশান্তমহাসাগর ও ভারতমহাসাগরের আমেরিকা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করে দিল। নিজের ঘররক্ষার চিন্তা খানিকটা দূর হয়েছিল বটে, কিন্তু স্বদেশ থেকে বহুদূরে বিপদসঙ্কুল সমুদ্রের পরপারে তার যে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য আছে সে সাম্রাজ্য রক্ষা করবার জন্য তাকে মনোনিবেশ করতে হল। আমেরিকা, বৃটেন ও রাশিয়া পরস্পর মিলিত হয়েও আত্মরক্ষা ছাড়া কোন আক্রমণের পরিকল্পনা গড়ে তুলতে পারল না।

জাপানের আক্রমণের প্রবল বেগ যখন ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়ে এল তখন আমেরিকা ও বৃটেন মিলিত হয়ে জার্ম্মানীকে কাবু করবার একটা সামরিক পরিকল্পনা গড়ে তুলল। এই পরিকল্পনায় বিমানবহরকে স্থান দেওয়া হয়েছিল সকলের আগে। কোন দেশ আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাথমিক কাজ হিসাবে সেই দেশের উপর যে বিমান-আক্রমণ করা হয় তা আমরা বৃটেনের উপর জার্ম্মানীর বিমান-আক্রমণে দেখেছি। জার্ম্মানীর আক্রমণের এই মূল নীতি গ্রহণ করে কিন্তু পদ্ধতির বা রীতির পরিবর্ত্তন করে বিমান-আক্রমণের যে পরিকল্পনা তৈরী করা হল তাকে বলা হয় Strategic Bombing. কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার।

শত্রুর দেশে গিয়ে এলোপাথারি বোমা ফেললে সামরিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আজ একটা জাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া হল, কাল একটা তেলের গুদামে আগুন লাগান হল, পরদিন একটা সেতু ধ্বংস করা হল, তার পরদিন খানিকটা রেল-লাইন ও একটা সহরের কতকগুলি বাড়ী নষ্ট করা হল এতে শত্রুর বিশেষ অনিষ্ট হয় না। কিন্তু শত্রুর দেশে যেখানে যত তেলের গুদাম আছে সেইগুলির উপর যদি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আক্রমণ চালিয়ে বোমা ফেলা হয় তবে শত্রুর বিশেষ অনিষ্ট হয় এবং যুদ্ধ চালানো তার পক্ষে অসম্ভব না হলেও কঠিন হতে পারে। সব দেশেই অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হয় কারখানায় এবং রেল-গাড়ীতে করে বা মোটর লরীতে এগুলিকে নিয়মিতভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে চালান দেওয়া হয়; সুতরাং কেবল রেললাইন বা মোটর রোড লক্ষ্য করে ধারাবাহিক ভাবে দু মাস কি তিন মাস ধরে যদি রোজ বোমা ফেলা হয় তবে একদিন না একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি গোলা রসদের কম্‌তি পড়বেই। জার্ম্মানীতে ধরা যাক এয়ারোপ্লেন তৈরীর যেন সতরটি কারখানা আছে। এই সতরটি কারখানার উপর যদি নিয়মিতভাবে আক্রমণ করে বোমা ফেলা হয় তবে কিছু বিমান ও যন্ত্রপাতি নষ্ট হবেই এবং মজুরেরাও তাদের কাজ পূরোপূরি করতে পারবে না। এর ফলে কিছুদিন পরে তার বিমানের সংখ্যা কম পড়তে বাধ্য হবেই।

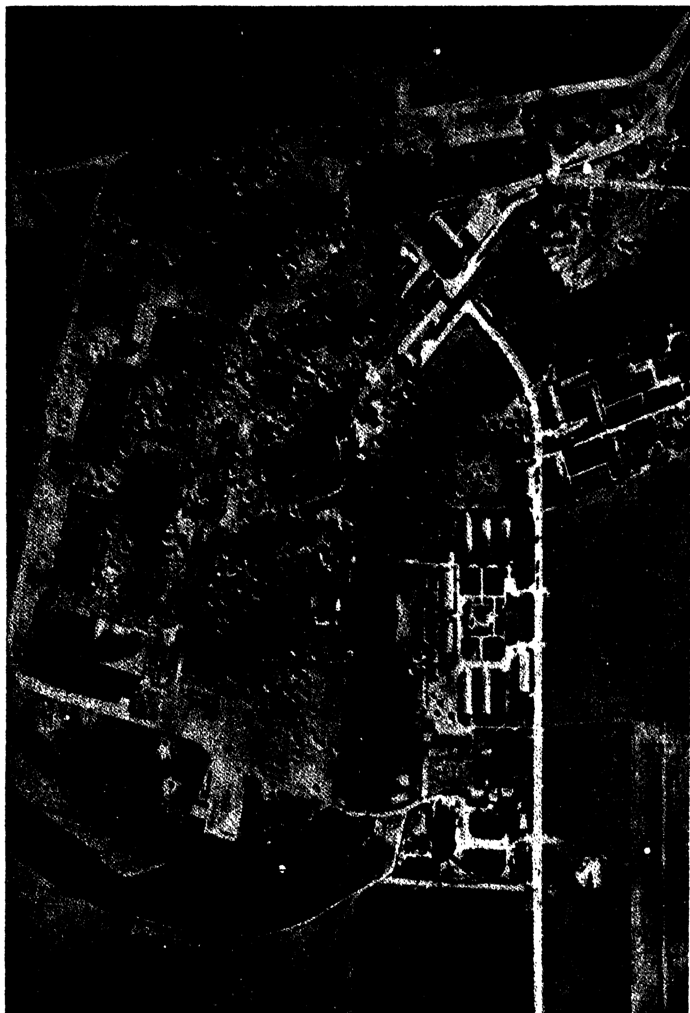
এই রকম হিসাব করে খোঁজ খবর নিয়ে কোন একটি লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে অন্য-দিকে নজর না দিয়ে কেবল সেই লক্ষ্যটির উপরেই ক্রমান্বয়ে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া এরই নাম Strategic Bombing.

জনগণের মনে বিভীষিকা সৃষ্টির জন্য এবং সমর প্রচেষ্টায় কর্ম্মেরত নরনারীগণকে নিরুৎসাহ করবার জন্য কোন ধরণের আক্রমণে বেশী ফল হয়। একটা সহরের উপর একদিনে পাঁচশো বিমান নিয়ে আক্রমণ করলে লোকে বেশী ভয় পায়—না



অনেক উঁচু দিয়ে সুপার ফোর্টেস্ চলেছে বোমা ফেলতে

একশো বিমানের আক্রমণ পর পর পাঁচ দিন চালালে বেশী ভয় পায়। একই স্থানের উপর একদিনে একশো টন বোমা ফেলা—না পঁচিশ টন করে চারদিনে বোমা ফেলা বেশী কার্য্যকরী। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা এক এক অবস্থায় এক এক রকম পরামর্শ সমর পরিষদকে দিয়ে থাকেন। সামান্য কয়েকখানা বিমান নিয়ে উৎপাত করলেও বেশ ফল পাওয়া যায়। রাত ১১ টায় একবার ও তারপর রাত ২টায় আবার—একই রাতে যদি দুবার একটা সহরে গিয়ে সামান্য উৎপাতও করা



স্থপার ফোর্টেসের অল্টিটিউড্ বম্বিং

যায় তবুও লোকের ঘুমের ব্যাঘাত হয় এবং পর পর কয়েক রাত ঘুমোতে না পারলে মেজাজ সব জাতির লোকেরই বিগড়ে যায়।

বৃটেন ও আমেরিকা বিমান ও বোমা তৈরীর জন্য যে ভাবে জলের মত অর্থ ব্যয় করছিল ও পাঁচশো থেকে বার হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত বিভিন্ন শক্তির বোমা তৈরী করছিল তার ফলে উভয় দেশেই সমর পরিষদের বিরুদ্ধে সমালোচনাও হয়েছিল বিস্তর। বৃটেন ও আমেরিকা গণতন্ত্রের দেশ। সমালোচনার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের নীতি ও পদ্ধতি যে নির্ভুল এ কথা দেশের লোককে বুঝিয়ে বলেছেন। Bombing is not the prelude to Invasion—it is Invasion, বোমা ফেলাকে তাঁরা দেশ আক্রমণের ভূমিকা বলে মনে করতেন না। এক সীমান্তে রাশিয়া জার্ম্মান স্থল বাহিনী ও যান্ত্রিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। আর পিছনের দিক থেকে কল-কারখানা, দুর্গ, সেতু, শিল্প, রেলপথ সমস্তই আমেরিকা ও ব্রিটেনের মিলিত আক্রমণে ধ্বংস হতে থাকে।

বিমান-আক্রমণের পথ প্রদর্শক অবশ্য জার্ম্মানী কিন্তু আমেরিকা ও বৃটেন জার্ম্মানীর উপর বিমান-আক্রমণের যে ঝড় দুবছর ধরে চালিয়েছে এবং প্রত্যেকটি আক্রমণের পিছনে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করেছে তাতে ইংলণ্ডের উপর জার্ম্মানীর অতি বীভৎসতম আক্রমণও শিশু বলে মনে হয়। আফ্রিকার উপকূল থেকে আমেরিকার বিমান ইতালীতে বোমা ফেলে ইংলণ্ডে গিয়ে নেমেছে আবার ঐ বিমানই ইংলণ্ড থেকে তেল ও বোমা নিয়ে ফেরবার পথে ইতালীতে আবার বোমা ফেলে আফ্রিকায় ফিরেছে। ইংলণ্ড থেকে বিমান উড়ে জার্ম্মানীতে বোমা ফেলে রাশিয়ার বিমান-ঘাঁটিতে নেমেছে আবার ঐখান থেকে বোমা নিয়ে আবার জার্ম্মানীতে বোমা ফেলে ইংলণ্ডে ফিরেছে। এরই নাম Shuttle bombing.

আমেরিকা ও বৃটেনকে যে জয়লাভের জন্য বিমানবলকে এরূপভাবে প্রয়োগ করতে হয়েছে তার কারণও আছে। বৃটেন ও আমেরিকার জনসংখ্যা এমন কিছু বেশী নয়—বৃটেনের ৫ কোটি ও আমেরিকার ১২ কোটি। তারপর—'একজন মানুষ একটা বন্দুকের সমান' এ নীতি এই দুই দেশের কোনটিতেই চলে না। কোন যুদ্ধে যদি অকারণ লোকক্ষয় হয় তবে তার জন্য সমর পরিষদকে কৈফিয়ৎ

দিতে হবে—দেশের লোকের এ অধিকার অস্বীকার করবার উপায় নাই। সুতরাং এমন একটা পদ্ধতি দরকার—যেখানে শত্রুর ক্ষতি করা যাবে যথেষ্ট, তার সমর প্রচেষ্টা ক্ষুণ্ণ করা যাবে অনেকটা অথচ নিজেদের ক্ষতি তেমন হবে না, যেটুকু হবে সেটুকু সহ্য করতে পারা যাবে।

জার্ম্মানীর সব চেয়ে 'সুরক্ষিত ঘাঁটি', যেমন বার্লিন, হামবুর্গ, কলোন বা রুড় অঞ্চলে যদি ৫০০ শত বোমারু বিমান নিয়ে আক্রমণ করা হয় তবে শত্রুর কি রকম ক্ষতি হয় আর নিজেদেরই বা কতখানি লোকসান হয়? ৫০০ বোমারু যদি আক্রমণ চালায় তবে ৪০ খানা হয়তো নষ্ট হবে। ৪০ খানা বোমারুতে লোক থাকবে ২৮০ জনের বেশী নয়। এই ২৮০ জনের কেউ মারা যাবে, কেউ বন্দী হবে। কিন্তু একটা অতি সাধারণ রকম স্থলযুদ্ধে একদিনেই চার পাঁচ হাজার সৈন্য হতাহত ও বন্দী হয়। প্রথম মহাসমরে সোমনদীর যুদ্ধে একদিনেই সাতান্ন হাজার লোক নিহত হয়েছিল। ২৮০ জন লোকের প্রাণের বিনিময়ে জার্ম্মানীর একেবারে মর্ম্মস্থানে আঘাত করবার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু স্থলযুদ্ধ হ'ত জার্ম্মানীর বাইরে—সে যুদ্ধের প্রভাব ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রটি ছাড়িয়ে জার্ম্মানীর উপর পড়ত না। বড় একটা বিমান-আক্রমণে কলকারখানায় বা নাগরিক জীবনে এত বড় একটা বিশৃঙ্খলা এনে দেওয়া যায় যে শত্রুর দেশের বহু লোককে যুদ্ধের কাজ ছেড়ে বিমান-আক্রমণের জের শুধ্‌রাবার জন্য লেগে যেতে হয়।

জার্ম্মানীর পরাজয়ের জন্য দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে হয়েছিল এবং স্থলপথে আক্রমণও চালাতে হয়েছিল সন্দেহ নাই—কিন্তু জার্ম্মানীর সর্ব্বপ্রকার বল হরণ করে তাকে শক্তিহীন করে দিয়েছিল মিত্রশক্তির বিমান-বাহিনী এতে আর সন্দেহ নাই।

জাপানের বিমান-হানা

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ সাল। জাপানের সঙ্গে আমেরিকার বোঝাপড়া চলছে, জাপানের দুজন রাজদূত আমেরিকার রাজধানী ওয়াংশিটন নগরে মার্কিন

গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সম্মানজনক আপোষ মীমাংসার জন্য কথাবার্ত্তা চালিয়ে যাচ্ছেন আর এদিকে পার্লহারবারের মার্কিন নৌঘাঁটির উপর, ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার উপর, সিঙ্গাপুর ও মালয়ের নানাস্থানে, একপ্রান্তে হংকং আর অন্যপ্রান্তে গুয়াম দ্বীপের উপর জাপানী বিমানের প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু হয়ে গিয়েছে। সমস্ত প্রশান্ত মহাসাগর জাপানী আক্রমণের দাপটে অশান্ত হয়ে উঠেছে। একহাজার মাইল, দেড়হাজার মাইল, দুহাজার মাইল দূরে দূরে এক একটা স্থান—সব স্থানেই



পার্লহারবার

যুগপৎ আক্রমণ—সব স্থানেই অসামান্য সাফল্য—বিমানের বোমা বর্ষণের পরপরই জাহাজের কামানের অগ্নি-উদ্গীরণ—কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা চূর্ণ ও স্থান অধিকার—জাপানের সাম্রাজ্যের বিস্তার। সমস্ত জগৎ যেন বিস্ময়ে হতবুদ্ধি।

আজ গুয়ামদ্বীপ দখল, পরদিন ফিলিপাইনে সৈন্য নামিয়ে দেওয়া, তিনদিন

পরে বোর্ণিও দ্বীপে নেমে পড়া, এক সপ্তাহে হংকং দখল, পনর দিন পর মালয়ের রাজধানী দখল, আরও পনর দিন পরে সমস্ত মালয় অধিকার, তার দশ দিন পরে সিঙ্গাপুর অধিকার, মাসখানেকের মধ্যে রেঙ্গুন দখল—এই রকম পর পর সাফল্যের উপর সাফল্য ও জাপানী বাহিনীর বিস্ময়কর অগ্রগতি। এই সাফল্যের মূলে জাপানের অতর্কিত আক্রমণ, নিখুঁত অস্ত্রসজ্জা ও সমর-সমাবেশের নৈপুণ্য—প্রতিপক্ষের অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, জাহাজ ও বিমানের শোচনীয় অল্পতা। এইগুলি জলযুদ্ধ পুস্তকে বিশেষভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। এখানে জাপান নৌযুদ্ধে এবং স্থান দখলে তার বিমানবলকে কিভাবে প্রয়োগ করেছিল তার দু'একটা কথা জানা দরকার।

পার্লহারবার প্রশান্ত মহাসাগরের সবচেয়ে বড় নৌঘাঁটি। আমেরিকার 'প্যাসিফিক্ ফ্লিটে'র এইটাই সবচেয়ে বড় আড্ডা। ৭ই ডিসেম্বর বেলা ৮টা ১০ মিনিটের সময় পার্লহারবারের নঙ্গর-করা মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ ও বিমানঘাঁটির উপর জাপানী বিমানের আক্রমণ আরম্ভ হয়। অনেকগুলি বড় বড় ব্যাটলসিপ ও ক্রুজার বোমাবর্ষণের ফলে ডুবে যায়, কতকগুলি একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে আর বিমানঘাঁটিতে প্রায় পাঁচশখানা বিমানের মধ্যে অর্দ্ধেক ঘায়েল হয়। প্রায় দুঘণ্টা ধরে দেড়শ বিমান ঝাঁকে ঝাঁকে এসে আক্রমণ চালিয়েছিল এবং এই আক্রমণের ফলে প্রায় চার হাজার লোক হতাহত হয়েছিল।

নঙ্গর-করা জাহাজের উপর বোমা ফেলা অথবা বাধা দেওয়ার জঙ্গী বিমান যেখানে নাই সেখানে একশ' মিনিট ধরে খুসীমত বিমান আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। মার্কিন যুদ্ধ জাহাজের বহরকে গুরুতরভাবে ঘায়েল করে দেওয়া—যাতে আবার নূতন জাহাজ তৈরী না করলে আমেরিকা জাপানকে আক্রমণ করতে না পারে এই ছিল জাপানের ষ্ট্র্যাটেজি এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য বিমান-বাহী জাহাজে করে দেড়শ বিমান পাঠানো হয়েছিল। এই দেড়শ বিমান আমেরিকার নৌবহরের এতটা ক্ষতি করেছিল যে ক্ষতি অন্য অবস্থায় (অর্থাৎ আমেরিকা যদি জানতো জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে) দশ হাজার বিমান দিয়েও

করা সম্ভব হ'ত না। পার্লহারবারের এই শোচনীয় স্মৃতির কথা আমেরিকার লোক কোনদিনই ভুলতে পারবে না।

পার্লহারবারের ঘটনার পরের মুহূর্ত্ত থেকেই জাপ নৌবহর প্রশান্ত মহাসাগরের হাজার হাজার মাইল স্থান জুড়ে হয়ে পড়ল একেবারে নিরঙ্কুশ। প্রশান্ত মহাসাগরের বার তের হাজার দ্বীপে যখন যেখানে খুসী জাপ নৌবহর যেতে পারে



পার্ল হারবারে জাপানী বিমান-হানায় জাহাজে বিস্ফোরণ

—তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার কেউ নাই—এই হয়ে দাঁড়াল অবস্থা। জাপানী যুদ্ধের যে চমক তার গোড়ার কথাটা এইখানে। ইংলণ্ড থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে আসতে জাহাজের লাগে চার মাস। ইংলণ্ডের পনরআনা যুদ্ধ জাহাজ আটলান্টিকে —জার্ম্মান সাবমেরিণের সঙ্গে বৃটিশ রণতরী ও বাণিজ্যতরীর তখন জীবন-মরণ-যুদ্ধ চলছে।

বৃটিশের সবচেয়ে ভাল ও নূতন ব্যাটলশিপ, 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্' ও ব্যাটল-ক্রুজার, 'রিপালস্' কিছুদিন আগেই ভারত মহাসাগরে এসে পৌঁছেছিল। জাপান যুদ্ধ আরম্ভ করেছে ও উত্তর মালয়ে সৈন্য নামিয়ে দিচ্ছে এই সংবাদ পেয়ে সার্ টমাস্ ফিলিপ্স্ এই দুখানা জাহাজ নিয়ে জাপানী সৈন্যের অবতরণে বাধা দেওয়ার জন্য মালয়ের উপকূল ধরে উত্তর দিকে চলছিলেন। একদিন নিরাপদে কেটে গেল—



বোমাবিধ্বস্ত আমেরিকান জাহাজ—পার্লহারবার

পরদিন জাপানী সন্ধানী বিমানের চোখে পড়ে গেল জাহাজ দুখানি—বিমানখানা জাহাজদুটির উপর নজর রেখেছিল—পরদিন সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে জাপ বোমারুর দল আসতে লাগল। ৬০খানা বোমারু ১৭ হাজার ফুট উঁচু থেকে বোমা ও টর্পেডো ফেলতে লাগল—বোমায় জাহাজের বেশী কিছু ক্ষতি হয় নাই—তিন ঘণ্টা অবিশ্রাম আক্রমণ চলল—টরপিডোগুলিই ছিল সাংঘাতিক—রিপাল্স আগে ও প্রিন্স-অব্-ওয়েলস্ খানিক পরেই ডুবে গেল। ৩৫ হাজার ও ৩২ হাজার টনের এই দুটি জাহাজ নষ্ট হওয়ায় প্রশান্ত মহাসাগরের একটা কোণে যে

আংশিক প্রতিরোধও জাপ নৌবহরকে দেওয়া চলত তার আর কোন সম্ভাবনাই রইল না।

এই দুখানা জাহাজ বিমান-আক্রমণে ডুবিয়ে দেওয়া জাপ বিমান-বাহিনীর পক্ষে খুবই গৌরবের সন্দেহ নাই—এত বড় কৃতিত্ব জাপানী বিমান-বাহিনী আর কোনখানে অর্জ্জন করতে পারে নাই—জাপানী বৈমানিকের দুঃসাহসিকতা ও রণ নিপুণতা সমস্ত জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

এই ঘটনার পর ইংলণ্ডের সমর পরিষদ তদন্ত আরম্ভ করেন—জাপান বিমান, বোমা ও বোমা ফেলার কোন নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার করেছে কিনা। তদন্তের ফলে তাঁরা জানতে পারলেন আক্রমণে বিশেষ কোন নূতনত্ব ছিল না—ক্রমাগত দুঃসাহসিক আক্রমণেই জাহাজ ডুবেছে। সার্ টমাস্ ফিলিপস্ কোন রক্ষী বিমান না নিয়ে সংকীর্ণ সমুদ্রে প্রবেশ করে শত্রুর বিমানের পাল্লার মধ্যে পড়ে রণনীতির দিক দিয়ে মস্ত ভুল করেছিলেন বলে যে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা উঠেছিল—সমরপরিষদ সে সমালোচনা খণ্ডন করে মৃত এ্যাডমিরালের কাজের সমর্থনই করেছিলেন—এটুকু risk বা ঝুঁকি বৃটিশ রণতরী আগেও নিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও নেবে—শত্রুসৈন্য অবতরণ করছে একথা শুনে কোন সৈনিকই নিশ্চিন্ত বসে থাকতে পারে না।

পার্লহারবার ও বৃটিশ রণতরী দুটির উপর আক্রমণ—এ দুটি হ'ল জাপানী বিমানবাহিনীর প্রাথমিক কাজ। এর পর থেকে জাপানীরা যেখানে বিমান আক্রমণ চালিয়েছে সেখানে সঙ্গে সঙ্গেই বা কিছু দিন পরে জাপানী স্থলসৈন্য বা নৌবাহিনী আক্রমণ করেছে। নৌবাহিনী বা স্থলবাহিনীর সাহায্যকারী হিসাবেই জাপানী বিমান দেখা গিয়াছে। জার্ম্মানী, বৃটেন ও আমেরিকার মত স্বতন্ত্র স্বয়ংক্রিয় বাহিনীরূপে আমরা জাপানের বিমান-বাহিনীকে দেখতে পাই নি।

হাজার পাউণ্ডের চেয়ে বড় বোমা জাপান ব্যবহার করেছে বলে শোনা যায় নাই, একটা বিমান অনেক বিস্ফোরক বোমা ব্যবহারও করে নাই কিন্তু বোমারু-বিমানের পাইলটরা মেশিনগান চালাতে খুব ওস্তাদ—সহরের রাস্তার উপর দিয়ে

উড়ে পথের লোকের উপর মেশিনগানের গুলি চালানো, টিনের বা টালির ছাদের উপর গুলি ছুঁড়ে ঝাঁঝরা করে দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপারের কথা অনেক শোনা গেছে।

যুদ্ধারম্ভের সময় জাপানের মোট বিমানের সংখ্যা কত ছিল? এত বড় সমুদ্রের নানা স্থানে ও নানাদিকে জাপান এরূপ প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছিল যে মনে হয় যথেষ্ট বিমান বল না থাকলে তার পক্ষে এটা সম্ভব হ'ত না। পাঁচ হাজারের বেশী



সিঙ্গাপুরে প্রথম জাপানী বিমানের হানা

জাপানের বিমান ছিল না, এ কথা অনেকেই বলে থাকেন; কেবল রণনীতির বৈশিষ্ট্যের জন্যই অর্থাৎ প্রথমেই চরম আঘাত হেনে শত্রুপক্ষকে দিশেহারা করে দেওয়া ছিল তার ষ্ট্র্যাটেজি।

জাপানের বিমানে বিশেষ কোন নূতনত্ব ছিল না—জার্ম্মান, বৃটিশ ও ফরাসী বিমানের অনুকরণে ছিল জাপানী বিমান তৈরী। পাইলটরা ছিল সুশিক্ষিত

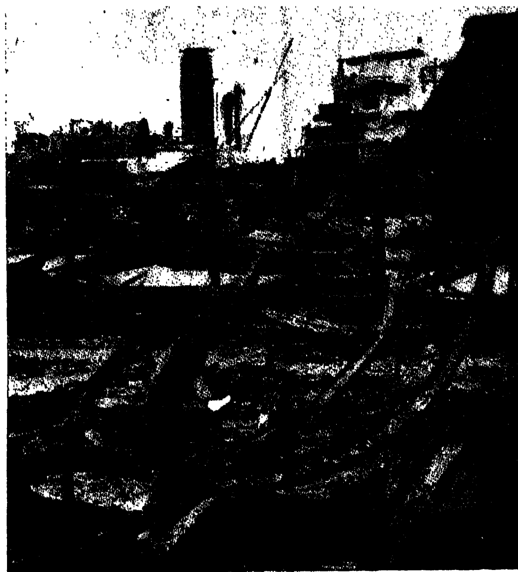
বিমান চালনার অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একটা অদ্ভুত রকমের দুঃসাহসিকতা—এই জন্যই জাপানী বৈমানিক শত্রুপক্ষেরও শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভ করেছিল।

এইবার জাপানী বিমান-আক্রমণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উল্লেখ করছি। প্রথম প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ হয় সিঙ্গাপুরে। সমুদ্রপথে সোজাসুজি সিঙ্গাপুর ইন্দোচীন থেকে ৭০০ মাইল দূরে। অনেক দিন আগে থেকেই অর্থাৎ ফ্রান্সের পতনের পর থেকেই নানা অছিলায় জাপানীরা ইন্দোচীনে প্রবেশ করে ও ইন্দোচীন ও শ্যামের প্রায় একশ'টি বিমানঘাঁটি দখল করে। এই সমস্ত ঘাঁটি থেকেই প্রথম সিঙ্গাপুর ও মালয়ের উপর বিমান-আক্রমণ চালান হয়। পরে অবশ্য মালয়ের অনেকগুলি ঘাঁটিও জাপানীরা দখল করে এবং সেখান থেকে বর্মার নানাস্থানে বিমানহানার সুবিধা হয়।

সিঙ্গাপুরে বিমান আক্রমণ স্থলসৈন্য দ্বারা আক্রমণেরই সূচনা। বিমানঘাঁটি, জল ও আলোর ব্যবস্থা এবং জাহাজ, ডক ও সহরের উপর ব্যাপক আক্রমণ হয়। বিমানঘাঁটির অধিকাংশ বিমানই জখম হয়, সাত লক্ষ লোকের সহরের পানীয় জলের ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং বেপরোয়া বোমাবর্ষণের ফলে সাধারণ লোক ঘর বাড়ী ভেঙ্গে যাওয়ায় বড়ই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। অনেকেই আশা করেছিলেন সিঙ্গাপুর উত্তর আফ্রিকার তোব্রুকের মত অবরুদ্ধ হয়ে আত্মরক্ষা করে যাবে—যতক্ষণ না বাইরে থেকে জাহাজ ও বিমানের সাহায্য না আসে, ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। এই প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের ফলেই তা সম্ভব হয় নাই।

রেঙ্গুণে জাপানীদের প্রথম বিমানহানা অতি বীভৎস অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। রেঙ্গুনের লোকের বিমান আক্রমণের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, তারপর সাইরেন বাজলেই যে শেল্‌টার নিতে হবে এই প্রাথমিক উপদেশটি অনেকেই অবহেলা করেছিল। রাস্তায় দলে দলে লোক দাঁড়িয়েছিল, খোলা জায়গায় বা পার্কে দল বেঁধে লোক তাকিয়ে দেখছিল উপরের আকাশে কেমন ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান

আসছে। রোদের মধ্যে দিয়ে হলদে রঙের বোমাগুলি কেমন ছুটে আসছিল তা চেয়ে চেয়ে দেখছিল আর ভাবছিল বোমাগুলি অনেক দূরে পড়বে—অতএব কোন ভয় নাই। এর ফল হ'ল অতি সাংঘাতিক—বোমার টুকরা (Splinter) লেগে রেঙ্গুনে একবারের আক্রমণেই লোক হতাহত হয়েছিল ছ'হাজার। রেঙ্গুনে বাড়ীঘর অধিকাংশই কাঠের—পাকা দালান কোঠার সংখ্যা খুবই কম। আগুনে



সিঙ্গাপুর ডকের উপর বোমা বর্ষণের ফল

বোমা এই সব ঘরবাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। রেঙ্গুনে যে বোমা পড়েছিল তা থেকে জাপানী আক্রমণের আরও একটা উদ্দেশ্য বোঝা গিয়েছিল। বোমাগুলি ছিল যাকে বলে (ante personal bomb) অর্থাৎ লোক-খেদানো বোমা। এই বোমাগুলির মধ্যে বিস্ফোরকের পরিমাণ খুব বেশী অথচ বোমার খোলটা খুব পাতলা লোহার পাতের। এর ফল হয় যে বোমাটা মাটিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরণ ঘটে ও টুকরা গুলি অত্যন্ত নীচু দিয়েই চারদিকে ছুটে যায়। বোমাটা

পড়েই যদি মাটিতে বসে যায় ও তারপর ফাটে তবে ঘরবাড়ীর ক্ষতি হয় বেশী কিন্তু টুকরাগুলি উপরের দিকে ছুটে যায়। জাপানের উদ্দেশ্য কিন্তু সিদ্ধ হয়েছিল এতে চমৎকার। রেঙ্গুনের এই প্রথম আক্রমণের পর থেকে রেঙ্গুন ছেড়ে লোক পালাতে আরম্ভ করল—প্রথম আশ্রয় নিল জঙ্গলে ও কাছাকাছি গ্রামে—কেউ কেউ গেল উত্তর বর্ম্মায় পালিয়ে। কিন্তু বর্ম্মার অন্য কয়টা সহরে এই রকম বিমান হানা হয়ে যাবার পর দলে দলে লোক পালাতে লাগল বর্ম্মা ছেড়ে ভারতবর্ষের দিকে। হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ লোক পায়ে হেঁটে স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে পাহাড় ও জঙ্গলের বিপদ-সঙ্কুল রাস্তা দিয়ে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করবার জন্য যাত্রা করল। খাদ্যের অভাবে এরা মারা গিয়েছে অনেকে, ক্লান্তিতে, পথশ্রমে এরা পথে ঢলে পড়েছে অনেকে, আর ওঠে নাই, চোর ডাকাতে অনেকের সর্ব্বস্ব লুট করেছে তবু জীবনের মায়ায এরা এগিয়ে চলেছে দিনের পর দিন ধরে।

গুরুত্বের দিক দিয়ে, রণনীতির চমৎকারিতার দিক দিয়ে ১৯৪২ সালের ৫ই এপ্রিল জাপানী বিমান যে সিংহলে কলম্বোর উপর আক্রমণ করেছিল তা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, বঙ্গোপসাগরের মধ্যে আন্দামান, পোর্টব্লেয়ার—সমস্তই জাপানের অধীন। হংকং থেকে আরম্ভ করে ফিলিপাইন, বোর্ণিও, যাভা ও সুমাত্রার সমস্ত বন্দর জাপানের আয়ত্তে। ভারত মহাসাগরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত সিংহলে কলম্বোর বিমান-ঘাঁটি যদি জাপান অধিকার করতে পারে এবং সেখান থেকে একটি শাখা যদি করাচী, এডেন হ'য়ে আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী ম্যাডাগাস্কারে চালিয়ে দেয় তবে জাপানী নৌবহর ভারত মহাসাগরে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করতে পারে এবং ভারতবর্ষকে জলপথে আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও বৃটেনের সমস্ত প্রকার সাহায্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারে। এদিক দিয়ে জার্ম্মান ও ইটালীয়ান সৈন্য উত্তর আফ্রিকায় আক্রমণ চালিয়ে এগিয়ে আসছে—মিশরের দ্বার পর্য্যন্ত তারা এসে পড়েছে—মিশর অতিক্রম করলেই সুয়েজ খাল—ভারত সাম্রাজ্যের দ্বার তখন হয়ে যাবে একেবারে খোলা। চক্রশক্তির বোধ হয়

এইটাই ছিল grand strategy—দু'দিক দিয়ে আক্রমণের দু'টি ধারা ভারতবর্ষে এসে মিলিত হবে।

৫ই এপ্রিল বিমানবাহিত কতকগুলি জাপানী বোমারু কলম্বোর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করে দিল। এর দু'এক দিন আগেই জানা গিয়েছিল যে একটি মাঝারি রকমের জাপ নৌবহর মাদ্রাজের উপকূল ভাগের নিকট দিয়ে সিংহলের দিকে যাচ্ছে। ভারতের উপকূল রক্ষী নৌবহরের এত শক্তি ছিল না, যে এগিয়ে গিয়ে জাপ নৌবহরকে আক্রমণ করে। যাক্, জাপানী নৌবহরের তিনখানা মাঝারি ধরণের বিমানবাহী জাহাজ থেকে জাপানী বিমান কলম্বোর উপর হানা দেয়। সিংহলের উপর ও কাছাকাছি সমুদ্রে ঘোরতর বিমান যুদ্ধ হয়। জাপানী যুদ্ধ



জাপানী বিমানের আক্রমণে জাহাজ ডুবে গিয়েছে ; জাহাজের মাঝি-মাল্লারা রবারের বোটে জলে ভাস্ছে

আরম্ভ হবার পর বোধহয় এই প্রথম যে জাপ বিমান বহরকে গুরুতর বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়। কলম্বোর নৌ-ঘাঁটি ও বিমান-ঘাঁটির উপর জাপানের বোমারু আক্রমণ ক'রে বোমা ফেলে ও কয়েকখানা জাহাজ নষ্ট করে দেয়। কিন্তু আক্রমণকারী জাপ বোমারুর ৭৫টির মধ্যে ৫৭টি সেদিন জখম হয়। আক্রমণ যেরূপ প্রচণ্ড হয়েছিল, বাধাও তেমনি পেয়েছে ভয়ঙ্কর। বাধা যদি এভাবে না দেওয়া হ'ত তবে জাপানী নৌবহরই সোজা এগিয়ে এসে কলম্বোর উপর আক্রমণ

চালাত এবং ভারত মহাসাগরের উপর সর্ব্বময় প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টায় আংশিক সাফল্য লাভ হ'ত। কলম্বোর পর মাদ্রাজে ও উড়িষ্যার উপকূলে জাপানী বিমান-আক্রমণ করে—কিন্তু এই আক্রমণগুলি হালকা ধরণের ও বোমা ফেলেই বিমানগুলি সরে পড়ে।

এই সব আক্রমণের পরে বৃটিশ রণনীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে বিস্তর কিন্তু সমালোচকদের মধ্যে তাঁদের কণ্ঠই সব চেয়ে উঁচু যাঁরা সময় থাকতে হুঁসিয়ার ছিলেন না—যাঁরা বৃটেনের সমর-সজ্জা বৃদ্ধি ব্যাপারে বরাবর বাধা দিয়ে এসেছেন। সুতরাং বৃটিশ সমরপরিষদ এ সব কথায় কাণ দেন নাই। জাহাজ বা বিমান অর্ডার দিলেই ৫।৭ দিনের মধ্যে পাওয়া যায় না—আর বৃটেন থেকে আফ্রিকা ঘুরে জার্ম্মান সাবমেরিন ও বোমারুকে ফাঁকি দিয়ে ভারত মহাসাগরে আসতে চার মাস লাগে তা আগেই বলা হয়েছে। মনে হয় 'প্রিন্‌স অব ওয়েলস্‌' ও 'রিপাল্‌স্‌' ডুবে যাবার পর সিঙ্গাপুর রক্ষার জন্য যে জাহাজ ও বিমান বৃটেন থেকে রওনা হয়েছিল তার প্রথম দলটি এপ্রিল মাসের প্রথমেই কলম্বো এসে পড়েছিল—এবং সিঙ্গাপুরের পতন হয়ে গেছে বলে তারা কলম্বো ও ত্রিন্‌কোমালী ঘাঁটি রক্ষার জন্যই রয়ে গিয়েছিল। এর পরে জাহাজ ও বিমান ধীরে ধীরে ভারতে এসে পৌছুতে থাকে এবং জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করবার ব্যবস্থা ক্রমশঃ দৃঢ় হতে থাকে।

কলম্বোতে বাধা পেয়ে পরের মাসে জাপানী বিমান চট্টগ্রাম সহরের উপর বিমান-আক্রমণ চালায়। আক্রমণটা হয়েছিল বিশেষ করে সহরের বাইরে বিমান-ঘাঁটির উপর কিন্তু সহরের উপরও বোমা পড়ে ও কিছু কিছু ক্ষতিও হয়।

এ পর্য্যন্ত জাপানী বিমান-হানার বৈশিষ্ট্য ছিল যে বিমান-হানা ব্যাপারটা জাপানের পক্ষে ছিল 'যৌথ আক্রমণ'। যেখানেই জাপান বিমান-আক্রমণ করেছে সেখানেই হয় তার স্থলসৈন্য, নয় তার নৌবাহিনী অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। সুতরাং চট্টগ্রামে বিমান-হানার সঙ্গে সঙ্গেই বহু লোক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ভেবেছে—জাপান এইবার বুঝি বাংলা দেশ আক্রমণ করবে।

১৯৪২ সালের শেষের দিকে—অর্থাৎ ২১শে ডিসেম্বর কলকাতায় প্রথম জাপানী

বিমান দেখা দেয়। পর পর আরও কয়েক দিন কলকাতার উপরে এই বিমান-হানা চলে। এইগুলি ছোট ছোট দলের আক্রমণ। আক্রমণের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সবগুলি আক্রমণই হয়েছিল রাত্রে। কলকাতার উপর বিমান-আক্রমণে সামরিক ক্ষতি হয় যৎসামান্য—বোমাগুলি ante-personal বোমা—বাড়ীর গায়ে ও দেয়ালে স্প্লিন্টারের দাগগুলি অনেকদিন পর্য্যন্ত ছিল—বড় বড় টুকরাগুলি দেয়ালের মধ্যে ৩।৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত ঢুকে গিয়েছিল কিন্তু দেয়াল ভেদ করেছে বলে শোনা যায় নি। একটি বোমা পড়েছিল বাজারে—হতাহত হয়েছিল তাতে অনেকেই।

জাপান কোন স্থানেই প্রথম আক্রমণ রাত্রে চালায় নাই কিন্তু কলকাতায় পর পর কয়েকবার আক্রমণ হ'ল রাত্রে। এটা জাপানী সমর নায়কগণের মস্ত একটা surprise. কলকাতায় বিমান-আক্রমণ হবে, যে কোন দিনই হতে পারে এই আশঙ্কা সকলেরই ছিল কিন্তু সকলের ধারণা ছিল আক্রমণ হবে দিনে। সুতরাং জাপানী বোমারুকে বাধা দেওয়ার জন্য যে সব জঙ্গী বিমান থাকবে, তারা day fighter হওয়াই সম্ভব night fighter না হওয়ারই কথা। জাপানী বিমান কলকাতা আক্রমণ করে যে আংশিক সাফল্যও লাভ করেছিল তার গোড়ায় এই surprise. বলা বাহুল্য পরের মাসে আবার জ্যোৎস্না রাতে যখন জাপানী বিমান কলকাতা আক্রমণ করতে আসে তখন নূতন ধরণের night fighter ভারতবর্ষে এসে পড়েছিল এবং একজন বৃটিশ পাইলট চার মিনিটের মধ্যে একাই পর পর তিনখানা জাপানী বোমারুর দফা শেষ করে দেয়। বলা বাহুল্য সেবার জাপ বিমানবহর কলকাতার উপর আসতে পারে নাই।

প্রায় এক বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের শেষদিকে আবার একদিন জাপানী বিমান কলকাতা আক্রমণ করতে আসে। সেবার তারা দলে ছিল ভারী এবং এসেছিল দিনে—রবিবার বেলা ১১টার সময়। এবারও সেই surprise. রাতের জন্য যেখানে সকলেই প্রস্তুত সেখানে রাতে না এসে দিনে আসা। এই আক্রমণে লোকজন হতাহত হয়েছিল আগের চেয়ে বেশী।

কলকাতার উপর জাপানী বিমানের আক্রমণের ভয়ে বহু লোক যখন কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিল আক্রমণ তখন হয় নি; যখন আক্রমণ হল তখন কলকাতার লোকসংখ্যা আবার বেড়ে গিয়েছে। এবারও কিছু কিছু চলে গিয়েছিল। কিন্তু গুরুতর কোন অবস্থার সৃষ্টি তার ফলে কিছু হয় নি।

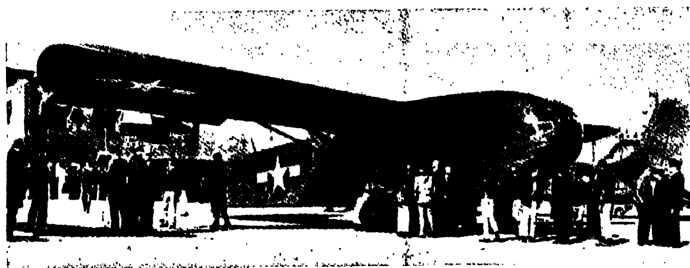
প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ১৯৪২ সালের মধ্যেই পঞ্চাশ হাজার বিমান ও আশী লক্ষ টন জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য আমেরিকাবাসীর নিকট যে আবেদন জানান তার ফল এই বৎসরের শেষের দিকেই ফলতে থাকে। জাহাজ ও বিমান বৃটেন



Flying Shark—দুর্দ্ধর্ষ ফাইটার-বমার 'কিটি-হক' প্রাচ্য যুদ্ধে এসে পড়েছে

ও আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে আসতে থাকে। ভারতের বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে সব রকম আবহাওয়ায় আসাম-ব্রহ্ম-সীমান্তে, রেঙ্গুনে, আকিয়াবে, পোর্টব্লেয়ারে বিমান-আক্রমণ চলতে থাকে। Attack is the best defence :—আক্রমণ

চালিয়ে গেলে শত্রুর আক্রমণের ব্যবস্থা এতটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় যে আক্রমণের সুযোগ সে পায় না।



বিরাটকায় আমেরিকান্ প্লেন সৈন্য বহন করে নিয়ে যাচ্ছে চীন-ব্রহ্ম সীমান্তে

এই সময় আরও একটি ব্যাপার ঘটে। প্যারাসুট ও গ্লাইডার নিয়ে উইংগেট নামে একজন সুদক্ষ বৃটিশ সেনাপতি অত্যন্ত গোপনে মধ্য বর্ম্মার এক দুর্গম স্থানে অবতরণ করেন। ক্রমে ক্রমে সেইখানে বিমান-বাহিত সৈন্য, রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র যেতে লাগল। বর্ম্মা অভিযান ব্যাপকভাবে আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই তিনি বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান—কিন্তু এই দুঃসাহসী বীরই বর্ম্মা অধিকার যে জলপথে ছাড়া বিমান-বাহিত পদাতিক সৈন্যের সাহায্যে হতে পারে একথা প্রমাণ করে যান।

সুমাত্রার যুদ্ধে জাপানী বিমান প্যারাসুট সৈন্য নামিয়ে দেয় এবং কিছুক্ষণ পরেই দলে দলে জাহাজ থেকে সৈন্য নামতে থাকে। সাত আট শ প্যারাসুট সৈন্য নেমেছিল কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক শ' ছাড়া বাকী সকলেই হয় নিহত, না হয় বন্দী হয়েছিল। নৌবাহিনীর আক্রমণেই সুমাত্রা অল্পদিনের মধ্যেই দখল হয়।

ফ্লাইং বম্ বা উড়ন্ত বোমা

মিত্রপক্ষ ১৯৪৪ সালের জুন মাসের ৬ই তারিখ ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করে। ফ্রান্সের উপকূল ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত দুর্গ; জার্ম্মানীর বহু

বিজ্ঞাপিত আটলাণ্টিক ওয়াল এইখানেই। মিত্রপক্ষের যে আয়োজন তা প্রতিরোধ করা জার্ম্মানীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়লো। এগার হাজার বিমানের আশ্রয়ে হাজার হাজার জাহাজ ইংলণ্ডের উপকূল থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত বহন করে নিয়ে চলল। পূর্ব্ব সীমান্তে রাশিয়া তখন প্রবল আক্রমণ চালিয়েছে। এই অবস্থায় জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষ এক গোপন অস্ত্রের প্রয়োগ করলেন। ফ্রান্সের উপকূল থেকে লণ্ডন লক্ষ্য করে উড়ন্ত বোমা ছাড়া হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বলা হ'ল এটা হ'ল যুদ্ধজয়ের প্রথম গোপন অস্ত্র—V-1। এতে কাজ না হলে পরপর আরও নূতন নূতন গোপন অস্ত্র ছাড়া হবে। হিটলার আগেই বলেছিলেন—যুদ্ধের শেষ সপ্তাহে আমি এমন সংঘাতিক অস্ত্র প্রয়োগ করব ভগবান যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

বৃটিশ সমরবিভাগ পূর্ব্ব থেকেই খবর রাখতেন যে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিশেষ করে লণ্ডনের উপর জার্ম্মানী নূতন ধরণের বোমা ফেলবার আয়োজন করছে। এই সব অস্ত্র ছাড়া হবে সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গা থেকে। বৃটিশ বিমানবহর ধারাবাহিক ভাবে সমুদ্রের উপকূল ধরে সন্দেহজনক স্থানে বোমা ফেলতে আরম্ভ করে অনেক দিন আগে থেকেই। তার ফলে জার্ম্মানীর প্রথম গোপন অস্ত্র প্রয়োগের অনেক অসুবিধা হয়।

উড়ন্ত বোমা বা চালকহীন প্লেন পাঠাবার একটা জায়গায় প্রায় একশ' বাঁধানো প্ল্যাটফরম্ সন্ধ্যানী বিমানের চোখে পড়েছিল এবং বৃটিশ বোমারু বিমানগুলি সেই স্থানের উপর বোমা ফেলে সমস্ত ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরে দিয়েছিল। তারপর থেকে কেমোফ্লেজ করে কয়েকটি স্থান থেকে এই বোমা ছাড়া হয়। চারদিকে গমের ক্ষেত, মধ্যে একটুখানি জায়গায় প্লেন রাখা হয়, ক্ষেতের মধ্য দিয়ে বাঁধানো রাস্তায় এইগুলি চালিয়ে দেওয়া হয়, পাশে রাস্তার ধারে কৃষকেরা যেমন ঘর বাঁধে এই রকম ঘর বেঁধে ইঞ্জিনিয়ার ও মেকানিকরা থাকে ও এই বোমা চালায়। ক্যালে, বুলোন ও এদের কাছাকাছি স্থান থেকে এই বোমা ছাড়ার ব্যবস্থা হয়।

১৩ই জুন থেকে লণ্ডনের উপর এই উড়ন্ত বোমার আক্রমণ আরম্ভ হয় এবং প্রায় তিন মাস ধরে এই আক্রমণ চলে। মোট ৮ হাজার উড়ন্ত বোমা ছাড়া হয়, এর মধ্যে ২৩০০ বোমা লণ্ডনে এসে পড়ে ; বাকীগুলি সমুদ্রে ও লণ্ডনের বাইরে, জঙ্গী বিমানের হাতে, বিমান-মারা কামানের গোলায় ও বেলুনের তারে নষ্ট হয়ে যায়। ঘরবাড়ী ভেঙ্গে এই বোমাগুলি লণ্ডনের ক্ষতি করেছিল অসাধারণ সন্দেহ নাই কিন্তু সামরিক অস্ত্র হিসাবে এই বোমাগুলির মূল্য খুব বেশী নয়।

নীচের ছবিতে দেখা যাবে একটি চালকহীন বিমান চাকাওয়ালা গাড়ীতে করে যে বাঁধানো প্ল্যাটফরম্ থেকে ছাড়া হবে সেখানে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।



চালকহীন প্লেন বা উড়ন্ত বোমাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

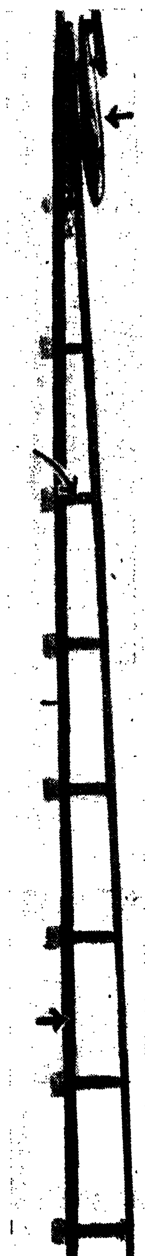
এয়ারোপ্লেন হ'লেই তার দুটি জিনিস থাকবেই। একটি হচ্ছে আকাশে উড়ে যাবার জন্য প্রোপেলার ও আর একটি হচ্ছে পাইলট বা চালক। এই প্লেনে চালক বলে কোন মানুষ নেই—একটি যন্ত্রই চালকের কাজ করে। আকাশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় একে একটা জোরে ধাক্কা দিয়ে—ধাক্কাটা অবশ্য মানুষে দেয় না—ধাক্কা দেয় ভিতরে আবদ্ধ গ্যাসের প্রচণ্ড চাপ। এর যন্ত্রপাতিগুলিও এত

হাল্কা ভাবে তৈরী—এর ইঞ্জিনটা এত সস্তা ধরণের যে কোন প্রকারে একবারের মতন একটু কাজ ক'রেই এদের আয়ু শেষ হয়ে যায়। ঠিক এই ভাবেই এগুলি তৈরী হয়েছে—যে জিনিস পু'ড়ে নষ্ট হয়ে যাবে তাকে অনর্থক মজবুত করবার জন্য অনাবশ্যক অর্থব্যয় করে লাভ কি ?

প্ল্যাটফরমের একটা দিকে একে বসিয়ে প্রাথমিক গতিবেগ সঞ্চার ক'রে একে শূন্যে ঠেলে দেওয়া হয়—তারপর খানিকটা দূর পর্য্যন্ত একে এর কলকব্জাগুলিই চালিয়ে নিয়ে যাবে।

পাশের ছবিতে দেখা যাচ্ছে ২০০ ফুট লম্বা, এক দিকটা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠেছে এই রকম একটা প্ল্যাটফরমের ঢালু দিকে ২৫ ফুট লম্বা প্লেনখানিকে রাখা হয়েছে।

সামনের দিক প্লেনখানার মাথায় থাকে বোমা প্রায় ২০০০ পাউণ্ড; তার পেছনে থাকে ১৫০ গ্যালন পেট্রল—এক গ্যালনে এক মাইল যায়—প্লেনের ওপরে থাকে একটা গ্যাস ভর্ত্তি টিউব—সামনের দিকে বন্ধ ও পিছনে খোলা—পিছন দিক দিয়ে গরম হাওয়া বেরিয়ে আসে। প্লেনের পিছনের দিকে থাকে নানা রকমের যন্ত্রপাতি। বাইরে থেকে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চার করে ইঞ্জিন গরম করে চালিয়ে দেওয়া হয়—১৫০ গ্যালন পেট্রল প্লেনটাকে ঠেলে ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত নিয়ে যায়—পেট্রল ফুরিয়ে গেলে প্লেনখানির দম ফুরিয়ে যায়, গতি থেমে যায় ও মাধ্যাকর্ষণের টানে নীচের দিকে পড়ে যায়। আসলে V-1 হ'ল বেপরোয়া বম্বিং এর যন্ত্র। নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুকে আক্রমণ করবার ক্ষমতা এদের নাই।



চলবার সময় এই প্লেন থেকে উৎকট আওয়াজ বেরুতে থাকে, আওয়াজটি যেমনি বন্ধ হয়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোমাটি যায় ফেটে।



এই উড়ন্ত বোমাটি ইংলণ্ডে এসে পড়েছে কিন্তু ফাটে নাই ;
এর বোমা ও যন্ত্রপাতিগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে

রোবট-প্লেন কিন্তু আসলে কোন এয়ারোপ্লেন নয়—একটি প্রকাণ্ড বোমা ও কতকগুলি যন্ত্রপাতি ঘিরে রাখবার জন্য অত্যন্ত হালকা ও সস্তা ধরণের লোহা ও কাঠ। আগে অনেকের বিশ্বাস ছিল এগুলি বুঝি রেডিও বা বেতারের সাহায্যে চলে কিন্তু এগুলি চলে গ্যাসের বা উত্তপ্ত বায়ুর ধাক্কায়।

কয়েক সপ্তাহ পরেই জার্মানী ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে V-2, অর্থাৎ দ্বিতীয় গোপন অস্ত্র রকেট বোমা ছাড়তে লাগল। প্রায় ৫০ ফুট লম্বা ও মাঝখানে ৫ ফুট ব্যাসের একটি অতিকায় বোমা হাউইয়ের মত আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হ'ল এবং এই রকেট বিদ্যুৎগতিতে আকাশের বহু উপরে উঠে তারপর তির্য্যকভাবে ইংলণ্ডের যে কোন স্থানে গিয়ে পড়তে লাগল। এই বোমা যা ক্ষতি করতে লাগল তা অসাধারণ এবং কোনও জাতিই এই রকম ক্ষতি দীর্ঘ দিন সহ্য

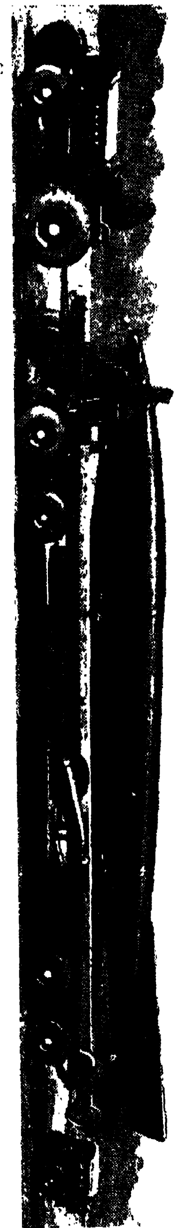
করতে পারে না। তবে জার্ম্মানীর দিকে মিত্রপক্ষের স্থলপথে অভিযান খুব দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলছিল এবং ফিল্‌ড্‌ মার্শ্যাল মণ্টগোমারীর অতি দ্রুত অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সমুদ্রের পার ধরে জার্ম্মানীর V-1 ও V-2 ছাড়বার যে ব্যবস্থাগুলি আছে সেগুলো অধিকার করে বৃটেনকে এই শ্রেণীর আক্রমণ থেকে মুক্ত করা। এইজন্য অল্পদিনের মধ্যেই গোপন অস্ত্র ছাড়বার স্থানগুলি জার্ম্মানীর হাতছাড়া হয়ে গেল।

V-1 এর চেয়ে V-2 মারণাস্ত্র হিসাবে অনেকখানি বেশী ভয়ানক। রোবট-প্লেনকে জঙ্গী বিমান বা বিমান-মারা কামান দিয়ে আয়ত্ত করা যেত কিন্তু এই রকেট বোমার প্রতিষেধক কোন কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই। সমস্ত রকম গোলাগুলির নাগালের বাইরে দিয়ে অতি উঁচু আকাশে ৪০ ফুট লম্বা একটা বিস্ফোরক বোমা যখন অসম্ভব দ্রুত গতিতে চলতে আরম্ভ করে এবং যার উপর এসে পড়ে সেটাকে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়, তখন মানুষ খুব সাহসী হলেও খানিকটা ভয় পায়। একটা কথা জার্ম্মানী এই অস্ত্র ব্যবহার করার সময় বেশী পায় নাই আরও একটা কথা এই রকেটগুলি ইংলণ্ডের দিকে পাঠাবার সময় যেখান থেকে পাঠান হচ্ছিল সেখানে দুর্ঘটনা ঘটছিল খুব বেশী। অনেক রকেট ফ্রান্সের উপকূলেই ফেটে যাচ্ছিল।

(ক) প্রথম চিত্রে দেখান হয়েছে কি করে রকেট-শেলটিকে গাড়ীর উপর তুলে টেনে আনা হচ্ছে।

(খ) দ্বিতীয় চিত্রে দেখা যাচ্ছে রকেট-টিকে যথাস্থানে বসান হয়েছে ।

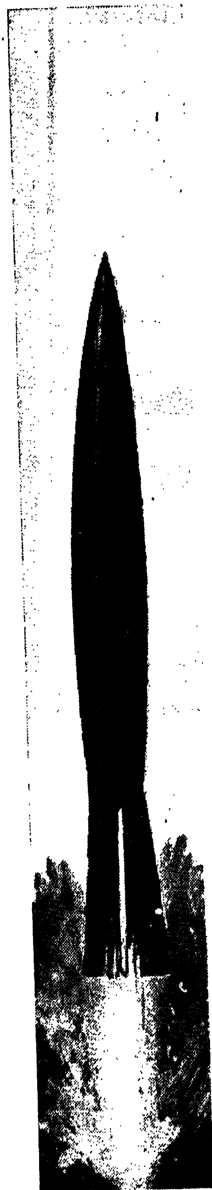
(গ) তৃতীয় চিত্রে দেখান হয়েছে ছোট্ট একটি বিস্ফোরণের পর রকেট-টি আকাশে উৎক্ষিপ্ত হ'ল।



(ক)



(খ)



(গ)

এ্যাটম্ বম্ বা আণবিক বোমা

যে শক্তি একদিন ছিল মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে, যে অপরিমেয় প্রাকৃতিক শক্তি থেকে সূর্য্য আপনার বিপুল শক্তি সংগ্রহ করছে, মানুষ একটি ক্ষুদ্র বোমার মধ্যে সূক্ষ্মতম আকারে সেই শক্তি অবরুদ্ধ করেছে। এইটিই আজকের দিনে বিশ্বের পরম বিস্ময়কর আবিষ্কার, এরই নাম আণবিক বোমা।

বৈজ্ঞানিকগণের কাছে আণবিক শক্তি কোন নূতন কথা নয়, বহুদিন ধরেই অণুর প্রচণ্ড শক্তিকে কাজে লাগাবার কল্পনা বৈজ্ঞানিকেরা করেছেন কিন্তু এই শক্তিকে যুদ্ধে ধ্বংসের কাজে লাগান এবং যুদ্ধের চরম অস্ত্র রূপে এই শক্তির ব্যবহার এই যুদ্ধের তাগিদেই ঘটেছে। আণবিক বোমা তৈরীর পদ্ধতি অত্যন্ত গোপনীয় এবং অদূর ভবিষ্যতে কোন দেশ এ দিকে কতটা অগ্রসর হবে তা জানবার উপায় নাই। আবিষ্কারের মূল সূত্রটি ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা কেবল বলা যেতে পারে।

৬৭ বৎসর বয়স্কা অষ্ট্রীয় ইহুদী রমণী ডক্টর মিটনার আণবিক বোমার অন্যতম আবিষ্কারক। এই রমণী আজ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এক সময়ে ইনি কাইজার উইলহেলম ইনষ্টিটিউটের পরিচালিকা ছিলেন।

১৯৩৪ সন থেকে ডাঃ মিটনার রয়াল সুইডিশ একাডেমিতে পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্ নিযুক্ত আছেন। ডাঃ মিটনার একজন কৃতিগণিতজ্ঞ। হিটলার জার্ম্মানীতে কর্ত্তৃত্ব লাভ করার পর ইনি জার্ম্মানী ত্যাগ করেন।

জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক হান্ ও ষ্ট্রাসম্যান ঔপপত্তিকভাবে আবিষ্কার করেছিলেন ইউরেনিয়াম পরমাণু রেডিয়াম পরমাণুতে পরিণত হ'তে পারে। ১৯৩৮ সনে ডাঃ মিটনার এই সম্পর্কে গবেষণা অরাম্ভ করেন। ডাঃ মিটনার ছিলেন বৈজ্ঞানিক হানের বন্ধু। নিজের পর্য্যবেক্ষণ সহ হানের আবিষ্কারের কথা তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র অটো রবার্ট ফ্রিস্ককে জানান। ডাঃ ফ্রিস্ক ছিলেন ভিয়েনাবাসী। ১৯৩৪ সন থেকে তিনি কোপেনহাগনের বোহরস্ ইনষ্টিটিউটে কাজ করতেন। ডাঃ বোহুর ছিলেন তখন আমেরিকায়। তাঁর অনুপস্থিতিতেই ডাঃ ফ্রিস্ক পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন যে, ইউরেনিয়াম পরমাণু

বিভক্ত করা যেতে পারে। ১৯৩৯ সালে তিনি রেডিয়াম পরমাণুর সাহায্যে ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভিন্ন করতে সমর্থ হন। এই পরীক্ষার ফলে দেখা যায় মাত্র ছয় শত মিলিগ্রাম রেডিয়ামের সাহায্যে বিশ কোটি ভোল্ট শক্তি উৎপন্ন হ'তে পারে।

১৯৩৯ সনে ডাঃ ফ্রিস্ক ডেনমার্ক পরিত্যাগ করে ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে তিনি বার্মিংহাম ও লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে থাকেন। ১৯৪৩ সনে তিনি বৃটিশ নাগরিক অধিকার পান। এই বৎসরেরই শেষ ভাগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে এসে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় রত বৈজ্ঞানিকদলে যোগ দেন এবং নিউ মেক্সিকো সাণ্টা ফে আণবিক বিজ্ঞানাগারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য্যে রত হন।

আণবিক বোমার আবিষ্কারে অন্যতম সহায়ক ডাঃ নীলস্ হেনরিক বোহ্‌র একজন বিখ্যাত ডেনিশ বৈজ্ঞানিক। তাঁর বয়স এখন ৬০ বৎসর। নাৎসীগণ কর্তৃক তাঁহার স্বদেশ আক্রান্ত হওয়ায় আণবিক বোমার রহস্যকথা তাদের নিকট ব্যক্ত না করে তিনি পালিয়ে যান।

আণবিক বোমা আবিষ্কারে এঁর পুত্রও পিতার সহায় ছিলেন। ডাঃ বোহ্‌র নিজে কিছুই প্রকাশ করেন নাই। তাঁর পুত্র বলেছেন—আমার পিতা বোমা আবিষ্কার চান নাই। বহু বৎসর যাবৎ মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত তিনি পরমাণু সম্পর্কে অধ্যয়ন করে আসছেন। তাঁর এই অধ্যয়নের ফল কাজে না লাগালে বোমা আবিষ্কার হ'ত কিনা সন্দেহ।

আণবিক বোমা আবিষ্কারের পরে এই সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মহল বিশেষভাবে মুখর হয়ে উঠেছে। Indian Association for the cultivation of Science-এর মহেন্দ্রলাল সরকার Professor ডাঃ কে. বানার্জ্জি বলেন, আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকবাদের মধ্যেই আণবিক বোমা তৈরীর মূলনীতি খুঁজে পাওয়া যাবে। আপেক্ষিকবাদে জড় ও শক্তির সমধর্ম্মত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কৃত্রিম তেজেন্দ্রিয় পদার্থ উৎপাদনের ফলে বৈজ্ঞানিকদের মনে এক বিপুল আশার সঞ্চার হয় যে, শেষ পর্য্যন্ত বিরাট আণবিক শক্তি ব্যবহারের একটি পথ খুঁজে

পাওয়া যাবে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা যে পরিমাণ শক্তি উদ্ধার করে আনা সম্ভবপর হয়েছিল, তাতে এই শক্তিকে লাভজনক উপায়ে ব্যবহারের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। ইউরেনিয়ামে নিউট্রন প্রবেশ করিয়ে দিলে যে বিরাট শক্তি বা energy মুক্ত হয়ে আসে তা শেষ আবিষ্কার করেন ডাঃ ফ্রিস্ক ও মিটনার। তাঁদের আবিষ্কারের মূলতথ্য এই যে—ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভারকেন্দ্র অত্যন্ত ভঙ্গুর। ধীরগতি নিউট্রন ওর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে উহা ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ভারকেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সেগুলি বিপুল বেগে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সমস্যা এই যে বহুসংখ্যক ইউরেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে নিউট্রন প্রবেশ করিয়ে দিলেও মাত্র অতি অল্পসংখ্যক পরমাণুর ভারকেন্দ্রই বিভক্ত হয়। ডেনিশ পদার্থ বিজ্ঞানবিদ্ বোহ্‌র এই সমস্যারই সমাধান করেন। তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে কেবলমাত্র ইউরেনিয়াম (২৩৫) এ ব্যাপার ঘটাতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে যত ইউরেনিয়াম আছে তার ৭/১০ ভাগ (২৩৫) পারমাণবিক ভারবিশিষ্ট (atomic weight) এই বিশেষ ধরণের ইউরেনিয়াম চূর্ণ করলে তিনটি নিউট্রন বেরিয়ে আসে এবং ইউরেনিয়াম কণিকার সংঘর্ষে এসে আরও ইউরেনিয়াম কণিকাকে চূর্ণ করতে থাকে। এইভাবেই ক্রমাগত ধ্বংসকার্য্য চলতে থাকে। এই বিশেষ ধরণের ইউরেনিয়াম একস্থানে সংগ্রহ করতে পারলে বিপুলবেগে বিস্ফোরণ চলতে থাকে এবং পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি মুক্ত হয়ে আসে।

সার্ সি. ভি. রমণ ও ডাঃ কৃষ্ণান এই সম্পর্কে বলেন, কয়লা বা তৈল জ্বালিয়ে যে ভাবে শক্তি বা energy মুক্ত করে আনা সম্ভবপর ঠিক সেই ভাবেই পরমাণুকে চূর্ণ করেও শক্তি বের করে আনা যেতে পারে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা জ্বালিয়ে তার তাপ ও শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং কাজে লাগান যায় একথা আমরা সকলেই জানি। ঠিক সেই ভাবেই ইউরেনিয়ামকে চূর্ণ করে যে শক্তি পাওয়া যাবে, তাকেও কার্য্যকরী ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য এজন্য আরও গবেষণা আবশ্যক হবে। এক পাউণ্ড ইউরেনিয়ামের বিশ ভাগের এক ভাগকে চূর্ণ করলে যে শক্তি পাওয়া যাবে তা প্রায় একশ টন কয়লা পোড়ার

সমান হবে। এক বর্গ ফুট ইউরেনিয়ামে যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম রয়েছে তার সমস্তগুলি এক সঙ্গে চূর্ণ করে দিলে এত শক্তি বের হ'য়ে আসবে যে তাকে অনায়াসেই বোমা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আণবিক বোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আজ বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক জগতে নানা আলোচনা শুনা যাচ্ছে। এর গঠনমূলক কার্য্য সম্পর্কে তাঁরা বলেন—বর্ত্তমান জ্বালানির পরিবর্ত্তে এর ব্যবহার অত্যন্ত সুবিধাজনক হবে। বৈদ্যুতিক শক্তির পরিবর্ত্তেও এর ব্যবহার হ'তে পারবে। এর বলে চন্দ্রলোকে যাত্রাও সম্ভাবনার মধ্যে এসেছে।

গত ১৬ জুলাই পরীক্ষামূলক ভাবে নিউ মেক্সিকোতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ব্যবস্থা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ থেকে এর যে বিবরণ পাওয়া যায় তা এইরূপ :—

উজ্জ্বলতম দিবালোক হ'তেও তীব্রতর এক বৈদ্যুতিক স্ফূরণ দেখা যায়। তারপর বহুক্ষণ ধরে ক্রমাগত গর্জ্জন ধ্বনি শুনা যেতে থাকে। কম্পনের ফলে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে দুইজন লোক ভূপতিত হয়। হঠাৎ বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত একখানা মেঘ ৪০ হাজার ফুট ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। ইহার উত্থান পথ হ'তে মেঘগুলি সরে দাঁড়ায়।

পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ১২০ মাইল দূরে এক অন্ধ বালিকা আলোক স্ফূরণ অনুভব করে চীৎকার করে উঠে—ও কি!

হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ কোমাথ বলেন, সেকেণ্ডগুলি এত দীর্ঘ এর পূর্ব্বে কখনও মনে হয় নাই। প্রথমেই এক অতুলনীয় দীপ্তি-বহুল আলোক স্ফূরণ দেখা দেয়। কালো কাচের মধ্য দিয়ে আমরা অগ্নিগোলকটি দেখতে লাগলাম। প্রায় ৪০ সেকেণ্ড পরে সামান্য কম্পন অনুভূত হ'ল।

জেনারেল টমাস ফ্যারেল বলেন, আশ্রয় কেন্দ্রের অভ্যন্তরের দৃশ্য বর্ণনাতীত নাটকীয় হয়েছিল। আসন্ন ঘটনায় বিরাট সম্ভাবনার বিষয়ে সকলেই সচেতন ছিল। আমরা হলাম অজানার যাত্রী। হঠাৎ বিরাট আলোক স্ফূরণ দেখা

দিল, সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ গর্জ্জন, কয়েকজন বাতাহত হয়ে ভূপতিত হ'ল। মনে হ'ল সমস্ত রুদ্ধ শক্তি যেন হঠাৎ মুক্তি পেয়েছে,—আমরা যেন কোন নূতন যুগারম্ভে উপস্থিত হয়েছি। এ যুগ আণবিক শক্তির যুগ।

আণবিক বোমা আবিষ্কারের প্রচেষ্টা সম্পর্কে মিঃ চার্চিল ৬ই আগষ্ট নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করেন। তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিকগণকে নানা কার্য্যে নিয়োজিত রাখার প্রয়োজন সত্ত্বেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আণবিক বোমা সম্পর্কে গবেষণা কার্য্য চালিয়ে ছিলেন। নেতৃস্থানীয় বৈজ্ঞানিকগণকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং স্যার জর্জ টমসন এই কমিটির সভাপতিত্ব করেন। বৃটিশ ও মার্কিণ বৈজ্ঞানিক-গণের মধ্যে ভাবধারার আদান প্রদান হয়। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালের পূর্ব্বেই গবেষণা কার্য্য এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে স্যার জর্জ টমসনের কমিটি এই মর্ম্মে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন যে যুদ্ধ শেষ হবার পূর্ব্বেই আণবিক বোমা প্রস্তুত হ'তে পারে।

কাজ চালাবার জন্য একটি বিশেষ গবেষকমণ্ডলী গঠিত হয় এবং অধ্যাপক স্যার জেমস্ চ্যাডউই'ক, ডাঃ হলবাস, ডাঃ সাইমন ও ডাঃ স্লেডকে নিয়ে প্রথমে যে টেকনিক্যাল কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই কমিটির সভাপতি হিসাবে কাজ করবার জন্য ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইনডাষ্ট্রিজ লিমিটেড মিঃ ডবলিউও এ্রকার্সকে ছেড়ে দেন। সার চার্লস ডারউইন, অধ্যাপক ককক্রাফট, অধ্যাপক ওলিফান্ট ও অধ্যাপক ফেদার পরে এই কমিটিতে যোগ দেন। ১৯৪৫ সালে বৃটিশ ও মার্কিন বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টা সুবিহিত করা হয় এবং একদল বৃটিশ বৈজ্ঞানিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালের পূর্ব্বেই গবেষণার সুফল বুঝতে পারা যায়।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জার্ম্মান বোমার ভয় না থাকার জন্য সেখানেই আণবিক বোমা প্রস্তুত করবার কারখানা নির্ম্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর প্রধান কার্য্যভার ও ব্যয়ভার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করেন। কানাডিয়ান গভর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করেন।

১৯৪৫ সালের ৫ই আগষ্ট জাপানের হিরোসিমা বন্দরে প্রথম আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ৯ই আগষ্ট অপরাহ্নে প্রসিদ্ধ জাপানী বন্দর নাগাসাকীতে দ্বিতীয় আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। দুইটিমাত্র বোমার প্রচণ্ড আঘাতের ফলে জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। ১১ই আগষ্ট নাগাসাকী বন্দরে আণবিক বোমা পতনের ফলাফল প্রকাশিত হয়। জাপানের প্রায় সমগ্র শিল্পাঞ্চল সমেত সহরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা ছিল দুই লক্ষ।

১৪ই আগষ্ট জাপানের আত্মসমর্পণের পরে জাপ-প্রধানমন্ত্রী ব্যারন সুজুকি ঘোষণা করেন—শত্রুপক্ষ এক নূতন ধরণের বোমা ব্যবহার করায় আমরা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি।

আণবিক বোমার শক্তি যে প্রচণ্ড অনেকদিন ধরে অনেক রকমের কথাবার্ত্তা শুনে এ ধারণা হয়তো অনেকের হয়েছে কিন্তু প্রাণহানি ও ধ্বংসসাধনের ক্ষমতা যে এর কত ভয়ানক সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা অনেকেরই নাই। হিরোসিমায় লোক মারা গিয়েছে ৬০ হাজার, আহত হয়েছে ১ লক্ষ আর গৃহহীন হয়েছে ২ লক্ষ। ৬০ হাজার লোক সঙ্গে সঙ্গেই মারা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে পরে অনেকে মারা গিয়েছে কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছে যাদের গায়ে কোন আঘাত লাগে নি এমন লোকও মারা গিয়েছে। আণবিক বিস্ফোরণের ফলে তাদের শরীরের শ্বেত রক্ত কণিকা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং তারা ধীরে ধীরে মরছে। মনে রাখবে হিরোসিমায় বোমা পড়েছিল মাত্র একটি।

নাগাসাকীতে লোক মরেছে ১০ হাজার, আহত হয়েছে ২০ হাজার আর গৃহহীন হয়েছে ৯০ হাজার।

নাগাসাকীর সমুদ্র ও পাহাড় আণবিক বোমার ধাক্কাটা অনেকখানি টেনে নিয়েছিল বলে ধ্বংসলীলাটা ঠিক হিরোসিমার মত হয় নি। সমুদ্রের প্রভাব বোমার উপর কতখানি এর পরীক্ষা কিছুদিনের মধ্যেই হবে বলে শোনা গেছে—জাপানের সবচেয়ে বড় যে ব্যাট্‌লশিপ তাকে তীরভূমি থেকে ২৫০ মাইল দূরে সমুদ্রের মধ্যে

নিয়ে গিয়ে তার উপর একটি আণবিক বোমা ফেলে দেখা হবে জাহাজটি কি ভাবে নষ্ট হয় আর সমুদ্রের উপর বোমার প্রভাব কি রকম দেখা যায়।

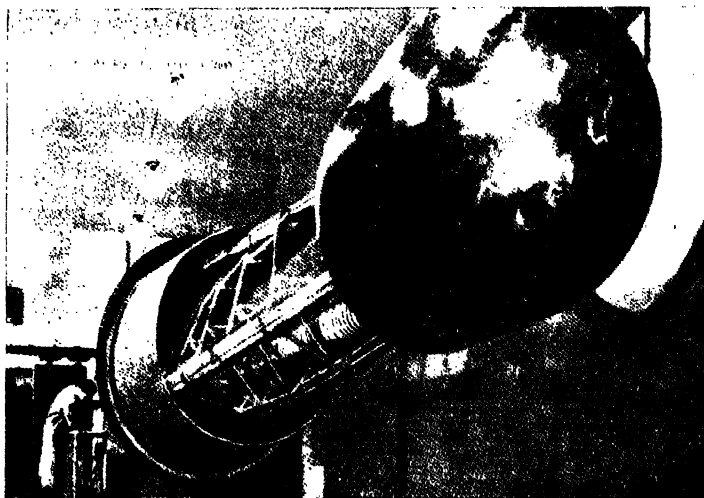
প্রাণহানির কথা ছেড়ে দিলেও সাধারণভাবে ৩ মণ ওজনের একটি বোমার মারণশক্তি, ধ্বংস করবার ক্ষমতা কতখানি তা মার্কিন সমর দপ্তর বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে ও খোঁজখবর নিয়ে প্রকাশ করেছেন। বোমাটি ঠিক যে স্থানে পড়েছিল তার চার দিকে প্রায় আড়াই মাইল পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে যা কিছু ছিল প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তুলনার জন্য মনে রাখা ভাল ৫০০ পাউণ্ডের একটি বিস্ফোরক বোমার চার পাশের ৫০ ফুট স্থানই direct hit এর এলাকায় পড়ে। কোথায় ৫০ ফুট আর কোথায় আড়াই মাইল। সাধারণ বোমার সঙ্গে আণবিক বোমার এই পার্থক্য। এই বোমার এলাকায় পড়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে দু'টি রেল ষ্টেশন, গ্যাস ও ইলেকট্রিকের পাওয়ার হাউস দু'টি, কাপড়ের কল একটি, অন্যান্য কারখানা চার পাঁচটি, তেলের গুদাম, সৈন্যদলের খাদ্য ও পোষাকের গুদাম, অস্ত্রাগার ও পাঁচ ছয়টি সেতু। সাধারণ ঘরবাড়ীর কথা ধরা হয় নাই।

আণবিক বোমার শক্তি ও প্রয়োগের ফলাফল সম্বন্ধে খবর প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ নিয়ে সভ্য জগতের সর্ব্বত্র নানা প্রকার আলোচনা ও আন্দোলন দেখা দিয়েছে। এর পক্ষে ও বিপক্ষে এত কথা বলা হয়েছে যে সেগুলি সঙ্কলন করলেই একখানা বই হ'তে পারে।

একটা কথা লক্ষ্য করবার আছে। আণবিক বোমা যাঁরা আবিষ্কার করেছেন ও প্রয়োগ করেছেন তাঁদের মধ্যে এর জন্য কোন উল্লাস দেখা যায় নাই। যুদ্ধের প্রয়োজনে অনেক কিছুই করতে হয় কিন্তু এ কী অস্ত্র আজ মানুষের হাতে এসেছে যার জন্য যারা জয়লাভ করেছে তাদের মনেও আজ শান্তি নাই। আণবিক বোমা প্রয়োগ না করলেও জাপান তার পরাজয়কে বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারত না কিন্তু একদল বলেন জাপানকে পরাজিত করতে হলে পৃথিবীর নানাস্থানে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চালাতে হ'ত তাতে মিত্রপক্ষের দশ বার লক্ষ লোক আরও বেশী মারা পড়ত। সুতরাং দু তিন লাখ লোক যদি এতে মরেই থাকে

তবে অন্যায়টা এমন কি হয়েছে, যুদ্ধ তা না হ'লে আরও ছ'মাস কি এক বছর বেশী চলত—আর যুদ্ধ এরপরও আরও কিছুদিন চললে মানুষের কষ্টের কি সীমা থাকত !

কেউ কেউ বলেছেন অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানিকগণকে আহ্বান করে এই বোমা নির্মাণ-রহস্য জানিয়ে দেওয়া হোক। এর উত্তরে কেউ বলেছেন—আমেরিকা জলের মত অর্থ ব্যয় করে যে জিনিস তৈরী করেছে—তা আমেরিকারই থাকবে,



আণবিক বোমা তৈরীর জন্য অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। এটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নোটার-ডেম্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুচূর্ণকারী যন্ত্র। এর ওজন ২০ টন এবং ৮০ লক্ষ ভোল্ট।

অন্যে তার ফল ভোগ করবে কেন ? কেউ বলছেন—বিজ্ঞানের মূলসূত্রটি যখন বিজ্ঞানীদের অজানা নাই তখন চেষ্টা করলে সব দেশেই এই বোমা আবিষ্কৃত হ'তে পারে। কিন্তু বাধা তো বৈজ্ঞানিক সূত্র না জানার জন্য নয়, আসল বাধা এর জন্য যে সব বড় বড় যন্ত্রপাতি বসাতে হয় ও যে পরিমাণ টাকা খরচ করতে হয়—সে যন্ত্রপাতি ও টাকা সব দেশের নাই।

ইতিমধ্যে আরও বড়, আরও ভীষণ, যে বোমা পড়েছে তার চেয়ে একশ' গুণ শক্তিশালী আণবিক বোমা আমেরিকায় তৈরী হচ্ছে। অন্যান্য দেশ হয়তো দু এক বছরের মধ্যে আণবিক বোমা তৈরী করে ফেলতে পারে, তখন তার উত্তর হবে আরও শক্তিশালী বোমা।

বিলাতের একখানা প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র আণবিক বোমা সম্বন্ধে পাঠকদের নিকট থেকে মতামত সংগ্রহ করেছিলেন এবং এই বিষয়ে ভোটের একটা তালিকা প্রকাশ করেছেন।

"জাপানের উপর আণবিক বোমার প্রয়োগ কি উচিত হয়েছে ?"—এই প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৭২ জন বলেছেন—'উচিত হয়েছে' ; ২১ জন বলেছেন 'উচিত হয় নাই।'

"আণবিক বোমার আবিষ্কারের ফলে ভবিষ্যতে যুদ্ধের সম্ভাবনা বেড়ে গেল না কমে গেল"—এর উত্তরে শতকরা ৫২ জন বলেছেন—'কমে গেল', আর ১২ জন বলেছেন—'বেড়ে গেল' আর ২১ জন কোন মত দেন নাই।

নৌঘাঁটি, বিমান-ঘাঁটি, দুর্গ, জাহাজ, ট্যাঙ্ক—এককথায় এতকাল পর্যান্ত যুদ্ধের যে সমস্ত ষ্ট্র্যাটেজি গড়ে উঠেছিল, আণবিক বোমা কিন্তু সবই বাতিল করে দিতে চায়। কি মূল্য রইল আর এই সবের—সৈন্যসামন্ত সেনাপতিত্ব সমস্তই মূল্যহীন —যদি একটি বোমা একটি নগর ধ্বংস করে দিতে পারে।

আণবিক বোমা কি করে নষ্ট করে ফেলা যায় সে সম্বন্ধেও গবেষণা অনেক দূর এর মধ্যেই অগ্রসর হয়েছে। বৃটিশ রেডার ও জার্ম্মান্ রকেট—এই দুইয়ের সাহায্য নিয়ে বহুদূরে—হয়তো যে মুহূর্ত্তে বোমা নিয়ে বিমান রওনা হয়েছে—তখনি বোমা ফাটিয়ে দেওয়া অসম্ভব হবে না।

আণবিক বোমা আবিষ্কারের ফলে এক ভীষণ অস্ত্র মানুষের হাতে এসেছে যার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে একদিন পৃথিবী ধ্বংস হওয়াও অসম্ভব নয়। তাই মানুষের কল্যাণকামী মনীষিগণ আজ ভবিষ্যতের আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। জর্জ বার্নার্ড শ এর বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন,

বিস্ফোরণশীল অণু পরিণামে দুনিয়া ধ্বংস করতে পারে। তিনি বলেন, 'যাদুকরের শিক্ষানবীশের মত আমরা থামাবার কৌশল না জেনেই যাদুবিদ্যার প্রয়োগ করতে পারি, এই ভাবে আমরা প্রস্পেরর ভবিষ্যদ্বাণী সফল করে তুলতে পারি।'

তাই আজ প্রয়োজন হয়েছে এ অস্ত্রের যথাবিধি নিয়ন্ত্রণ। মানুষের বিবেক বুদ্ধি আজ বিষ বাষ্পের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করেছে সুতরাং এই বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ নিবারণ করা সম্ভব হবে না, এ কথা মনে হয় না।

বিষ বাষ্পের ব্যবহার তো আজ কারও কাছেই অজানা নাই, তবু এত বড় যুদ্ধে poison gas কেউ প্রয়োগ করতে চাইল না কেন? কারণ সকলেই জানে বিষ বাষ্প প্রয়োগ করলে ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত এক-তরফা থাকবে না। আণবিক বোমা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। এ সব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ-বাণী করা পাগলামি কিন্তু মনে হয় ভবিষ্যতে যদি আবার যুদ্ধ বাধে সেদিন মানুষের শুভবুদ্ধিই তাকে এ মহাস্ত্র প্রয়োগ করতে বাধা দেবে।

সমাপ্ত